কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

———০———

দশম বর্ষ

১৩২৫ সাল

———
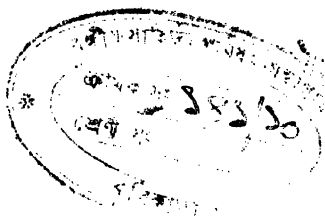
কার্য্যালয়—২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩২৫ সালের বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

দশম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২৫ { প্রথম সংখ্যা

তিনশ' পৈষট্টি দিনে

পয়লা বৈশাখের দিনে একটি মেয়ে বলেন, "কৈ নববর্ষ বলেতো কিছু মনে ছিল না, উপাসনায় গিয়ে নববর্ষের একটা ভাব মনে এলো," কথাটা খুব সত্য, "বর্ষশেষ" বা "নববর্ষ" উৎসবের মধ্যে একটা অনুভূতি—নূতনের আগমন-বার্ত্তা প্রাণে ঘোষিত হয় বটে কিন্তু প্রকৃত নববর্ষ তাঁহার নিকটে নবীন—জীবনপ্রদ, যিনি তিনশ'পৈষট্টি দিন, দিনের শেষে শুনেন "আমি গেলাম" এবং প্রভাতের আগমনে শুনেন, "আমি এলাম," আর ঐ সঙ্গে বিশ্বাসীর কণ্ঠ বলে, "হে প্রভু! অদ্যকার দিন আমার পক্ষে তোমার আশীর্ব্বাদ দ্বারা মণ্ডিত কর, তোমার শক্তিতেই যেন আমার সমস্ত দিনের কার্য্যনির্ব্বাহ হয়, আমার আমিত্ব, অভিমান, অহঙ্কার প্রকাশিত হইয়া যেন তোমার কার্য্যের এবং তোমার সন্তানসন্ততিগণের বিঘ্ন না জন্মায়। অদ্যকার অন্নজল তুমিই দান কর, তাহা পান ভোজন করিয়া যে শক্তি হইবে তাহা যেন তোমারই কার্য্যে অর্পণ করিতে পারি, জগতের কল্যাণ কর, আমার দেশের—জন্মভূমির কল্যাণ কর।" এই তিনশ' পৈষট্টি দিনের প্রার্থনারই একটি নবীন উদ্বোধন, নববর্ষ। নববর্ষ সেই তিনশ'পৈষট্টি দিনেরই আরম্ভ। বিশ্বাসীভক্তের জীবন নিত্য উৎসবময়। নববর্ষ, বিশ্বাসী-ভক্তের জীবনে প্রকৃত নবভাব দান করে। কিন্তু যেখানে জীবনই জাগে নাই, সেখানে "কি বা রাত্রি কিবা দিন," ভগবান্ করুন, কুশদহবাসীর প্রাণে নব জাগরণ আসুক। দাসের প্রার্থনা সার্থক হউক, দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হই।

নববর্ষ-বন্দনা *

—o—

নববর্ষ—উপস্থিত

বালক ও বালিকাগণের প্রবেশ।

১ম বালক—তুমি কে ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ ?

২য় বালক—ঠিক যেন একটি জীবন্ত গাছ, দেখতে কি সুন্দর লাগছে।

৩য় বালক—তুমি কে ভাই ?

নববর্ষ—আমি নববর্ষ।

৩য় বালক—তুমিই নববর্ষ ? আজ আমরা নববর্ষকেই খুঁজতে এসেছি।

১ম বালিকা—তোমার গায়ে এত পাতা আর ফুল কেন ? ও তো আমরাও পরেছি। তোমার রাজবেশ নেই ?

নববর্ষ—এই তো আমার রাজবেশ। আমার যিনি প্রভু, তিনি আমাদের এই বেশেতেই সাজাতে ভালবাসেন। চারিদিকে চেয়ে দেখ দেখি, কত বিচিত্র সবুজের শোভায় পৃথিবী কি সুন্দর শোভা ধারণ কোরেছে, বসন্ত এসে দিকে দিকে আমার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা কোরে দিয়েছে, তাতেই তোমরা জানতে পেরেছ যে আমি আসছি,—নয় কি ?

২য় বালিকা—তা ঠিক। আমরা তো তাতেই ঘর ছেড়ে, সবুজ পাতা আর নানাবন-ফুল নিয়ে খেলবার জন্য বাইরে বেরিয়েছি।

১ম বালক—হ্যাঁ ভাই নববর্ষ, তোমার প্রভু আমাদের জন্য কিছু উপহার দিয়েছেন কি ?

নববর্ষ—দিয়েছেন বৈ কি ? তিনি বোলেছেন, পৃথিবীকে আমি বড় ভালবাসি, সেখানকার সকলের জন্য নানা উপহার তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু বোলো, আমার সব দান তাদের পসন্দ না হোলেও, কোনটাও অপ্রয়োজনীয় নয়, তাদের নেবার গুণেই সব সুন্দর হোয়ে উঠ্‌বে।

২য় বালক—ভাই নববর্ষ, তিনি যা পাঠিয়েছেন আমরা তাই নিয়ে খুসী হবো, তাঁর দান হাসিমুখে নিয়ে আমরা ধন্য হবো। এসো ভাই, তুমি আজ আমাদের অতিথি, তোমায় আমরা আদর কোরে আমাদের খেলার সাথী কোরে নিই।

* রামপুরহাট বাল্যসমিতিতে অভিনীত।

১ম বালক—এসো ভাই নববর্ষ, এই মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিই, এই তোমার যোগ্য উপহার। এস ভাই, আমরা সকলে মিলে নববর্ষকে ঘিরে গান করি।

আজি নববরষের নবীন প্রভাতে নব বন্দনা গানে,
চারিদিক মোরা করিব মুখর, সুমধুর নব তানে।
এস হে নবীন, তরুণ, অরুণ, কিরণোজ্জ্বল প্রাতে,
শ্যাম পল্লবে রচিত মুকুট বাঁধিয়া যতনে মাথে।
শুভ্র মালতী মল্লিকা ফুলে তনু সাজাইয়া যতনে।
এস সুন্দর মানস-হরণ, আমাদের এই ধরণী,
তোমার অমৃত পরশে, নিমিষে হোক্ সুন্দর বরণী,
তোমার তরুণ পরশ লাগুক্ দিকে দিকে জড় চেতনে।
তব বন্দনা পাখীর কণ্ঠে ঐ যে ধ্বনিছে কাননে।
কোথা সে নবীন চিরসুন্দর যাহার আদেশ বহিয়া,
এসেছ হে দূত, ঊর্দ্ধ হইতে মোদের ধরায় নামিয়া,
নত শিরে মোরা নমি তাঁর পায় পূজি সে চিরন্তনে ;—
বরষের যত সব সুখ দুঃখ ধন্য হোক্ এ পরাণে।

শ্রীসরসীবালা বসু।

পল্লী-সমস্যা

—০—

স্যার্ রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে যে পল্লী-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তিনি বলিয়াছেন,—সমবেত চেষ্টা ভিন্ন আজকাল কোনও বিষয়েরই উন্নতি সম্ভবপর নহে। সমবেত চেষ্টার ইচ্ছা পল্লীবাসীর নাই এবং বর্ত্তমানে তাহাদের সে ক্ষমতাও নাই। তবে এখন উপায় কি ? উপায় কি নাই ? অবশ্য পল্লীবাসীরা নিজেরা কি করিবে,কিরূপে করিবে—তাহাও কিছুই ভাবিয়া পায় না। অথচ কোনও আদর্শও সম্মুখে নাই, যাহার দৃষ্টান্তে তাহা তাহাদের কার্য্যগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এ অবস্থায় দেশনায়কদিগের দ্বারা একটি আদর্শ-মণ্ডলী স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

কোনও একটি গ্রাম পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। সেখানে একটি Joint-stock Company প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। একটি মধ্যম রকম গ্রাম লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেই ভাল হয়। আর সেই গ্রামে দুই একটি এরূপ শিক্ষিত সৎসাহসী লোক থাকা চাই, যাঁহাদের দ্বারা এই কোম্পানীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। এরূপ কোম্পানীর মূলধন ২০,০০০৲ টাকা ধার্য্য করিয়া ৫০০০ অংশে বিভক্ত করা উচিত। প্রত্যেক অংশের মূল্য ৪৲ চারি টাকা। ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে ২৫00 অংশে বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা অংশ গ্রহণ করিবেন না। কারণ, ইহার উপকারিতা তাঁহারা নিজেরা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না এবং পাছে কোম্পানী নষ্ট হয় বলিয়া তাঁহাদের মনে কিছু আশঙ্কাও যে না থাকিবে, তাহা নহে সেইজন্য প্রথমেই কোম্পানীর সমস্ত অংশ এক সঙ্গে না খুলিয়া অর্দ্ধেক পরিমাণ অংশ বিক্রয় করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। কারণ, কোম্পানীর উন্নতি দেখিলে গ্রামবাসীরা অংশ লইবে। দেশনায়কেরা ইচ্ছা করিলে এক জনে বা দুই জনেই সমস্ত অংশ ক্রয় করিতে পারেন বটে ; কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সফল হইবে না। স্থানীয় লোকের মধ্যে বা নিকটস্থ সহরবাসীদের নিকট অধিকাংশ অংশ বিক্রয় করার চেষ্টা করিতে হইবে।

১০,০০০৲ টাকা লইয়া প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথমেই গ্রামের পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করা উচিত। উক্ত কোম্পানী গ্রামবাসীদের নিকট হইতে পুষ্করিণীর মৎস্য ধরার স্বত্ব লইয়া ঐ পুষ্করিণী সংস্কার করিবেন ; এবং উক্ত পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ করিবেন। ইহাতে মূলধনের অবনতি হইবে না ; বরং কোম্পানী ইহা দ্বারা লাভবান হইবেন। যখন গ্রামবাসীরা দেখিতে পাইবে যে, এই কোম্পানী লাভবান হইতেছে, তখন তাহারা কোম্পানীতে অংশ গ্রহণ করিবে। ইহা দ্বারা গ্রামের মৎস্যকষ্ট নিবারণ হইবে, পানীয় জলের সুবিধা হইবে এবং পুষ্করিণীর মাটি দ্বারা পল্লীবাসীদের বাড়ীর নিকটের অনেক ডোবা পূরণ হইবে। এখন কথা হইতেছে যে, হয় তো অনেকে তাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন পুষ্করিণীর স্বত্ব ছাড়িতে না চাহিতে পারেন। অথচ হয় তো তাঁহাদের উক্ত পুষ্করিণীর সংস্কারের ক্ষমতাও নাই। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী ঐ পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া দিয়া স্বত্বাধিকারীর সহিত এরূপ চুক্তি রাখিতে পারেন যে, যদি তিনি নির্দ্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে নির্দ্ধারিত সুদ সহ টাকা পরিশোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে পুষ্করিণীর স্বত্ব কোম্পানী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন। যত দিন তিনি টাকা পরিশোধ করিতে না পারিবেন, তত দিন পুষ্করিণীর মৎস্য ধরার স্বত্ব কোম্পানীর হাতে থাকিবে। লাভের দিক্ না দেখিলে কোনও লোকই কোনও কার্য্যে যোগ দিবে না। এই কার্য্য দ্বারা প্রথম প্রথম সমবেত চেষ্টার আরম্ভ হইবে। সমবেত চেষ্টার ফলে সমবেত চেষ্টার গুণ উপলব্ধি হইবে।

কোম্পানীর দ্বিতীয় কার্য্য হইবে—ঐ গ্রামের ঋণ-ভারগ্রস্ত দুই চারি জন লোককে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া, এবং তাহাদের কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে খরিদ করিয়া লইয়া তাহাদিগকে মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করা। সকলেই অবগত আছেন যে, কৃষকেরা যখন তাহাদের কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি মহাজনের নিকট বিক্রয় করে, তখন মহাজনেরা তাহাদের প্রাপ্য হইতে 'ঈশ্বর-বৃত্তি' বলিয়া কিছু কিছু করিয়া কাটিয়া লন। বাংলা দেশের মহাজনদিগের গদিতে যথেষ্ট টাকা ঈশ্বর-বৃত্তি খাতে মজুত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কোনও কোনও স্থানে বারোয়ারী প্রভৃতি হয়। কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় হয় না। এখন অনেক স্থল হইতে সে বারোয়ারীও উঠিয়া গিয়াছে। মহাজনেরা এখন যাহা দান করেন, প্রায়ই তাহা ঈশ্বর বৃত্তির তহবিল হইতে। কোম্পানীও যখন কৃষকদিগের নিকট হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিবেন, তখন ঈশ্বর-বৃত্তি কাটিয়া লইবেন। কিন্তু উক্ত ঈশ্বর-বৃত্তি তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির নামে আমানত জমা রাখিবেন; তাহার উপর সুদ চলিবে। এইরূপ করিলে প্রত্যেক বৎসরেই কৃষকদিগের কিছু কিছু জমা হইবে। কোম্পানী যে সমস্ত দ্রব্যাদি খরিদ করিবেন, তাহা যদি তাঁহারা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, তবে তাহা হইতে যে লাভ হইবে, তাহার ষোল আনা অংশের এক অংশ কৃষকের নামে উক্ত কোম্পানীতে আমানত জমা করিয়া রাখিলে আরও ভাল হয়। দুই চারি জনের অবস্থার উন্নতি দেখিলে, অন্য কৃষকেরাও তাহাদের ভার কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করিবে।

তৃতীয়তঃ, কোম্পানী উক্ত গ্রামে লবণ, কাপড়, মশলা, কেরোসিন, ঘৃত, চাউল প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কি পরিমাণে লাগে, তাহা অবগত হইয়া যদি সেই পরিমাণ জিনিস আনাইয়া রাখেন এবং অল্প লাভে উহা

গ্রামবাসীদের নিকট বিক্রয় করেন, তাহা হইলে কোম্পানীরও লাভ হইবে, গ্রামবাসীদেরও সুবিধা হইবে। ইহার পর কোম্পানীর কার্য্যের উপর লোকের শ্রদ্ধা হইলে গ্রামের সর্ব্ববিধ আবশ্যক দ্রব্যই কোম্পানী ভাণ্ডারে রাখিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা কোম্পানী লাভবান হইবেন এবং গ্রামবাসীরাও লাভবান হইবে। এইরূপ করিলে ক্রমে সমবেত চেষ্টার প্রবৃত্তি গ্রামবাসীদের মধ্যে আসিবে। যখন গ্রামবাসীরা দেখিবে যে, কোম্পানীর অংশ লইলে লাভবান হওয়া যায়, তখন সকলেই কোম্পানীর অংশ গ্রহণ করিবে। কোম্পানীর উপর লোকের বিশ্বাস হইলে গ্রামের অনাথা বিধবা প্রভৃতির যাহাদের যাহা কিছু মজুত আছে, তাহারা উক্ত কোম্পানীতে আমানত রাখিবে। তখন কোম্পানীর কোনও বৃহৎ কার্য্যের জন্যও অর্থের অভাব হইবে না; পরন্তু উক্ত গ্রামের কেবল একমাত্র কোম্পানীই মহাজন থাকিবে। তারপর কার্য্য হইবে—কোম্পানীর একটি তালিকা প্রস্তুত করা। গ্রামে কার্য্যক্ষম অথবা নিষ্কর্ম্মা ও স্বল্পকর্ম্মা লোকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা এবং তাহারা কে কি কার্য্যের উপযোগী, তাহা নির্দ্ধারিত করা। প্রত্যেক লোককেই তাহার অবস্থা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য্যে লিপ্ত রাখিতে হইবে, এবং তাহা হইতে তাহারা প্রত্যেকেই যাহাতে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকদিগকে যে সমস্ত কার্য্যের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করা হইবে, তাহাদিগকে সেই সমস্ত কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য লোক আনাইয়া কোম্পানী তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। যখন লোকে দেখিবে যে, বাড়ীতে বসিয়াই উপার্জ্জন করা যায়, তখন অনেকেই সেই কার্য্যে যোগদান করিবে।

গ্রামের মল-মূত্রাদি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা অতি সহজে হইতে পারিবে। তখন গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার সম্বন্ধেও আর বিশেষ বাধা থাকিবে না। প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট হইতে অবস্থা-বিশেষে উর্দ্ধে মাসিক ৵০ এবং নিম্নে মাসিক ৴১০ হিসাবে আদায় করিলে গ্রামে মেথর রাখা যাইতে পারে এবং মল-মূত্র আবর্জ্জনাদি দ্বারা গ্রামের নিকৃষ্ট জমি-সমূহের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিবে।

এইরূপে গ্রামের লোকদিগকে কর্ম্মী করিয়া তুলিতে পারিলে সমবেত চেষ্টায় কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি আপনা হইতেই হইবে। তখন গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, পাঠশালা-স্থাপন, ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠা, বিবাদ-

মীমাংসা প্রভৃতি কার্য্য তাহারা নিজেরাই ব্যবস্থা করিয়া লইবে। লোকের একতা বৃদ্ধি পাইবে। এক সঙ্গে স্বার্থ-সম্পর্কে সর্ব্বদা মিলামিশা করায় পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। গ্রামের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, গ্রামবাসীরাই গ্রামে নির্দ্দোষ উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু এইরূপ আদর্শ প্রথম দেশনায়কদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে গ্রামবাসীরা প্রথমে কোনও কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবে না। 'সরকার বাহাদুর Co-operative Credit Society প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের উন্নতি-কল্পে চেষ্টা করিতেছেন। * দেশনায়কগণও যদি এইরূপ ধরণের কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ গ্রামের অবস্থার উন্নতি হইবে। সম্প্রতি লাটসাহেব বাহাদুর ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্পর্কে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে গ্রামের পূর্ব্বাবস্থা আবার ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সকলের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে। (সাহিত্য সংবাদ হইতে গৃহীত)

* সরকার বাহাদুরের চেষ্টার সহিত দেশবাসীর সমবেত চেষ্টা মিলিত হইলে সুফল লাভের আশা করা যায়। আজকাল পল্লীগ্রাম একরূপ বাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জলকষ্ট, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি লাগিয়াই আছে। বিত্তশালী ভিন্ন, মধ্যবিৎ ও দরিদ্র গৃহস্থ, অর্থাভাব-নিবন্ধন নগর সহরাদিতে বা স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিবার সুবিধা পান না। সুতরাং পল্লীগ্রামের অশেষ কষ্ট-যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। পল্লীগ্রামের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতে নিম্নশ্রেণীর লোক সংখ্যাই অধিক। পল্লীবাসী কৃষকগণ সবল সুস্থ না হইলে অনেক সময় শস্যাদি উৎপন্নেরও ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং উদ্যোগী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যত্নবান হইলে সুফল লাভের সম্ভাবনা। বক্তার কোনও কোনও মন্তব্যের সহিত ব্যক্তিবিশেষের মতানৈক্য হইতে পারে, তথাপি বিষয়টী উপেক্ষণীয় নহে। ২৪ পরগণা সুখচর পল্লীতে সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-বি মহাশয় এইরূপ একটি পল্লীসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি সুখচরে প্রথমে খুব ম্যালেরিয়া ও জলকষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় ও পরিশ্রমে সুখচরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, জলকষ্টও অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমরা প্রতি পল্লীর উদ্যোগী ব্যক্তিগণকে রায় বাহাদুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলি। প্রথমে সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা ফললাভ হওয়াও সম্ভব। বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের কমিশনার সহৃদয় ডাক্তার বেণ্টলি বঙ্গের পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বঙ্গের বিভিন্ন পল্লীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বাস্থ্যাদির তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার সহৃদয়তার জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। পল্লীবাসী উদ্যোগিগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহারও সহায়তা লাভ করিতে পারেন। (সাঃ সং সম্পাদক।)

প্রায়শ্চিত্ত

(উপন্যাস)

প্রথম

স্বদেশীয় হাঙ্গামায় দুইবৎসর কারাবাসের পর, যে দিন রতিকান্ত জেল হইতে মুক্তি পাইয়া আসিল, সেদিন পিতা ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, সব চাইতে আনন্দ হইয়াছিল বুঝি হরদাদার। যে হরদাদাকে সম্পদে, বিপদে, প্রাতে বা রাতে, ঘরে ও বাহিরে, কেহ কখনও হুকা ছাড়া হইতে দেখে নাই, সেই হরদাদা আর সকলের সঙ্গে ষ্টেশনে রতিকান্তকে আনিতে যাইবার সময় হুঁকা লইয়া যান নাই। গোলেমালে তাঁহার সে অশোভন মূর্ত্তি কাহারও চোখে পড়ে নাই, কিন্তু রতিকান্তকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া আলিঙ্গন, প্রণাম, আশীর্ব্বাদের যথোচিত পালা শেষ হইলে পর, ছেলের দল হরদাদার সে বাম হস্তখানির বিসদৃশ রিক্ততায় আগেই নজর করিল। সুরেশ কহিল "এ কি দাদা, মহাদেবের ডম্বুরু কি হারিয়ে গেল? আজ কি সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক ভুল করেছেন? এ তো ভাল লক্ষণ না?"

হরদাদারও এতক্ষণে হুস্ হইল, তিনি কহিলেন "না হে না, এ-টা ভাল লক্ষণই বোলতে হবে, রতিকান্তকে নিতে এসে হুঁকা ভুলে এসেছি, তা ভালই হোয়েছে, হাত আমার খালি যাচ্ছে না"। সমস্ত পথ হরদাদা রতিকান্তকে হাতে বেরিয়া আঁকড়িয়া লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন, বাড়ীতে আসিবামাত্র মেয়েরা আনন্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল, হরদাদা সাশ্রুনয়না চিন্তামণিকে কহিলেন,

"এই নাও বৌ মা, তোমার হারানিধি ফিরিয়ে আনলুম। বলেছিলুম তো, কেঁদোনা মা, রতিকান্ত ফিরে আসবেই। জোয়ান বয়েস, রক্ত গরম, তার উপর ঘাড়ে এখনও বোঝা পড়ে নি, ওদের অমন দু একটা ভুল চুক হোয়েই থাকে; আবার তাও বলি, কোম্পানী বাহাদুরকেও একটু তলিয়ে বুঝতে হয়। হত্তুকীচূর্ণ তাঁদেরও একটু খাওয়া দরকার, মাথাও ঠাণ্ডা হবে, ভাল কোরে বোঝবারও শক্তি বাড়বে। রতিকান্তর জন্যেও ঐ ব্যবস্থা—নয় তো রাতে গোটাকতক হত্তুকী ভিজিয়ে রেখো, সকালে উঠে একটু কোরে খেতে দিও, দুদিনে সব ঠিক হোয়ে যাবে।"

হরদাদা নিজের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সম্বল হরিতকীচূর্ণ রতিকান্তের জন্য ব্যবস্থা করিয়াই সরিয়া পড়িলেন।

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে, পুত্র বিচ্ছেদাকুলা জননী পুত্রকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। কারাবাসক্লিষ্ট সন্তানের বিশুষ্ক ললাট চুম্বন করিয়া মাথার ঘনচুল-গুলির মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে জননীর দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু নিঃশব্দে পুত্রের মস্তকে পড়িল। বাড়ীর আশে পাশে মেয়েরা দাঁড়াইয়া, অশ্রুসজল চক্ষে এ মিলন-দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। হরদাদা সে সকল আর দেখিবার জন্য বিলম্ব করিতে পারিলেন না। বাহিরে নিজের ছোট ঘরটিতে আসিয়া, টিকা ধরাইয়া কলিকায় তামাকু চড়াইয়া, অভিমানিনী হুকা সুন্দরীর সাধ্য সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

দ্বিতীয়

রতিকান্ত আহারান্তে বিছানায় শুইয়া ষ্টেট্সম্যান পড়িতেছিল। বিচক্ষণ সম্পাদকের বিচিত্র মন্তব্যগুলি যুবকের মনে যে ভাবের উদ্রেক করিতেছিল উহা পরাধীন জাতির মনের মধ্যে যে কিছুতেই হওয়া উচিত নয়, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

হরদাদার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এবং প্রত্যহ তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে মিথ্যা কথা বলিয়া পাপ সঞ্চয়ের ভয়ে চিন্তামণি পুত্রকে প্রতিদিন প্রাতে হরিতকী ভিজান জল পান করিতে দিতেন। রতিকান্ত হাসিয়া হরদাদার সে মহৌষধি-টুকু পান করিত। হরদাদার স্থির বিশ্বাস ছিল এ মহৌষধির গুণ ধরিবেই।

চিন্তামণি আহারাদি সারিয়া, পুত্রের কাছে আসিয়া সুপারী কাটিতে বসিলেন। তিনটি ছেলের মধ্যে রতিকান্তই কনিষ্ঠ, দু'টি পুত্রবধূ ঘর সংসার দেখিতেছে, এখন রতিকান্তের বিবাহ দিয়া ঘরে বধূ আনিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। বধূদের এখনও সন্তানাদি হয় নাই, বড় মেয়ের তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বাড়ীর সে অভাব পূরণ করিয়া রাখিয়াছে—চিন্তামণির দুইটি মাত্র কন্যা, অদৃষ্টদোষে বড় মেয়েটি ঐ অপোগণ্ডগুলি রাখিয়া অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ছোটটিও অল্পবয়সে একটিমাত্র পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছে।

মা কাছে আসিয়া বসিবামাত্র রতিকান্ত কাগজ রাখিয়া উঠিয়া বসিল, ডালা হইতে কুচা সুপারী তুলিয়া মুখে দিয়া কহিল, এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেল মা? পেট ভরে খেয়েছ তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছ মা।

পুত্রের মমতাপূর্ণ কথায় চিন্তামণির চক্ষে জল আসিল, এ দুই বৎসর পুত্র

বিরহে তিনি যে কেমন করিয়া কাটাইয়াছেন তাহা তাঁহার অন্তর্যামী দেবতাই জানেন। আহার নিদ্রা কিছুই নিয়মিত ছিল না, মানসিক এত উদ্বেগ অশান্তি সত্ত্বেও যে শরীর টিঁকিয়া আছে এই আশ্চর্য্য।

যে রতিকান্ত বাড়ী ফিরিতে একটু বিলম্ব করিলে তিনি পথ চাহিয়া থাকিতেন, কন্যা কমলাকে দেখিতে পাঠাইয়া দুই দিনের বেশী চারি দিন হইলে, পুত্রের জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িতেন, পাশের ঘরে রতিকান্তকে শোয়াইয়া মাঝে মাঝে রাত্রে আসিয়া ভাল করিয়া মশারীটি গুঁজিয়া দিতেন, পাছে মশা কামড়াইয়া, পুত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত করে। গ্রীষ্মের সময় কপালে হাত বুলাইয়া দেখিতেন নিদ্রাবস্থায় ঘামিয়া উঠিয়াছে কি না, সেই রতিকান্তকে দুইবৎসর ছাড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল, সে কি কম দুঃসহ বেদনা। যখন প্রিয়জনের সহিত ইহলোকের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তীব্র বেদনার প্রথম আঘাত অত্যন্ত কঠিন হইলেও শীঘ্রই সহিয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীতে বাস করিয়া, দৈব-দুর্ব্বিপাকে যে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহার ব্যথা বড় মর্ম্মান্তিক – বড় সাংঘাতিক। রতিকান্তের বিরহে জননী যে যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন তাহা স্নেহময়ী মাতা ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে? সতীকান্ত, উমাকান্ত মাতাকে কত সান্ত্বনা দিত,তাহাদের মুখ চাহিয়া তিনি কোনও রকমে প্রাণ ধরিয়াছিলেন। শ্রীকান্ত বাবু বৃদ্ধ বয়সে নিজেই এ দুর্দ্দৈব ঘটনায় যথেষ্ট সন্তপ্ত হইয়া, কোনও রকমে দিনাতিপাত করিতেছিলেন,তখন সকাতরা পত্নীকে আর বিশেষ কি প্রবোধ দিবেন? তবে রক্ত মাংসের সম্পর্ক না থাকিলেও, এই হরদাদা পরমাত্মীয়ের কাজ করিয়াছেন। প্রাণস্পর্শী সান্ত্বনা ও আশ্বাস-বাক্যে বাটীর প্রত্যেককেই প্রত্যহ কত মতে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, ভগবান বিশ্বাসীর সে সান্ত্বনা-বাণী জয়যুক্ত করিয়াছেন।

মাতার অশ্রু দর্শনে, রতিকান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, চিন্তামণি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—বাবা রতি, তুই চারটে পাশ করা ছেলে, তোর কত বিদ্যে, কত বুদ্ধি। তোর দুই দাদা উকিল হয়েছে বোলে, তোকে আর আইন পড়তে দিলুম না, এই জমিদারী দেখবার জন্যে তো একজনকে চাই, উনি পেন্সান নিয়ে ঘরে থাকলে কি হবে, এখন কি আর এ বয়সে, ঘুরে ঘুরে দেখা শুনো কোরে বেড়াতে পারেন? তুই-ই ঘরে থাকবি, এ সব দেখা শোনা করবি। তা কার কুপরামর্শে এমন ফ্যাঁসাদ ঘটিয়ে বস্‌লি। তুই আমার সুবোধ ছেলে, এমন অন্যায় কাজ তোকে কি সাজে বাবা!

কমলা তোর জন্যে বড় কাতর হয়েছে, তাকে আনতেও পারি না, এলে তার ঘর চলে না, হরদাদাকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে একবার যাবি, তোকে দেখলে তবে তার বুক ঠাণ্ডা হবে। অনেক দূরের পথ, কাউকে পাঠাতেও পারি না। ছোট ছেলেটি নিয়ে অল্পবয়সে বিধবা হোলো, বাছার আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, ছোট ভাইটি অন্ত প্রাণ। তোকে কাছে পেলে দু'দিন থাকবে ভাল। আর মহেশ বাবুদেরও চিঠি পাঠিয়েছি, আমি তোরে শীগ্গীর সংসারী কোরতে চাই।

রতিকান্ত নিঃশব্দে মাতার এতগুলি কথা শুনিয়া লইল। যতখানি দোষ সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে দুই বৎসর কাল কারাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, ততখানি দোষ তাহার না থাকিলেও, সে নিজেই নিজের ভ্রম, ত্রুটির জন্য যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতেছিল। এখন কেমন করিয়া, কোনও একটি বড় কাজের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করিয়া, এ অপরাধের দায় হইতে মুক্তি পাইবে. আজকাল সে কেবল ইহাই ভাবিতেছে, তাই মাতার [illegible]গুলি তাহার প্রাণে বড় বাজিল। মাতার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া কহিল, আমাকে তুমি মাপ কর মা, তোমার আর কোনও ভয় নাই, এবার তুমি আমায় বিশ্বাস কর, তোমার মনে ব্যথা লাগবে এমন কাজ আর আমি কোরবো না।

মাতা সস্নেহে পুত্রের ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন, সে কি বাপ, আমি কি তোর ওপর রাগ করেছি যে মাপ কোরবো? ছেলে যত ভুলচুক করুক, মার কাছে তার কোনো লজ্জা নেই, ভগবান্ তোর মঙ্গল করুন।

যাঁতি রাখিয়া স্নেহময়ী জননী পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, সোনার দেহ কালী হয়ে গেছে। সবাই শীগ্গীর কোরে বিয়ে দিতে বলছে, আমি কিন্তু মহেশ বাবুর প্রত্যাশায় বসে থাকতে পারবো না. দেশে ললিতার মতো মেয়ে কত পাওয়া যাবে, বৈশাখ মাসে আমি শুভ কাজটি সুভালা ভালিতে সারতে চাই-ই, তা তোকে শুনিয়ে রাখলুম।

রতিকান্ত উত্তর দিল না, দাসীর আহ্বানে চিন্তামণি উঠিয়া গেলেন, রতিকান্ত বুঝি ধ্যানে বসিল। তাহার মানসে ললিতার ছবি জাগিয়া উঠিল, দুইবৎসর পূর্ব্বেকার আনন্দ-রঞ্জিত দিনগুলি যেন চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, হাস্য-পরিহাস-নিপুণ বাক-চতুরা ললিতার সরল মাধুরী, চা—এর টেবিলে বসিয়া, সন্ধ্যা সকালে, গল্প-গুজব, ললিতার লাজ-নম্র

ব্যবহার, মহেশ বাবুর সহিত যুক্তিপূর্ণ তর্ক, সবই একে একে রতিকান্তের মনে পড়িতে লাগিল।

কারাগৃহে আত্মীয় স্বজন বিচ্ছেদ-বেদনার স্মৃতি-মধ্যে, ললিতার স্মৃতিও তাহার মনে তেমনি পরিস্ফুট ও সমুজ্জ্বল ছিল। আর ললিতা,—সেও কি এমনি সমভাবে, তাহার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধরিয়া আছে? যদিও তাহার নিকট হইতে কখনও ভাষায় প্রণয়বাণী সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু দৃষ্টির মধ্যদিয়া, সরল অন্তরের যে ভাষা পড়িতে পারা যায়, তাহাই কি নব প্রণয়ীর পক্ষে যথেষ্ট নয়? দুই বৎসরের দীর্ঘ দিন গুলির অন্তরালে, সে ছবি কি কিছু ম্লান হয় নাই? এতখানি আশার কথা তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু অবিশ্বাস করিতেই বা প্রবৃত্তি হয় কই? রতিকান্তের প্রণয়-বিহ্বল-মুগ্ধ-মানস, বক্ষের নিভৃত কন্দরে বসিয়া গাহিতে লাগিল "ললিতা, চিরমনোরমা প্রিয়তমে, এই লাঞ্ছিত বিড়ম্বিতকে কি তুমি তেমনি সাদরে গ্রহণ করিতে পারিবে?"

তৃতীয়

ছেলেদের হৈ-হৈ শব্দ কাণে আসিবামাত্র, হরদাদা ঘরের জানালাটা ভেজাইয়া দিলেন। কিন্তু 'যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যে হয়' এ পুরাতন প্রবাদবাক্য মিথ্যা হইবার নয়। ছেলের দল হরদাদার দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু গোটা কতক না ঢুকিতেই ছোট্ট ঘরটি ভরিয়া গেল। হরদাদা তামাক সাজিতেছিলেন, সশব্যস্তে কহিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর জুতর ধূল গুলো ঘরে ভিতর দিয়ো না, চল ঐ আমগাছ তলায় বোসবে চল, আমি আসছি। ছেলের দল যখন তখন আসিয়া হরদাদাকে লইয়া গল্প গুজব করিতে বসিত। আজ বোধহয় দাদার গল্প বলিবার মতো মেজাজ ছিলনা, সেই জন্যই দূর হইতে এই ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে দেখিয়াই, উহাদের দৃষ্টিকে এড়াইবার জন্য জানালা ভেজাইয়া দিয়া পার পাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ফন্দী ব্যর্থ হইয়া গেল। কোনোপ্রকার অছিলা আর এখন নিরর্থক জানিয়া, তিনিও ভাল মানুষটির মতো হুঁকা হাতে দলবল লইয়া আমগাছটির তলায় আসিয়া বসিলেন। অমূল্য বলিল, আজ কিন্তু খুব জিতেছি, ওদের দল আজ মোটেই খেলতে পারে নি।

ব্রজলাল কহিল, ওদের স্কুলের দল, দুই বার থেকে আর আমাদের সঙ্গে ম্যাচ্ দিতে পারে না, ওদের পাণ্ডা ছিল শিবনাথ, সে মরে গিয়ে পর্য্যন্ত ওরা কাপ্তেনশূন্য হয়ে পড়েছে।

অক্ষয় কহিল, শচী বলছিল, রতিদাকে না কি ওরা কাপ্তেন কোরবে।

অমূল্য কহিল, তা হোলে কিন্তু সামাল সামাল ডুবলো তরী, রতিদা পাকা খেলোয়াড়, উনি যদি কাপ্তেন হন, আমাদের দল নীচু হয়ে যাবে।

হরদাদা কহিলেন, তা এ পাড়ার দল রতিকে ও পাড়ার দলে যেতেই বা দেবে কেন? তোমরাই কেন রতিকে আগে থাকতে কাপ্তেন কোরে নেও না। অমূল্য ও অক্ষয়ের চোখে চোখে টেলিগ্রাম হইয়া গেল, পুলিশ-চিহ্নিত, রতিকান্ত এখন যে ছেলেদের দলপতি হইবার অনুপযুক্ত, প্রত্যেক অভিভাবকই ছেলেদের তাহা বুঝাইতে সুর করিয়াছেন, ছেলেদের দলে তা লইয়া বেশ একটি আন্দোলন চলিয়াছে। রতিকান্তকে সকলেই যথেষ্ট ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত, তাহার নেতৃত্বে সকলেই গৌরব অনুভব করিত, কিন্তু গুরুজনের অবাধ্য হওয়া উচিৎ নয় এবং হরদাদা রতিকান্তকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, সেজন্য তাঁহাকে এ কথার আভাস জানাইয়া বেদনা দিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না।

ব্রজলাল বলিয়া উঠিল, একটা গল্প বলুন দাদা, খেলে টেলে ক্লান্ত লয়ে পড়েছি, শুনে ঘরে যাই। অক্ষয় কহিল, সেই ভাল, কিন্তু আজ একটা নূতন গল্প চাই দাদা, হর্তুকীর মহিমা আর প্রচার কোরবেন না।

হরদাদা মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হরিতকীর নিন্দে ভুলেও করো না ভায়া, বয়েস পাকুক,ওর কদর বুঝবে তখন। দীনেশ কহিল, হরদা, আমি একটা পৈট্রী লিখেছি, সেটার নাম দিয়েছি 'হরিতকী স্তোত্র'—সত্যি!

সত্য কহিল, হেডিংটাই যা লিখেছ, পৈট্রীর তো মোটে এক কলি লিখে আর মেলাবার যোগ্যতা হয় নি,ভারি আমার পৈট্রী' এই শুনুন হর দা,—

জয় জয় জয়, হর্তুকীর জয়,
গাও কোটী কণ্ঠ মিলে—

দীনেশ অপ্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু হারিলে লোকের লজ্জাটা রাগের আকারেই প্রকাশ হয়, সংসারের নিয়মই এই। তাই সে কহিল, ঐ এক কলিই লেখ, দেখি একবার যোগ্যতা। পৈট্রী অমনি লিখলেই হলো না, ঐ দু'লাইন লিখতে কাল রাত্রে আমার হিষ্ট্রী জিয়োগ্রাফীর পড়া হয় নি।

হরদাদা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, হবে হবে, অমনি কোরেই হবে, এক এক কলি কোরেই লিখতে লিখতে গোটা টা হোয়ে যাবে, ব্যস্ত কিসের।

অক্ষয় আবার তাড়া দিল—গল্প বলুন হর দা।

হর দাদা হুকাটি মুছিয়া,সাবধানে এক পাশে রাখিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হইয়া, তাঁহার কত খানি বৈরাগ্য হইয়াছিল, যাহার প্রবল ধাক্কায় তিনি আঠার বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী সাজিয়া গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাড়ীতে বাপ মা ছিলেন না, ছিলেন এক দূর সম্পর্কীয়া মাসীমা,তাঁহার উপর স্নেহের আধিপত্য বড় একটা ছিল না,যেটুকু ছিল বুঝি সেটা লৌকিক ও মৌখিক। কাজেই পথে পথে ঘুরিয়া, কতদিন অনশন-ক্লেশ সহ্য করিয়াও ঘরের টানে আর তাঁহাকে ফিরাইতে পারে নাই। গেরুয়ার চাপরাশ একবার পরিতে পারিলে আর যেখানকার দুয়ার বন্ধ হউক,দেব-মন্দিরের প্রাঙ্গণ তো বন্ধ হইতে পারে না। হরদাদা অনায়াসেই তীর্থে তীর্থে ঠাকুর-মন্দিরে দু' চার দিন করিয়া বাস করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ যেন বড় ফাঁকা, বড় উদাস বোধ হইত, হঠাৎ এক দিনের একটি ঘটনা তাঁহার জীবনে এক নূতন অঙ্কের সূচনা করিল। এক ধনাঢ্য জমীদার দেবদর্শনে আসিয়াছিলেন, মন্দিরে সস্ত্রীক পূজারতিতে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। দুইবৎসরের একমাত্র আদরিনী কন্যা মুনি যে এই অপরিচিত দেশে, ভিড়ের মধ্যে, বার বৎসরের বালক ভৃত্য হরিয়ার কোলে, মূল্যবান গহনাদি পরিয়া এতক্ষণ রহিয়াছে সে কথা কাহারও মনে নাই। দরোয়ানকে কাপড় আনিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। একজন দুষ্ট লোক সহজেই নিঃসঙ্গ বালক ভৃত্যটির নিকট হইতে মুনিকে চাহিয়া লইয়া বাহিরের দিকে গেল। এদিকে সাধু-সঙ্গ-গুণে হরদাদার গাঁজায় দম দেওয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তিনি অদূরে বসিয়া গাঁজা টিপিতেছিলেন, দুষ্ট লোকটির চেহারা তাঁহার চখে ভাল লাগে নাই, ফুটন্ত ফুলের মত সুন্দর মেয়েটিকেই বা সে কোলে লইয়া বাহিরের দিকে গেল কেন? তিনি গাঁজা ফেলিয়া বালক ভৃত্যটির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও কোথায় গেল? খুকীকে নিয়ে গেল কেন? ভৃত্য কহিল, বাবু খুকীকে চেয়েছেন, খুকীর নামে পুজো হবে, তাইতে নিয়ে গেল। হরদাদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া লোকটার সন্ধানে গেলেন।

চতুর্থ

হরদাদাকে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, কেহ কেহ হাসিয়া উঠিল। অক্ষয় চঞ্চল ভাবে কহিল, তারপর দাদা? হরদাদা বুঝি এতক্ষণ মানস-চক্ষে সেই বিগত ঘটনার স্মৃতি-ছবি দেখিতেছিলেন, মুনির

হাসি মাখা, কুসুম-সুকুমার মুখখানি নিমিষে কেমন করিয়া তাঁহার বক্ষের সমস্ত শূন্যতা ভরিয়া দিয়াছিল, তার কণ্ঠস্বর, মধুর আহ্বানে কেমন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সুপ্ত-বাৎসল্য ভাবকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, কি করুণমর্ম্মস্পর্শী, অথচ আনন্দপূর্ণ সেই স্মৃতি !

ভালবাসিয়া, স্নেহ করিয়া, সেই স্নেহের ধনকে কালের নির্ম্মম করে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়া যে দাগা পায়, সে এক রকম ভাগ্যহীন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কখনও ভালবাসার স্বাদ পায় নাই—যে কখনও প্রাণ ঢালিয়া স্নেহ মমতা করিবার অবসর পায় নাই, তার চাইতে হতভাগা জগতে বুঝি আর নাই। মনুষ্য জীবনে বিশ্ব-দেবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানেই যে সে বঞ্চিত রহিয়া গেল। হরদাদার মনে পড়িল, ভগবানকে ধন্যবাদ যে, জীবনে সে বঞ্চনার হাত হইতে তিনি এড়াইতে পারিয়াছেন। ছোট বেলায় পিতৃ মাতৃহীন হইয়া, আত্মীয় বন্ধুহীন গৃহে, নির্ম্মল স্নেহের সম্ভোগে তিনি বঞ্চিত হইয়া সংসারে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, ভাই বোনেব সরল পবিত্র ভালবাসা, স্নেহের মাধুর্য্য রসের ছোপ তাঁহার অন্তঃকরণে ধরাইতে পারে নাই। একটু বয়স হইলে, লেখা পড়ায় তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে মনে উদ্দেশ্য ছিল, লেখা পড়া শিখিয়া তিনি একজন বড়লোক হইবেন। কিন্তু প্রথম উদ্যমেই তাঁহার সমূহ চেষ্টা—আশা ভঙ্গে তিনি যেন একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া গেলেন। সংসারে তাঁহার স্নেহের বন্ধন ছিল না, তবু তিনি গ্রাম ছাড়িয়া ১৭ বৎসর বয়সের মধ্যে তখনও সহরে যান নাই, কিন্তু তারপর সংসারের নিকট ছুটী লইয়া একেবারে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু প্রাণের মধ্যে দিনের পর দিন যেন একটা কিসের শূন্যতা বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার মনে হইল, এ শূন্যতা বুঝি চিরদিনই তাঁহার বক্ষ জুড়িয়া আছে, শুধু এতদিন তাঁহার বুঝি চিনিবার শক্তি হয় নাই, কিন্তু এ শূন্যতা কিসের জন্য তাহার সন্ধানই বা মিলিবে কোথায় ?

তারপর যখন সেই দুষ্ট লোকটার অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, সে ছোট্ট মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—খেলেনা লইবে, কি খাবার খাইবে ? তাঁহাকে দেখিয়া যেন লোকটা থতমত খাইয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কার খুকী ? লোকটার মুখে অপরাধীর ছাপ যেন স্পষ্ট আঁকা ছিল। বালিকাকে হাত বাড়াইয়া লইতে যাইবামাত্র, সে যেন পরিপূর্ণ নির্ভরতার সহিতই তাঁহার কোলে ঝাপাইয়া আসিল, আধ আধ কণ্ঠে কহিল, আমি বাবা যাব,

ফুল নেবো—খাবা খাব, ইতি পূর্ব্বে যদিও সেই দুষ্ট লোকটা মুনিকে ফুল ও খাবারের প্রলোভন দেখাইতেছিল, মুনি কিন্তু তাহা পছন্দ করে নাই। হরদাদা বালিকাকে বুকে চাপিয়া চুমা খাইলেন—কি অপূর্ব্ব আনন্দরসে তাঁহার অন্তরাত্মা অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, নিমেষে আজ তাঁহার হৃদয়ের সেই নিবিড় কালো মেঘ ভেদ করিয়া মুনির সমুজ্জ্বল গোলাপী মুখখানি সেইখানে ঝল ঝল করিতেছে।

মুনির পিতা মাতা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার হরদাদাকে ধন্যবাদ জানাইলেন। তাঁহার পরিচয় লইয়া সহজেই এই আত্মীয়-বান্ধব-হীন যুবাটির প্রতি স্নেহশীল হইয়া পড়িলেন। মুনি তিন চার দিনেই হরদাদার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। হরদাদা জীবনে যাহার স্বাদ পান নাই, আজ হঠাৎ সেই স্নেহামৃত পানে যেন বিভোর হইলেন, সুতরাং যখন মুনির পিতা মাতা তাঁহাকে তাঁহাদের সঙ্গে লইতে চাহিলেন, মুনির মায়ায় পড়িয়া সহজেই তিনি সম্মত হইলেন। সাধের গেরুয়া ছাড়িয়া গাঁজার কলিকা বিসর্জ্জন দিয়া, ভদ্র ছেলের মতো মুনিদের দেশে গেলেন। মুনি তাঁহাকে মায়ার শত বন্ধনে বাঁধিয়া, অবশেষে সেই সমস্ত বন্ধন নিমেষে ছিন্ন করিয়া ছয় বৎসরের মুনি কোথায় পলাইয়া গেল। তাহার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তিরোভাবও তার চাইতে কিছু কম বিস্ময়কর নহে। হরদাদার বুকে বড় বাজিল, সন্তানহীন শোকাতুর জনক-জননীর সংবাদ না রাখিয়া, তাঁহাদের নিকট একবার বিদায়-বাণী উচ্চারণ না করিয়া, তিনি আর একবার সংসারের বাহির হইয়া পড়িলেন। মুনি-শূন্য ঘরবাড়ীর দৃশ্য যেন তাঁহার চক্ষে তপ্ত শলাকার মতো বিঁধিতেছিল, সে অসহ্য দৃশ্যের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনির্দ্দিষ্ট পথে আর একবার যাত্রী হইয়া বাহির হইলেন। কত দেশ ঘুরিলেন। কালে শোকের জ্বালা লাঘব হইয়া আসিল, কিন্তু মুনির স্মৃতি তাঁহার অন্তর-পটে চির সমুজ্জ্বল হইয়াই রহিল।

কত দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ শ্রীকান্ত বাবুর সহিত আলাপ হইয়া গেল। এক সন্ন্যাসীর নিকট হরিতকীর মহৎগুণ শুনিয়া শুনিয়া ক্রমে হরদাদা হরীতকীর একজন পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীকান্ত বাবুর একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি তাঁহার সহিত তাঁহার দেশে আসিলেন। বার বছরের রতিকান্তকে দেখিয়া, সহজেই তাঁহার চিত্ত আবার একবার গলিয়া গেল, কতদিন পরে আবার তিনি সেই স্নেহাস্বাদ ফিরিয়া গ্রহণ করিলেন।

হরদাদার সরল,সুন্দর স্বভাব সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করিল। অবশেষে তাঁহার সহিত গ্রাম শুদ্ধ লোকের দাদা সম্পর্ক হইয়া গেল। যদিও তাঁহার বয়স তখন ৩৫ | ৩৬এর বেশী হয় নাই, কিন্তু ছেলে হইতে বুড়া পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। তিনিও এই পরিবারের ও সকলের পরমাত্মীয় হইয়া দিনের পর দিন, গল্প করিয়া, আর সর্ব্বরোগ-হরা হরীতকীর মহিমা প্রচার করিয়া নিরুদ্বেগে কাল কাটাইতে ছিলেন।

হরদাদার অতীত জীবনের এই করুণ ইতিহাস, ছেলেরদলের সরল চিত্তকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। গল্প শেষ হইয়া গেল, কাহারও মুখে কথা নাই, হঠাৎ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যতীন বলিয়া উঠিল, এ তো গল্প নয় হরদা, এ যে সত্যিকার কথা!

বালকের মনে গল্পের মানুষদের দুঃখ বেদনার কথা সত্যকার মতই আঘাত দেয়, কিন্তু সে গুলি সত্য নয়—কাল্পনিক মিথ্যা, এই ভাবিয়াই সকলে সে বেদনার কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলে, কিন্তু আজ হরদাদার নিকট গল্পচ্ছলে যে কাহিনী শুনিল, তাহার ব্যথা তো সহজে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার নয়, যতীনের মনে সব চাইতে বুঝি তখন ঐ কথাটাই উঠিতেছিল। (ক্রমশ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

কুশদহের ইতিহাস

বণিক, বঙ্গদেশে বণিকের শ্রেণী পাঁচটি। ব্যবসাভেদে শ্রেণী, ভেদ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথম শ্রেণী মণিবেনে অর্থাৎ যাঁহারা হীরা মুক্তা প্রবালাদি বিক্রয় করেন। দ্বিতীয় শ্রেণী গন্ধবণিক। এই শ্রেণীর লোকের ব্যবসা অনেক প্রকারের। প্রথমতঃ, গন্ধদ্রব্য—চন্দন, কর্পূর, কস্তুরী, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, জঠামাংসী প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ,—এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনী, ধনিয়া,মহুরী প্রভৃতি মসলা। তৃতীয়তঃ-ঔষধ প্রস্তুতের উপকরণ—যথা, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, কুমটী, কণ্টিকারী, শুট,—ওলটকম্বল, রক্তকম্বল ইত্যাদি। চতুর্থতঃ, লবণ। গন্ধবণিকেরা

কেবল যে উপরি লিখিত দ্রব্যগুলির ব্যবসায় করিয়া ক্ষান্ত থাকেন তাহা নহে, গৃহস্থের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাঁহারা বিক্রয় করেন। সোনার বেনেরা স্বর্ণব্যবসায়ী অর্থাৎ পোদ্দারী করেন। টাকা ধার দিয়া সুদ গ্রহণ তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। পঞ্চম বণিকেরা কেবল শঙ্খ প্রস্তুত ও বিক্রয় করেন। কাংস বণিকেরা কাঁসার দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া থাকেন। বেনের ছেলেরা প্রায়ই চাকরী স্বীকার করিতে নারাজ। জাতি ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সকলেই প্রায় উদ্যোগী। বণিকগণের মধ্যে এইরূপ আত্ম-নির্ভর ক্ষমতা আছে বলিয়াই আজও দেশীয় লোকের হস্তে যাহা কিছু ব্যবসাবাণিজ্য রহিয়াছে। বণিক পুত্রেরা তাঁতি প্রভৃতি শিল্পীগণের ন্যায় চাকরীর মোহে পড়িলে আজ কি দুর্গতি ভোগ করিত তাহা বলা যায় না।

ভৃগুরাম-সংহিতা বা পরশুরাম-সংহিতায় বণিকের এই পাঁচটী শ্রেণী দেখা যায়। তাহা হইতে বুঝা যায়, একই বণিক ব্যবসায় ভেদে পাঁচ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মত অনুরূপ, উক্ত গ্রন্থে দেখা যায় অম্বষ্ঠ ও গন্ধবণিকের পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা বৈশ্যা। কাংসকার ও শঙ্খকার গন্ধবণিকের ন্যায় উৎপন্ন। কিন্তু সুবর্ণবণিকের পিতা অম্বষ্ঠ ও মাতা বৈশ্যা। পরশুরাম সংহিতার মতে গন্ধবণিকেরও পিতা অম্বষ্ঠ ও মাতা রাজপুতকন্যা। যাহা হউক, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে বণিক জাতিগুলি সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত। বণিকেরাই যে প্রাচীণ কালের বৈশ্যজাতির বংশধর তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বল্লালচরিত পুস্তকে উল্লিখিত আছে, গৌড়ে অর্থাৎ বঙ্গদেশে বণিকেরা সঙ্গদোষে রাজ কোপে ও আচার বর্জ্জিত হওয়ায় পতিত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে বণিকজাতি কতকাল হইতে গৌড়দেশে (বাংলায়) বাস করিতেছেন, কোথা হইতে বা তাঁহাদের আগমন হইল এবং কিরূপেই বা তাঁহারা সঙ্গদোষে পতিত হইলেন।

বণিকজাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা বৎস রাজের রাজধানী কৌশম্বী নগরে সুখে বাস করিয়া ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। পরে কোন কারণে একদল গুর্জ্জর দেশ হইয়া উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে ও পরে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা কৌশম্বী বণিক নামে পরিচিত আর একদল গঙ্গাপ্রবাহের অনুসরণ করিয়া বিশার্ণ পর্ব্বতের সানুদেশ

লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (আসামে) বাস করেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বণিক নামে অভিহিত হন।

যাহা হউক, গন্ধবণিকেরা যে কৌশম্বী হইতে বাংলা উড়িষ্যা ও আসামে আসিয়া বাস করেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। কৌশম্বীতে তাঁহারা নিরুপদ্রবে বাস করিতেছিলেন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ, কোন বিশেষ উপদ্রব বা বিপ্লব উপস্থিত না হইলে স্বদেশ ছাড়িয়া দলে দলে বিদেশ যাত্রা করেন নাই। যখন কৌশম্বীপতি বৎসরাজের নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহারই সময়ে বা তাঁহার রাজ্যাবসানে যে এই উপনিবেশ স্থাপন ঘটিয়াছিল তাহা মনে করা যাইতে পারে।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গৌড় ও বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মরুভূমিতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সম্ভবতঃ, বৎসরাজের পলায়নের সময় রাজধানীর সমৃদ্ধ নগরবাসিগণ তাঁহার সহিত পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু মরুভূমিতে অধিক দিন অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া বণিকগণ প্রথমে গুজরাটে, পরে মধ্যদেশে এবং শেষে উড়িষ্যায় ও বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেননা, এসময় গৌড় ও উড়িষ্যা পাল রাজগণের শাসনাধীনে শান্তি ভোগ করিতেছিল। উত্তরাপথে খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগে ও নবমশতাব্দীর প্রথমভাগে পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব ঘটায়, বণিককুল আকুল হইয়া পড়েন এবং শেষে কেশরী ও পালরাজগণের আশ্রয়ে বাস করিয়া নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। দেশে তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোত চলিতেছিল সুতরাং সে সংশ্রবে বণিকগণের ভিন্ন আচার হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রবাদ আছে, বণিকগণ যখন বঙ্গদেশে প্রথম আসিয়াছিলেন তখন তাঁহারা ঘোর শৈব ছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, চাঁদ সদাগর শিবের উপাসক ছিলেন। শিব ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই—থাকিতে পারে না, শিব সকলের ঈশ্বর এই অটল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনসা পূজা করিতে অসম্মত হন। মনসাও নাছোড় বান্দা; চাঁদ সদাগরের নিকট পূজা না পাইলে জগতে তাঁহার পূজা প্রচারিত হয় না এই জন্য তিনি অশেষ

প্রকারে চাঁদকে নিগৃহীত করিতেছেন। একে একে চাঁদের বাণিজ্য পোতগুলি জলমগ্ন করিলেন। এক একটি করিয়া চাঁদের ছয়টি পুত্রকে যমসদনে পাঠাইলেন। চাঁদ তথাপি অটল! চাঁদ জানেন, তাঁহার ইষ্টদেবও যেরূপ শোক-মোহ, সুখ দুঃখ, কামক্রোধাদির অতীত, তাঁহার ভক্তগণ সেইরূপ হইতে চেষ্টা না করিলে, তাঁহাকে পাইতে পারেন না, —কাজেই পুত্রনাশ, অর্থনাশ, মনস্তাপ ও পরিজনের গভীর শোকে চাঁদ চিত্ত-দৌর্ব্বল্য দেখাইলেন না—তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিল না। পরিশেষে ভগবান্ দেবাদিদেব যখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা, তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইলেন, তখন ভক্তের ভগবান ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নাই—যত্র জীব তত্র শিব। বৃক্ষলতা গুল্ম হইতে সামান্য কীট পতঙ্গ সমস্তই তিনি (?) সুতরাং মনসা ও তাঁহাতে ভেদ নাই। নাম ভেদ মাত্র। ভগবৎ কৃপায় চাঁদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল। চাঁদ শিবময়জগৎ দেখিলেন, তখন আর মনসাতে তাঁহার অশ্রদ্ধা রহিল না, নিজ ইষ্টদেবের নাম ও রূপান্তর মনে করিয়া তিনি তাঁহার পূজা করিলেন। ভগবানও সদয় হইয়া তাঁহার যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছিল সমস্তই প্রত্যর্পণ করিলেন। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ধনপতি সদাগরকেও এইরূপ শিবোপাসক দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রিয়তমা পত্নী খুল্লনার অনুরোধে চণ্ডী মানিতে অসম্মত—পূজা করা দূরে থাকুক, চণ্ডীর ঘট দূরে ফেলিয়া দিয়া ধনপতি বাণিজ্যার্থ সিংহলে যাত্রা করিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা চণ্ডীকাব্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (বি-এ)

কে বড় ?

আত্মার শক্তি না দেহের শক্তি ?

অধ্যাপক মরে হিবার্ট "জর্ণাল" নামক প্রসিদ্ধ পত্রে আত্মার শক্তি কেমন তাহা বুঝাইবার জন্য মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধির শক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি নামক এক যুবক

আইন পাঠের জন্য ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তিনি ধনী ও কার্য্যকুশল জ্ঞানোজ্জ্বল পরিবারসম্ভূত, ভদ্র ও বিনয়ী। সাধারণে যেমন পোষাক পরিয়া চলা-ফিরা করে, তিনিও তেমনই করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার কোন বিশেষত্ব ছিল না। মদ্য স্পর্শ করিব না ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইব না, তখনই তিনি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের সঙ্কল্প কেহ জানিত না। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই নগরে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে ব্যবসায়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্মই তাঁহার অনুরাগের বিষয় ছিল। ক্রমে তাঁহার বাসনাশৃঙ্খল ছিন্ন হইল ; সামান্য অর্থ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাখিয়া আর সমস্ত বিত্ত-সম্পত্তি সৎকার্য্যে দান করিলেন। জোর জুলুমের সাহায্যেও লোকে স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত করে, সুতরাং আদালতে কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মহানি হইবে বলিয়া তিনি শেষে ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিলেন।

বহুদিন পরে ১৯১৪ সালে পুনরায় ইংলণ্ডে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কেবল ভাত ও জল খাইতেন ও ভূমিতলে শয়ন করিতেন। তাঁহার স্ত্রী যথার্থই তাঁহার সহধর্ম্মিণী—তিনি সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর অনুসরণ করিতেন। মিঃ গান্ধির কথাবার্ত্তায় শিষ্টতা ও বহুশ্রুতের পরিচয় পাওয়া যাইত। সাধুর লক্ষণ তাঁহাতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার জন্মভূমিকে ভালবাসেন সুতরাং ভারতীয় ভাবে ভারতের নবজীবন সঞ্চার করাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তিনি মানুষে মানুষে পার্থক্য রাখিতে চান না, জগতের ধনীর নিকট শ্রমজীবীর দাসত্ব, ধনৈশ্বর্য্যমূলক সভ্যতা, অর্থের পূজা ও জাতিতে জাতিতে সংগ্রামের তিনি বিরোধী। প্রাচ্যদেশের অধিবাসীগণ সাধুদিগকে বড় ভক্তি করেন। কেহ সাধু কি অসাধু, জনসাধারণ স্বার্থত্যাগের দ্বারাই তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকে। দরিদ্র ব্রত অবলম্বন কর, অন্ন ও জল খাইয়া সহজ ভাবে প্রাণ ধারণ কর, জনসাধারণ তোমার উপদেশ ভক্তির সহিত শ্রবণ করিবে। ভাল খাও, ভাল পর, তোমার কথায় কেহই কর্ণপাত করিবে না।

জনসাধারণের মনের উপর গান্ধির অসাধারণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে তিনি জয়যুক্ত হইয়াছিলেন তাহার কারণ এই,—

তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কাহারও কোন অনিষ্ট করিবেন না, কাহারও উপর অত্যাচার করিবেন না, কিন্তু তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহাকে যে দণ্ড দিবেন তাহা সহ্য করিবেন। দণ্ডদান করিতে করিতে এমন দিন আসিবে যখন বিপক্ষেরা শ্রান্ত এবং আপনাদের কৃতকার্য্যের জন্য লজ্জিত হইবে। তিনি যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার মূল মানবাত্মার সহিত দৈহিক ও আর্থিকশক্তির বিবাদ। তাহার ফল চিরদিন যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। দৈহিক ও আর্থিক শক্তি আপনার পতাকা ফেলিয়া দিয়া অবশেষে আত্মার চরণে অবনত হইয়াছে।

যাহারা ইন্দ্রিয়ের আনন্দকে তুচ্ছ করে—যাহারা ধনকে গ্রাহ্য করে না, পার্থিব সুখ, প্রশংসা বা মর্য্যাদা যাহার নিকট কিছুই নয়, যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া জানে তাহাই পালন করিতে বদ্ধপরিকর, এমন লোকের সহিত বিরোধ করিতে সম্রাট্ যিনি তাঁহারও সতর্ক হইতে হয়। কারণ তুমি তাঁহার শরীরকে জয় করিতে পার কিন্তু এমন কিছুই নাই যদ্দারা তুমি তাঁহার আত্মাকে ক্রয় করিতে পার।"

অধ্যাপক মরে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। গান্ধি দেহ নহেন তিনি আত্মা। সুতরাং তিনি নির্ভয়, মোহ-প্রলোভনের অতীত। চিন্ময় যে তাহাকে বাঁধিবে কে? (সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত)

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

বঙ্গীয় হিতসাধন সমিতির বিগত প্রদর্শনী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগৃহীত হইল :—

শিক্ষার অবস্থা

বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশের অবস্থা কি? এই দেশের ৭ জন পুরুষের মধ্যে ৬ জনে এবং ৯৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন অক্ষর পড়িতে জানে। এই দেশে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার তালিকা।— ১০০ জনের মধ্যে

হিন্দু	১১·৮	মুসলমান	৪·১
ব্রাহ্ম	৭৮·২	খৃষ্টান	৪৬·৪ জনের

অক্ষর পরিচয় হইয়াছে। বঙ্গদেশে কয়েকটি জাতির মধ্যে লেখাপড়া কতদুর প্রসার লাভ করিয়াছে।

শতকরা

বৈদ্য	৭১·৯	কায়স্থ	৫৬·৮
ব্রাহ্মণ	৬৪·৩	কৈবর্ত্ত	২০·৭
ব্রাহ্ম	৮৬·৬	নমঃশূদ্র	·০৯

বঙ্গদেশে ১০০ জনের মধ্যে ১ জন ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারে। জাপানে ১০০ জন বালকের মধ্যে ৯৯ জনে এবং ১০০ জন বালিকার মধ্যে ৯৮ জনে পড়িতে জানে, ভারতবর্ষে ১০০ বালকের মধ্যে ২৩ এবং ১০০ বালিকার মধ্যে ৩ জন পড়িতে শিখিয়াছে।—

বঙ্গের জিলা অনুসারে হিসাব

বঙ্গদেশের জিলাগুলিতে শতকরা কত জনে লেখাপড়া শিখিয়াছে।

১।	দারজিলিং	১০	১৬।	বাঁকুড়া	৯
২।	জলপাইগুড়ি	৬	১৭।	মেদিনীপুর	[illegible]
৩।	কোচবিহার	৭।০	১৮।	হুগলি	১১
৪।	দিনাজপুর	৬	১৯।	হাওড়া	৩০
৫।	রংপুর	৪ ০	২০।	চব্বিশপরগণা	১২
৬।	মালদহ	৫	২১।	যশোহর	৭
৭।	রাজসাহী	৫	২২।	ফরিদপুর	৬
৮।	বগুড়া	৬	২৩।	খুলনা	৮
৯।	ময়মনসিংহ	৫	২৪।	বরিশাল	৯
১০।	ঢাকা	৮	২৫।	নোয়াখালি	৬
১১।	পাবনা	৫	২৬।	ত্রিপুরা	৭
১২।	নদীয়া	৬	২৭।	পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	৪
১৩।	মুর্শিদাবাদ	৬	২৮।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৭
১৪।	বীরভূম	৮	২৯।	চট্টগ্রাম	৭
১৫।	বর্দ্ধমান	১০	৩০।	কলিকাতা	৩২

স্বাস্থ্যবিধির সুফল

কলিকাতা নগরে স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করায় এই নগরে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। হাজারকরা মৃত্যুসংখ্যা।—

১৯০০	৪৫এর কাছাকাছি।	১৯০৫	৩৫ হইতে ৪০ মধ্যে
১৯১০	৩০ হইতে ৩৫ মধ্যে।	১৯১৫	২৫ হইতে ৩০ মধ্যে

বঙ্গের অধিবাসীর ধর্ম্ম

হিন্দু	২ কোটী ৪ লক্ষ।	মুসলমান	২ কোটী ৪২ লক্ষ।
বৌদ্ধ	২ কোটী ৫০ লক্ষ।	খ্রীষ্টান	২ লক্ষ ৩৩ হাজার।
জড় পূজক	৭ লক্ষ ৩৫ হাজার।	জৈন	৮ হাজার।
ব্রাহ্ম	৩ হাজার*।	শিখ	২ হাজার।
অপর ধর্ম্মাবলম্বী	১ হাজার।		

যক্ষ্মা।—ব্রিটিশ ভারতে যক্ষ্মারোগে প্রত্যেক বৎসর ৬ লক্ষ লোক মরে. সুতরাং

মাসে	৪৩ সহস্র ২ শত।	দিনে	১৪৪০ জন।
ঘণ্টায়	৬০ জন।	মিনিটে	১ জন লোক

মরিতেছে। কি ভীষণ মৃত্যু! কিন্তু এই মৃত্যুর গতিরোধ করা যাইতে পারে।

এড়াইবার উপায় কি?

১। অমিতাচার বর্জ্জন।

২। অতিরিক্ত পরিশ্রম বর্জ্জন।

৩। রুদ্ধ গৃহে—(দরজা জান্‌লা বন্ধ করিয়া) শয়ন না করা।

৪। যে ঘরে অধিক লোক আছে সেই ঘরে শয়ন না করা।

৫। নাক মুখ ঢাকিয়া শয়ন না করা।

৬। শ্বাসের সঙ্গে ধূম গ্রহণ না করা।

---

* পূর্ব্বে ৯০ হাজার দেখা গিয়াছিল, এক্ষণে অন্য কারণে—বিশেষতঃ বহু ব্রাহ্ম এখন হিন্দু বলিয়া লেখাইয়া থাকেন, এজন্য সংখ্যায় কম হইতেছে। (কুঃ সম্পাদক)

৭। দেহে বা আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যে যাহাতে মাছি না পড়ে।

৮। মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ না করা।

৯। মেজের উপর থুথু না ফেলা।

১০। যক্ষা রোগীর সংশ্রব হইতে দূরে থাকা।

১১। ধুলিময়, স্যাঁত স্যাঁতে ও অন্ধকার গৃহে বাস না করা।

১২। যাহাতে দেহ দুর্ব্বল হয় এমন কিছু না করা।

১৩। শীতল বিশুদ্ধবায়ু অথবা নৈশবায়ুকে ভয় না করা।

১৪। যে খাদ্য উপাদেয় ও পুষ্টিকর নহে তাহা গ্রহণ না করা।

১৫। খাদ্য দ্রব্য যেন পর্য্যাপ্ত হয়।

জননী যক্ষা রোগে আক্রান্ত, তিনি স্নেহে তাঁহার পুত্রমুখ চুম্বন করিতেছেন, কিন্তু হায়, ঐ চুম্বন দ্বারা তিনি আপন দেহের ব্যাধি পুত্রদেহে সঞ্চারিত করিলেন।

বালকদের দ্বারা রোগ প্রসার

অনেক বালক স্লেটে থুথু দেয়, হাতের থুথু পুস্তকের পৃষ্ঠায় লাগাইয়া পাতা উল্টাইয়া থাকে, অন্য বালক ঐ থুথু মাখান স্লেট বা পুস্তক হইতে তাহার রোগের বীজাণু গ্রহণ করে।

পানওয়ালী

রুগ্না পানওয়ালীর নিকট হইতে পানের সহিত এই রোগ অনেকে গ্রহণ করে।

বাজারের মিঠাই

বাজারের মিঠাইএর মধ্যে সকল প্রকার অপবিত্রতাই থাকিতে পারে ঐ মিঠাই হইতে এই রোগ ব্যাপ্ত হয়।

এক হুকায় তামাক খাওয়া

একজনে যে হুকায় তামাক খায় স্বজাতিরা সেই হুকায় তামাক খাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। এইরূপে এক জনের থুথু অন্যে গ্রহণ করায় এই রোগ এক জনের দেহ হইতে অন্যের দেহে প্রবেশ করে।

ঐরূপ একজনের মুখের জিনিষ অন্যে খাইলে, কিম্বা এক বাসনে খাইলে এই ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কেমন করিয়া রোগ ছড়াইয়া পড়ে

যক্ষা রোগী থুথু ফেলিল, ঐ থুথুর উপর মাছি বসিল, মাছি উড়িয়া যাহার উপর পড়িবে তাহারই ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার কথা। আবার

মেথর ঐ থুথু ঝাটার দ্বারা ধূলির সহিত মিশাইয়া উড়াইয়া দিল, নিকটে যে শিশু খেলিতেছিল তাহার দেহ ঐ ধূলির দ্বারা ধূসর হইল, ঐরূপে সেও ঐ রোগের বীজাণু গ্রহণ করিল।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমরা বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে দেখিতেছি যে, ঈশ্বর কৃপায় আমাদের "কুশদহ সমিতি" দিন দিন ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট পন্থায় এবং নিয়মিতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। ইহা কুশদহ বাসী-মাত্রেরই অতীব আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

গত ৪ঠা বৈশাখ বুধবার স্কটীসচার্চ কলেজ গৃহে নববর্ষের আনন্দ-সম্মিলন জন্য সমিতির একটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। ইতি-পূর্ব্বে কথা উঠিয়াছিল, "কুশদহ-সমিতি" কি কেবল কুশদহবাসীগণের মেলা-মেসা আলাপ পরিচয় জন্য কিম্বা তদ্দ্বারা দেশের কিছু কায করিতে হইবে। বোধ হয় সকলেই অবগত হইয়াছেন যে সমিতির কার্য্য প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইতিমধ্যে উহার একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা (একজিকিউটীভ কমিটী) গঠিত হইয়াছে। তাহাতে প্রস্তাব হয়, আপাততঃ কুশদহর মধ্যে যে স্থানে একান্ত জলাভাব—সেইরূপ কোন গ্রামের যাহাতে কিয়ৎ পরিমাণেও জলকষ্ট নিবারণ করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা হউক। উক্ত আনন্দ-সম্মিলন দিনে ঐ বিষয় এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। অতীব আহ্লাদের কথা যে, এই আলোচনা ক্ষেত্রে খাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করেন, যদি এই কার্য্যে সমিতি প্রবৃত্ত হন তবে তিনি একাই ৪০০৲ শত টাকা দিবেন। এই উৎসাহ বাক্যে তৎক্ষণাৎ সমিতিমধ্যে এক আশা বিশ্বাসের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া সমিতির মজ্জাগত অবিশ্বাস, নিরাশা বহুপরিমাণে বিদূরিত হইয়া গেল। সকলের মুখে প্রসন্নতার জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল। এতদ্ভিন্ন কুশদহ-সম্পাদকের নিকট আরও ২।১ টি সহৃদয় ব্যক্তি এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যারম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের নাম অপ্রকাশ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ফলতঃ, এই

ঘটনায় "কুশদহ-সমিতির" সভ্যগণ কি মনে করিতেছেন ? ইহাতে কি ভগবানের এই ইঙ্গিত প্রকাশ পাইতেছে না, "সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়।" কিন্তু হে কুশদহ-সমিতির সেবকগণ, আপনারা এই এক কালিন ব্যক্তিগত দান পাইয়া অধীর হইবেন না, আর এক দিকের কথা স্মরণ রাখিবেন। শত শত সভ্যের ঐক্য-বন্ধন এবং চাঁদা আদায় করিতে আপনাদিগকে অপ্রতিহত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা অবলম্বন এবং অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবেই আপনারা বিধাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। এ কথা যেন ভুলিবেন না।

নববর্ষের অধিবেশন-সংবাদ, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়া পঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

গোবরডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রায়বাহাদুর ভ্রাতৃগণের মাতা ঠাকুরাণী দীর্ঘকাল কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। গত ২৬শে চৈত্র তিনি তথায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রজারঞ্জক সারদাপ্রসন্ন বাবু মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সের মধ্যেই পরলোকগত হন। তখন আমাদের এই পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণীর বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর মাত্র। ইতিমধ্যে ইনি ৯।১০টি সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স প্রায় ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। সারদাপ্রসন্ন বাবু স্বর্গীয় হইলে ইনি অন্নভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এই সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরকাল সেই কঠোর ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের একটি প্রধানতম আদর্শ। মাতা ঠাকুরাণীর আদ্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিগণ সময়োপযোগী যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা প্রস্তাব করি যে, তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি রক্ষার্থ কোন সদনুষ্ঠান করিলে হয় না কি ? তিনি যেমন এক প্রকার জল পান করিয়া দীর্ঘকাল কাটাইলেন, তাই কুশদহের কোন স্থানে তাঁহার নামে একটি পানীয় জলাশয় দিলে সকল রকমেই ভাল হয়।

গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামে এবার কলেরায় অনেক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, বেড়গোম, রাণীডাঙ্গা, রাজবল্লভপুর, সাদপুর, বনবনে,

মেটেগাছা প্রভৃতি গ্রামে বসন্তে অনেক গোরু এবং মানুষের মৃত্যু হইতেছে। এজন্য আমরা বারাসাত সাব্‌ডিভিসানাল অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি। "কুশদহ-সমিতি কি ইহার প্রতিকারার্থ কিছু করিতে পারেন না ?

আমরা সম্প্রতি দেখিয়া সুখী হইলাম যে, খাঁটুরা বালিকা স্কুলটির ধীরে ধীরে কিছু যেন কাজ হইতেছে। বালিকা সংখ্যা ২০টির উপর আছে, উপস্থিত—১০-১২ হইতে ১৫-১৬টি পর্য্যন্ত হয়। একটি শিক্ষকদ্বারা তৃতীয়মান পর্য্যন্ত পড়ান হয়। সুতরাং যেখানে স্কুল উঠিয়া যাইবারই কথা, সেখানে এতটুকুও দাঁড়াইয়াছে ইহা আহ্লাদের কথা বৈ কি ! সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের যত্নের ক্রটী নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুতেই তিনি স্কুলের অর্থাভাব ঘুচাইতে পারিতেছেন না। আমাদের মনে হয়, গ্রামবাসীগণ একটু মনোযোগ করিলেই এই সামান্য অভাব পূর্ণ হইয়া স্কুলটি ভালই চলিতে পারে।

কুশদহ-সমিতি

(প্রাপ্ত)

গত ৪ঠা বৈশাখ স্কটিশচার্চ্চ কলেজগৃহে, মাটীকোমরা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের নেতৃত্বে কুশদহ-সমিতির "নববর্ষ সম্মিলন" হইয়াছিল। সম্মিলন সভায় বহু সভ্যের সমাগম হয়। এই উপলক্ষে সঙ্গীত, বক্তৃতা, ম্যাজিক ও জলযোগের ব্যবস্থাও ছিল, আর ছিল "নূতন খাতার মহরত"। এই নূতন খাতার মহরত সম্মিলন সভার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ইহা বিধাতার একটি বিধান, ইহা ভগবানের একটি ইঙ্গিত। প্রকৃতি যখন নূতন ভাবে ভাবিনী, বাংলার মাটী, জল, তেজ, আকাশ বায়ু যখন খুব চঞ্চল, গাছ পালা যখন নূতন ফল, ফুল পাতায় শোভিত, এবং প্রকৃতির পূর্ণ কৈশোরাবস্থায় যৌবনের লক্ষণ সকল পরিস্ফুট দেখিয়া, স্বাভাবিক নবজীবনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বাংলার শ্রীমান কর্ম্মী পুরুষগণ (অর্থাৎ দোকানদার, ব্যবসাদার, শিল্পী প্রভৃতিরা) যখন নবোদ্যমে নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত, সেই শুভ বৈশাখের সম্মিলনে সভ্যদিগকে নবজীবন ও নবোদ্যম লইয়া কার্য্য করাইবার জন্য

খাঁটুরানিবাসী সহৃদয় শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয় জলকষ্ট নিবারণ জন্ম স্বেচ্ছায় এক কালিন ৪০০৲ টাকা দান করিয়া নূতন খাতার মহরত করিয়াছেন। সুদূর প্রবাস হইতেও কুশদহ বাসী কোনও কোনও ভদ্র মহোদয় মণিঅর্ডার যোগে অযাচিত দান পাঠাইয়া সভ্যাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এখন সমিতির একটা হিসাব নিকাশের আলোচনা আবশ্যক। দেখা যাউক, জমার ঘরে কি জমিয়াছিল এবং খরচ বাদে মজুদই বা কি আছে। এই বিষয় আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, গত ৩।৪ মাসের ভিতর সমিতির আশাতীত শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে, কিছুই খরচ হয় নাই সবই মজুত, তাহার উপর এই নববর্ষের অর্থ সমাগম। ইহাতে বেশ আশা করা যায়, ১৩২৫ সালে, সমিতি তাহার উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা দেখাইয়া কুশদহবাসীর কতক অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবে। শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুশদহ-পঞ্জী

বর্ত্তমান বর্ষ হইতে 'কুশদহ-পঞ্জী রীতিমত বাহির হইবে। কুশদহ-সম্পাদক মহাশয় যখন প্রথমে এই কুশদহ-পঞ্জী বাহির করিবার প্রস্তাব করেন, তখন আমি উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এক্ষণে উহার উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ইহা লিখিতে বসিয়া জানিতে পারিতেছি যে, সমস্ত বঙ্গদেশ কেন — সুদূর পঞ্জাব পর্য্যন্ত কুশদহের সহিত বিবাহ সূত্রে গ্রথিত।

কুশদহের মধ্যে ইছাপুরের চৌধুরীবংশের বিবরণ এত দিন পাওয়া যায় নাই বলিয়া অন্যান্য বংশের বিবরণ বাহির হইতে পারে নাই। চৌধুরীবংশ এক্ষণে নিষ্প্রভ হইলেও পূর্ব্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। চৌধুরী বংশের পরেই গোবরডাঙ্গার জমিদার মহাশয়দিগের বিবরণ লিখিত হইবে। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ চৌধুরীবংশের আদি পুরুষ হইলেও নব ঠাকুরের সহিত আঠার পাইএর সম্পর্ক একটু তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। চারঘাটের চৌধুরীদিগের সহিত এই আঠার পাইএর ১১ দিনের জ্ঞাতি সম্পর্ক রহিয়াছে।

চৌধুরীবংশের ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রিয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনভাগে

বিভক্ত। শুদ্ধ, সিদ্ধ ও কষ্ট। তন্মধ্যে প্রথম দুই ভাগ হইতে কুলীন ব্রাহ্মণগণ কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা লইলে তাঁহাদের কুল ভঙ্গ হয়। এই চৌধুরীগণ কষ্ট শ্রোত্রিয়। এই জন্য যে সকল কুলীন ইঁহাদের কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহাদের "ছড় দোষ" হইয়াছে। কুশদহের মধ্যে অধিকাংশ কুলীনই এই দোষে দূষিত। শ্রোত্রিয়গণ কুলীন অপেক্ষা কেন যে নীচ, তাহা জানা যায় না। বেদাধ্যায়ী এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় বলে। শাস্ত্রে শ্রোত্রিয় সম্বন্ধে লিখিত আছে—

১। "ওঁকার পূর্ব্বিকাস্তিস্রঃ সাবিত্রীর্যশ্চ বিন্দতি।
চরিত-ব্রহ্মচর্য্যশ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচ্যতে।"

২। "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি।"

৩। "একাংশাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্‌কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।"

ইহাদ্বারা শ্রোত্রিয়কে মন্দ ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

আঠার পাই চৌধুরী—ইছাপুরে যে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আছেন, তাঁহার পাদদেশে লিখিত আছে—"রাম জীবন মুলুকাদি শর্ম্মণঃ"।

গঙ্গাধর ভাস্কর নামক জনৈক ভাস্করহাটি এই গোবিন্দ দেবের মূর্ত্তী নির্ম্মাণ করিবার সময়ে উক্ত কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে রামজীবন চৌধুরী ও মুলুকচাঁদ চৌধুরী এক সময়ের লোক। কিন্তু মুলুকচাঁদ চৌধুরী রামজীবন চৌধুরীর পৌত্র।

এই চৌধুরীগণ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হওয়ায় শ্রোত্রিয় ও অন্ত্যজ ব্রাহ্মণ দিগের কন্যা ভিন্ন অন্য কন্যা আনিতে পারিতেন না। কুলীন কন্যা আনিতে হইলে কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে হইত। কাল মাহাত্ম্যে এক্ষণে বিদ্বান্ শ্রোত্রিয় কুলীন পদবাচ্য এবং মূর্খ কুলীন সমাজে নিন্দনীয় হইতেছে।

আঠার পাইএর রামজীবন চৌধুরীর বিবাহ হেঁড়ে বায়সায় শ্রোত্রিয় ঘরে হয়। রামজীবন চৌধুরীর তিন পুত্র—কৃষ্ণরাম, রামগোপাল ও বিষ্ণুরাম। কৃষ্ণরামের পায়সায়, রামগোপালের হেঁড়ে বায়সায় ও বিষ্ণুরামের কুড়ুলগাছিতে বিবাহ হয়।

কৃষ্ণরামের তিনপুত্র মুলুকচাঁদ, গৌরাই ও গোড়াই। রামগোপালের

রামলোচন নামে একটি পুত্র হয়। বিষ্ণুরামের পুত্র নবাই চৌধুরী, তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ ও ঈশ্বর। বৈদ্যনাথের তিন পুত্র—হরিদাস, সুরনাথ ও যোগীন্দ্রনাথ। সুরনাথের পুত্র দ্বিজনাথ এবং যোগীন্দ্রনাথের পুত্র শচী ও ক্ষিতীশ। ঈশ্বরের পুত্র—পরেশনাথ, নবীন ও জ্ঞান।

নবাই চৌধুরীর বিবাহ হেঁড়ে বায়সায়, ইঁহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দম্পতিবরণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে দম্পতিবরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের "দম্পতিবরণ" দোষ হইয়াছে। এইরূপ দোষ ইছাপুরে দুই ঘরে আছে।

বৈদ্যনাথের হেঁড়ে বায়সায় বিবাহ হয়। তিনি বনগ্রামের ৺গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মোক্তারের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। এইজন্য সুরনাথ বাবুরা গঙ্গাচরণ মোক্তারকে "মামা" বলিয়া ডাকিতেন।

ঈশ্বর চৌধুরী সারিবায় বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে পরেশনাথের বিবাহ নদীয়ায়, নবীনের হালিসহরে এবং জ্ঞানচন্দ্রের বিবাহ ইছাপুরের পূর্ব্বপাড়ায় হয়। পরেশনাথ চৌধুরীর পুত্র সতীশের বিবাহ কুড়ুলগাছিতে হইয়াছিল। এইখানে আঠার পাই চৌধুরীদের বিবাহ বিবরণ শেষ হইল।

শ্যামাচরণ চৌধুরীর বিবাহ নদিয়ায় হয়। তাঁহার কোন পুত্রাদি না হওয়ায় মাটিকোমরার মুখোপাধ্যায় বংশ হইতে যজ্ঞেশ্বরকে পোষ্যপুত্র লয়েন। এই যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর বিবাহ গৈপুরের বেচারাম ভট্টাচার্য্যের কন্যার সহিত হয়। যজ্ঞেশ্বরের দুই পুত্র শশিভূষণ ও বিধুভূষণ। শশিভূষণের প্রথম বিবাহ নদে-গোকনা, দ্বিতীয় বিবাহ পুঁড়ায় হয়। বিধুভূষণের কালীঘাটে বিবাহ হয়।

নব ঠাকুরের বাড়ী—রাজকুমার চৌধুরীর পুত্র বিশ্বেশ্বর চৌধুরীকে রামধন চৌধুরী পোষ্য পুত্র লয়েন। বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ইছাপুরের ধরণী মোক্তারের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র কাশী, কৈলাস, ভূপতি ও ননি। কাশীর প্রথম বিবাহ সেখপুরে, ২য় বিবাহ নদে গোকনায়। কৈলাসের প্রথম বিবাহ হয়দাদপুরে কুঞ্জবিহারী হালদারের ভগ্নীর সহিত ও ২য় বিবাহ ইছাপুরের অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত হয়। ভূপতি, ইছাপুরে জানকীনাথ গাঙ্গুলির কন্যা, ও ননি মাটিকোমরা ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

কুশদহ-পঞ্জী সম্বন্ধে

সম্পাদকীয় মন্তব্য

ভগবানের প্রেরণায় "কুশদহ" সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া এবং তাঁহারই কৃপায় কুশদহের কুশল চিন্তায় নিযুক্ত থাকা অবস্থায় স্বভাবতঃ "কুশদহ-পঞ্জী প্রকাশের ইচ্ছা আমার মনে উদয় হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ এই ব্যাপার সহজ বোধ হয় নাই। কুশদহ-পত্র সম্পাদন-কার্য্যে সহরে থাকিয়া কুশদহের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পঞ্জী-বিবরণ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব, সুতরাং এপর্য্যন্ত তাহাতে নিরস্ত থাকিতেই হইয়াছিল। কুশদহ পঞ্জী প্রকাশের কথা শুনিয়া যাঁহারা সহানুভূতিপ্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন প্রধান সহানুভূতিকারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় তিনিও দরিদ্র! চাকুরী বজায় না রাখিলে তাঁহার চলে না। যাহা হউক, তাঁহার উৎসাহকে ধন্যবাদ! তিনি বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও এই কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিতে সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাই তাঁহার সংগৃহীত বিবরণের কোন ত্রুটী বিচার না করিয়া আপাতত উহাই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, কুশদহ-হিতৈষী এমন কি কেহ আছেন—যিনি পঞ্চানন বাবুকে কিছু দিনের জন্যও চাকুরী হইতে অবকাশ গ্রহণের সুযোগ দিয়া এই মহাকার্য্যে তাঁহাকে ব্যাপৃত করিতে পারেন? তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার আগ্রহময় উৎসাহে অতি অল্প কালের মধ্যেই সমগ্র কুশদহবাসীর বিবরণ সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব হইবে না। কুশদহ পাঠক পাঠিকাগণ দেখিয়া আসিতেছেন যে, তিনি এ পর্য্যন্ত কুশদহের আংশিক কোন কোন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কুশদহে প্রকাশদ্বারা সম্পাদককে কতদূর সাহায্য করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় এক্ষণে কুশদহ-সমিতি হইয়াছে, তন্মধ্য হইতেও যদি সকলে আপন আপন বংশ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন, তবে এই মহাব্যাপারটি সম্পন্ন হইবার পথ অনেক সহজ এবং সুগম হইয়া উঠিতে পারে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ২২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড [illegible] প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

দশম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫, { দ্বিতীয় সংখ্যা

মা আনন্দময়ীর ছেলে

—০—

"আনন্দে মা আনন্দময়ীর প্রেমসুধা কর রে পান।
হয় যে প্রেমে প্রাচীন সদানন্দ-বালক সমান।
শুনিলে যাঁহার কথা, দূরে যায় মর্ম্মব্যথা,
দেখিলে সে প্রেমমুখ মৃতদেহে আসে প্রাণ।
ইন্দ্রিয়-বিলাস জ্বরে, যুবাকে প্রাচীন করে,
অকালে মানুষ মরে, হয় পাপে ম্রিয়মান ;
কিন্তু যে মায়ের ছেলে, শিশু সে প্রাচীন হ'লে,
করেন জননী তারে, অনন্ত জীবন দান।" *

যিনি নিজেকে মা আনন্দময়ীর সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহার সন্তান রূপে আত্ম-দর্শন হইয়াছে, যিনি আপনাকে রক্ত মাংসাতীত আত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, বিশেষ ভাবে তাঁহার জন্য এ প্রবন্ধ নহে। কিন্তু হে মানব, তুমি কি এই মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজেকে কেবল দেহী-রূপেই দেখিতেছ—বুঝিতেছ? তোমার সমস্ত জীবন কি ঐ ধারণার

* কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

বশবর্ত্তী হইয়াই চলিতেছে? তাহা যদি হয়, তবে আমি তোমাকেই চাই। কেন না, আমারও অবস্থা এক সময় তাই ছিল। সে জন্য আমি বড় বিপাকে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সহসা মা আনন্দময়ীর অপার করুণায় কিঞ্চিৎ বিশ্বাস পাইয়া এখন কৃতার্থ হইয়াছি। সেই বিশ্বাসের কথাই বলিতেছি।

ঐ দেখ ভক্ত গাহিয়াছেন,—"আনন্দে মা আনন্দময়ীর প্রেমসুধা কর রে পান। হয় যে প্রেমে প্রাচীন সদানন্দ-বালক সমান।"

তাই তুমি এত ম্রিয়মান কেন? তোমার চিত্তে এত অশান্তি কেন? তাহার কারণ কি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিয়াছ? পার নাই, পারিলে এতদুঃখ থাকিত না, ইহা যে নিশ্চয় কথা। আনন্দময়ীর প্রেম-সুধা কি পদার্থ তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছ? আচ্ছা, এই একটা কথাই একবার একটু ভাল করিয়া ভাবো দেখি। ভাবো দেখি, অনন্তপ্রেম যিনি তিনি তোমাকে ভালবাসেন। এ-কথা কি বিশ্বাস করো? এই কথা সত্যই প্রাণে স্থান পাইলে আর কি কোন ভাবনা থাকে? 'আমি তাঁর তিনি আমার' এই বিশ্বাসে কত সুখ কত আনন্দ বল তো? কিন্তু বোধ হয় এ বিশ্বাস তোমার নাই। তুমি বলিবে আছে বৈ কি? কিন্তু তোমার এ স্বীকারোক্তির কোন মূল্য নাই। যথার্থ ভালবাসা কাকে বলে? মায়ের রূপ গুণে প্রাণ মন পুলকিত না হইলে কি ভালবাসা আসে! মায়ের রূপ গুণের নাম শুনিলেই হয়তো তোমার মনে বাহ্য কোন রূপের কথা—আর মানবীয় দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের কথাই মনে হইবে। মন অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকিলে মায়ের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের কথা কেহ তো বুঝিতে পারে না—এইখানেই তো গোলযোগ! মায়ের পরম সুন্দর রূপগুণে বিশ্বাসী হইতে না পারিলেই বিশ্বাসের এইরূপ দুরাবস্থা হয়। ক্ষুধার জ্বালা কেহ সহ্য করিতে পারে না। সুখাদ্যের সন্ধান না পাইলে, সম্মুখে অখাদ্য কুখাদ্য যাহা পায় তাহাই মানুষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথ ধরিতে না পারিলে ধর্ম্ম-ক্ষুধায় যা হয় তাই বিশ্বাস করিতে তুমি বাধ্য হইবেই। কিন্তু বিশ্বাসের ভ্রান্তি জানিতে পারিবে ঐখানে. ঐ তোমার কষ্টিপাথর। জীবন যদি ঐ আনন্দময়ীর ছেলের মতো 'সদানন্দ-বালক সমান' না হয়। খাঁটীবিশ্বাস ভিন্ন নির্ম্মল খাঁটীজীবন কখনও হয় না—হইতে পারে না।

"ইন্দ্রিয়বিলাস জরে, যুবাকে প্রাচীন করে, অকালে মানুষ মরে হয় শাপে ম্রিয়মান," এ-কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ঐ দেখো চক্ষের সম্মুখে শত শত—সহস্র সহস্র যুবকের দশা দেখো। ইন্দ্রিয়সেবায়, বিলাস বাসনা-জ্বরে কি দুর্দ্দশা হইতেছে। হায় রে! যে যুবকদল সংযমী হইবে, মিতাচারী হইবে, সংযত প্রবৃত্তি—সংযত বাক্ হইবে, যৌবনের সৌম্যমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিবে, হৃদয় সরলতায়—পবিত্রতায় এবং উদারভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে—সেবানুরাগে হৃদয়কে কোমল, চরিত্রকে বিনয়ী করিবে, তার কি না ঐ দশা!

ঐ শোনো ভক্ত ভাই কি বলিতেছেন—"কিন্তু যে মায়ের ছেলে শিশু সে প্রাচীন হ'লে, করেন জননী তারে অনন্ত জীবন দান।"

বিশ্বাসী ভক্তের কি সৌভাগ্য! তিনি যতই প্রাচীন হউন না কেন, অন্তরে চিরনবীন, বালকপ্রকৃতি—সরল শিশু, মায়ের ছেলে। তিনি রক্তমাংসের অতীত। তিনি বিশ্বাস করেন, তিনি দেহী নহেন, তিনি আত্মা! জরামরণেরও অধীন নহেন। তিনি বিশ্বাসবলে মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন—যে মৃত্যু জীবের নিকট মহাভীতিপ্রদ, সেই মৃত্যু তাঁহার নিকট অনন্ত জীবন-পথে আরোহণ। পুনঃ পুনঃ জন্মমরণেরও অধীন তিনি নহেন। জননীর কৃপা-দৃষ্টিতে পরলোকের আভাস তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া, সকল ভয় কুসংস্কার ছায়া মায়া হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছে। হে মানব! তুমি কি এইরূপ জীবনে বিশ্বাস করো এবং এই জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা করো? এতক্ষণ কি শুনিলে? কল্পনা—না ভাবুকতার কথা? কিম্বা সত্য!

প্রায়শ্চিত্ত

পঞ্চম

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, ভোলা গোরুগুলিকে গোয়ালে তুলিয়া, ভিজা খড়ের ধোঁয়া দিয়া, মাঠাকুরুণের নিকট হইতে খানিকটা সরিষা-তৈল লইয়া, আপাদমস্তক চুরচুরে করিয়া মাখিতে ছিল। রাতে যে মশা কামড়ায়—তা ছাড়া ভাল করিয়া তেল মাখিলে শীতটাও কম লাগে। পৌষ মাসে এ বারে যে শীত পড়িয়াছে!

তেল মাখিতে মাখিতে ভোলা ডাকিল, বিশুদা, দাদা মশাইকে সেই হত্তুকীর গল্পটা একবার শুনিয়ে দিতে বলো, বড় মজা লাগে শুনতে।

হরদাদা, তখন বিছানায় কাৎ হইয়া মুদ্রিত নয়নে তামাকু টানিতে টানিতে সারাদিনের পথচলা, ট্রেণ চড়ার ক্লান্তি দূর করিতেছিলেন। ভুতোর সহিত প্যাঁচ খেলিতে গিয়া বিশুর দুইখানি ঘুড়ি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। ভাতের সেই করিয়া, স্তিমিত প্রদীপের আলোকে, একান্ত মনোযোগের সহিত সে সেই ছিন্নস্থান সংস্কার করিতেছিল। পাছে ম আসিয়া তাহার এই স্বেচ্ছাচার দেখিয়া ঘুড়ি দু'খানির চিরনির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করেন, সেই ভয়ে মুখ তুলিয়া এক-এক বার দ্বারের দিকে চাহিতেছিল। এমন সময় ভোলার ডাকে তাহার চমক হইল। হরদাদার হরিতকীর গল্প শুনিবার মতো জিনিষই বটে, পূর্ব্বে যদিও এ গল্প শোনা ছিল, কিন্তু তাহার মাধুর্য্য, এখনও স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। বাজে গল্প হইলে, এত দিনে সে বিরক্তিকর হইত।

বিশু তাড়াতাড়ি কহিল, হ্যাঁ দাদা, তোমার সেই গল্পটা আরম্ভ করো। আমি ভুতো, ননে, পেঁচোকে ডেকে আনি। তারা আমায় কতবার জিজ্ঞেস করে, তোর সেই 'হত্তুকীর দাদা' আসবে না? বড্ড মনে কোরে দিয়েছে ভোলা।

হরদাদার কিন্তু গল্প জমাইবার মতো অবস্থা আজ মোটেই নয়, কোনও রকমে দুইটা কিছু মুখে দিয়া, লেপ মুড়ি দিয়া, নাক ডাকাইয়া শীতের দীর্ঘ রাত্তিটি ঘুমাইয়া কাটাইলে সকালে শরীরটা সুস্থ হইতে পারে। আরে রামঃ, পা থাকিতে লোকে আবার গোরুর গাড়ী চড়ে! এই নব সংস্কারের যুগে, কত নূতন সংস্করণ হইতেছে, ট্রাম, রেল, মটর গাড়ীর জন্ম হইল, পাড়াগাঁয়ে মেঠো উচু নীচু রাস্তার জন্য সেই গোরুর গাড়ীই আদিকাল হইতে বাহাল রহিল, উহাকে আর পেন্সন দেওয়া হইল না। নাঃ, এ দেশের—এ জাতির উন্নতি আর হইল না। কোনো উপায়ে যদি সরকার বাহাদুরকে পাড়াগাঁয়ের এই গোরুর গাড়ীতে চড়ানো যায়, তবেই কিছু উপায় হওয়া সম্ভব। ঘণ্টাখানেক এই গাড়ীতে চড়িয়া যাত্রা করিলেই বুঝিবেন। তাঁর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলেই ইহার একটা সুব্যবস্থা না হইয়া যায় না। রতিকান্তর হুজুগে পড়িয়া হরদাদা কম করিয়া তিন ঘণ্টা কাল এই গোরুর

গাড়ীতে চড়ায় সর্ব্বাঙ্গে কি ব্যথাই না হইয়াছে। হুঁকাটা তো সাতবার গড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভাঙে নাই যে এই বরাতের জোর।

বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি ঘুড়িতে জোড়া তাড়া লাগাইয়া, দাদার কাছে গিয়া বসিল। হরদাদা বলিলেন, আজ না ভাই, এখনতো দু'চার দিন আছি, কা'ল বলবো, পরশু বলবো। তুই সবাইকে গল্প শোনবার নেমন্তন্ন কোরে আসিস।

বিশ্বনাথ ছাড়িবার পাত্র নয়, সে কহিল, আজ আমরা ঘরে ঘরে তো শুনি, কা'ল তখন সব্বাইকে নেমন্তন্ন কোরে আসবো। ভোলা ততক্ষণে তেল মাখা শেষ করিয়া সুচিক্কণ মূর্ত্তিতে, দরোজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশু কহিল, দাদা এখুনি গল্প আরম্ভ কোরে দেবেন, তুই জাম তলায় দাঁড়িয়ে ননে ভূতোদের একবার ডাক দে, তারা বাইরের চালায় আছে, দৌড়ে আসবে এখুনি।

সত্যই ডাক শুনিয়া, ছেলের দল দৌড়িয়া আসিল, হরদাদা নিরুপায় হইয়া হুঁকাটি রাখিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

ছেলেরা, তোমরা মন দিয়ে, ভক্তি কোরে শোনো; হরিতকীর অশেষ গুণ, হরিতকী পাকা খেলে অমর হয়—কাঁচার গুণের সীমা নেই পাকা হরিতকী চোখে দেখলে রাজা হয়, রোজ হরিতকী ভিজনো জল খেলে, একশ' বছর পরমায়ু হয়। যে এ সব শুনে তর্ক করে, তার পাপের সীমা থাকে না, আর যে বিশ্বাস কোরে এর পরীক্ষা করে, সে হাতে হাতে ফল পায়।

ভূতো সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, একজামিনে পাস হয় দাদা? ক্লাসে উঠ্‌তে পারা যায়?

হরদাদা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, আলবাৎ হয়, প্রত্যহ হরিতকী খেলে মস্তিষ্কের তেজ বৃদ্ধি হয়, স্মরণশক্তি প্রখর হয়, কাজেই পড়া ভাল মুখস্থ হয়, একজামিনে পাস না হোয়ে আর যায় কোথা?

ভোলার আজ কয়দিন হইল, মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া, এক পুঁটুলী কড়ি হারাইয়া গিয়াছে—দু'চারিটা নয়, এক পণ আট গণ্ডা কড়ি, বাছা বাছা বড় বড় কড়িগুল; কাজ কর্ম্মের ফাঁকে ভোলার মনে নেই, খেলার অবলম্বন, কড়িগুলির বিচ্ছেদ-স্মৃতি, কুলের কাঁটার মতো বিঁধিতে ছিল, হরদাদার কথায়, আশান্বিত হইয়া সাগ্রহে সে জিজ্ঞাসা করিল

হারানো জিনিষ পাওয়া যায় না, দাদা মশাই ? দাদা মশাইও সমান আগ্রহে উত্তর দিলেন, খুব পাওয়া যায় ! গোরু, হারালে গোরু পাওয়া গেছ্‌লো, শুনেছিস তো ? এক জন লোকের হরিতকীগুঁড়োর দোকান ছিল, সে ঐ এক পেটেণ্ট অষুধে সব রোগ সারিয়ে দিত, এমনি হরিতকীর মহিমা, বাবা মহাদেবের স্বপ্নাদ্য ওষুধ কি না ? ভক্তিভরে বিশ্বাস কোরতে পারলে, হাতে হাতে ফল। অবিশ্বাসীর কাছে সব ফাঁকী হোয়ে যায়। এক চাষার গোরু হারিয়েছিল, গর্ভিণী গোরু। পাঁচসের দুধের গাই। সে তো সারাদিন, মাঠেঘাটে খুঁজে হায়রাণ হোয়ে গেল, ঝোপে জঙ্গলে কোথাও সন্ধান পেলে না, তখন সে নিরুপায় হোয়ে কাঁদতে কাঁদতে হরিতকীবদ্দির কাছে এলো, তিনি অভয় দিয়ে বললেন, কাঁদিসনা কোনও ভয় নেই, বাবার নাম কোরে এই এক পুরিয়া জলে গুলে খেয়ে নে, রাতে আর একবার খাস।

সে বেচারা বিশ্বাস কোরে তাই খেলে। রাতে তার পেট ব্যথা কোরতে লাগলো, সে মাঠে কাজ সারতে গিয়ে, একটা ভাঙা দেওয়ালের কাছে তার সেই গাই, বাছুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাষা মহা আহ্লাদে চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। পাড়ার লোকেরা ঘুমের ঘোরে চোর এসেছে মনে করে লাঠি নিয়ে দৌড়ে এলো,দেখে না চাষার গোরুর বাছুর হোয়েছে, হারানো গোরু ঘরে ফিরে আসছে, চাষার আমোদ দেখে কে। চাষা বাছুরটাকে কোলে কোরে নিলে, গোরুটা হাম্বা হাম্বা কোরতে কোরতে পাছে পাছে ঘরে এলো। পুরাণে আছে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদুর'।

ভোলা পরম আশ্বস্ত হইয়া, নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। মনে বলিয়া উঠিল, ভট্‌চায্যিদের বৌয়ের ছেলে হোলে বাঁচেনা, তা'রা কত ওষুধপত্তর কোরছে, কত মাদুলী নিচ্ছে, তা তুমি যখন এসেছ দাদা, তুমিই ওষুধ দাও, ভাল হোয়ে যাবে।

পেঁচো কহিল, শুনেছিস বিশু, পুঁটির ছোট্ দি'কে 'ওপর' নজর লেগেছে। সে কি ব্যাপার—দেখলে ভয় হয়। এমন গোঙাচ্ছে যে শুনলে চক্ষু স্থির হয়। দাদা যদি একবার দেখে ওষুধ দেন—

বিশুর পিসী বিন্দু আসিয়া পড়িলেন। তিনি কহিলেন, দাদা এখন গল্প করছেন ? খাবেন চলুন, রতি বসে পড়েছে—তার খুব ঘুম পাচ্ছে খেয়েই শোবে। ও বাড়ীর মেজ গিন্নীরা মাঘ মেলায় প্রয়াগে কল্পবাস

কোয়তে যাবে, আমার ইচ্ছে একবার তীর্থি ঘুরে আসি, ওদের কুঁড়েতেই থাকবো। আপনি যখন এসেছেন, রতিকে নিয়ে আপনিও সঙ্গে যাবেন। আপনার জন পুরুষ বল না হোলে তো আর ছোট ছেলে নিয়ে বেরুনো যায় না, তা উঠুন এখন, কা'ল সব পরামর্শ হবে।

ছেলেরা ক্ষুণ্ণ হইল, তাহারা দাদার ঝুলি ঝাড়িয়া আরও দু'চারিটা গল্পের আশা করিয়াছিল। তবে বিশু, প্রয়াগে যাইবার সংবাদে, নবোৎসাহে পিসীর আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া, বিন্দুর মুখোচ্চারিত প্রত্যেক শব্দটি হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

ষষ্ঠ

পুরাণবর্ণিত মায়ারথের মতই বায়ুবেগে কলিকালের এক্সপ্রেস রথ ছুটিয়া চলিয়াছে। কত মাঠ, কত গাছপালা, কত নদী, দেশ, পাহাড় চোখের সম্মুখ দিয়া যেন স্বপ্নরাজ্যের ছবির মতো এই জাগিয়া উঠিয়া এই মিলাইয়া যাইতেছে। আপনার বিজয়বাদ্য ঘোরঘটা গড় গড় শব্দে বাজাইয়া, রাশি রাশি ধূম সগর্জ্জনে উদ্গীরণ করিতে করিতে অগ্নিগর্ভ-লৌহযান শত শত যাত্রী বুকে লইয়া দৌড়িতেছে।

গাড়ী ষ্টেশনে থামিবা মাত্র কি ব্যাপার! এক সঙ্গে ফেরিওয়ালাদের "চাই চীনা বাদাম" "চাই গরম চা" কমলানেবু আম কলা, পান সিগারেট সোডা লেমনেড প্রভৃতির বিক্রেতারা ঐক্যতান শব্দে যাত্রী বেচারাদের—বিশেষ যাহারা বড় একটা ট্রেণে যাওয়া আসা করে নাই তাহাদের—বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। কোন্‌টা শুনিবে কোন্‌টা দেখিবে, আর কোন্‌টাই বা কিনিবে। বিশুকে লইয়া সকলে তো অস্থির হইয়া পড়িল, সে একবার এদিকের জালানায় মুখ বাড়ায়, আবার ওদিককার দর্শনীয় জিনিষগুলি বাদ যাইবার ভয়ে ছুটিয়া ঐ দিকে গিয়া দাঁড়ায়। মোট কথা, পিছন দিকেও দুইটা চোখ্ না দিয়া বিধাতা বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেন নাই। মানুষকে এক সঙ্গে চারিদিক দেখিয়া লইবার সুখ সুবিধা হইতে বড় রকমে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিশু আজ কোনটা রাখিয়া কোনটা কেনে।

সুর গুলা শুনিতে কাণে কৌতুকজনক হইলেও ফেরিওলাদের সব কথা গুলা ভাল বুঝা যাইতেছে না। যাকে তাকে ডাকিয়া তাই বিশু জিজ্ঞাসা করিতেছে। যখন বালকের আহ্বানে রুটী কাবাব ওয়ালা

আসিয়া তাহার মাথার বৃহৎ থালা খানি নামাইয়া গোস কাবাব দেখাইল, কমলা এতক্ষণ ধমক দিয়া ছেলেকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এখন এই ম্লেচ্ছ খাদ্য দর্শনে শিহরিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে নাকে কাপড় দিয়া ছেলেকে দুই চাপড় বসাইয়া দিল। বিন্দুও ম্লেচ্ছখাদ্য সম্মুখে দেখিয়া ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া রাম নাম উচ্চারণ করিল, বিদেশের পথে বাহির হইয়া বধূর সকল কথার ও কাজের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছিল,—এমন কি, ছেলে লইয়া সে রাস্তা হইতে ফিরিয়া যাইবে, এমনও শাসাইল, মাথায় থাকুক মাঘমেলা দর্শন। সে শাসনে কমলা ভয় নাই পাক্, বিশু কিন্তু ভয় পাইল। নিজের দোষে বুঝি তাহার আর এলাহাবাদ বেড়ান হইবে না। সে সশঙ্কিত হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করিল। দানাপুরে ট্রেণ থামিবামাত্র রতিকান্ত নামিয়া মেয়েদের গাড়ীতে খবর লইতে আসিল। মামাকে দেখিয়া বিশু সোৎসাহে কহিল, আমি তোমাদের গাড়ীতে যাবো ছোটমামা। কমলা কহিল, ও বড় বিরক্ত করছে রতি, পড়ে গিয়ে এক হাঙ্গামা না বাধিয়ে বসে।

বিন্দু মুখ ঝাপটা দিল। ও খুব সুবোধ ছেলে, তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখ গে।

রতিকান্ত হাসিয়া ভাগিনেয়টিকে লইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ পিসিমা প্রদত্ত বিশেষণটির সদ্ব্যবহার করিল বটে, কিন্তু এটা কি ওটা কি, প্রশ্নের পর প্রশ্নে রতিকান্তকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

রতিকান্ত কহিল, আমি এদিকে কখনও আগে আসিনি, এ সব আমার কিছুই চেনা নয়। বিশু অম্লান বদনে কহিল, তুমি তো ম্যাপ দেখেছ ছোটমামা? ভূগোলে তো পড়েছিলে? ভুলে গেছ বুঝি? তুমি কি হর্তুকী খেতে না ছোটমামা?

গাড়ীতে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন, বিশুর কথায় হাসিয়া উঠিলেন। এদিকে হরদাদা পাশের থার্ডক্লাস গাড়ীতে দিব্য মজলিস জাঁকাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি একজন মস্ত বড় তামাক খোর হইলেও বাবুদের সিগারেট চুরটের গন্ধে তাঁহার মাথা ধরিত, সেজন্য হিন্দুস্থানী যাত্রীদের মধ্যে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে আধা হিন্দী আধা বাংলায় তিনি হরিতকীর গুণানুকীর্ত্তন করিতেছিলেন। সদানন্দ

বক্তার কথাগুলি শুনিতে উৎসাহী শ্রোতার অভাব ছিল না। উহাদের মধ্যে যাত্রীপাকড়াও ছুইজন পাণ্ডা ছিল। এক জন প্রয়াগ—আর এক জন বিন্ধ্যাচল যাত্রীর জন্য।

হরদাদার গল্প শুনিয়া কথাপ্রসঙ্গে তাহারা জানিয়া লইল, তাঁহারা মাঘ মেলায় যাইতেছেন। শীকার মিলিল দেখিয়া বাবুরাম পাণ্ডা বড় খুসী হইল। রামলালের দিকে চাহিয়া হাসিল, সে হাসির অর্থ যাহাই হউক, রামলালের মুখটি কিন্তু ম্লান হইল।

রামলাল আর এক চা'ল চালিল। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র সে নামিয়া রতিকান্তদের কামরায় উঠিয়া বসিল। বাবুরাম ভাবিল এখানে শীকার মিলিল না দেখিয়া, সে অন্যত্র সন্ধানে গিয়াছে।

রামলাল হরদাদার কথাপ্রসঙ্গে জানিয়া লইয়াছিল যে, তাহার সহযাত্রী বাবুটি পাশের কামরাতেই আছেন। রামলাল বাংলা জানিত, সহজেই সে এলাহাবাদযাত্রী বাবুটিকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সাদরে বিশুর পিঠ চাপড়াইয়া রতিকান্তকে কহিল, আপ্‌নি প্রয়াগে যাবেন বাবুজী? বাকী বিন্ধ্যাচল, ভারি তীরথ। রাস্তামে উস্‌কো ছোড়কে জানেসে প্রয়াগ আস্নানের ফল না মিলবে। দু'এক রোজ বিন্ধ্যাচলে উত্তারকে আস্নান পূজা করলে বড়া পুন্‌ ফল হোবে, এহি তো ভাগমানক কাম আছে বাবুজী। বিন্ধ্যবাসিনী দেবী বড়াভারী দেওতা, ভগবতী মায়ীকো পূজা দরশন বড়া ভাগকা কথা বাবু।

রতিকান্ত কৌতুকভরে পাণ্ডাজীর কথাগুলি শুনিতেছিল। রামলালও আশ্বস্ত হইয়া পরমোৎসাহে বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর ও পর্ব্বতবাসিনী অষ্টভুজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

শেষ যখন সে বলিল, বাংলাদেশসে এক ভারি বাঙালী মাজিষ্টর বেড়াতে আয়া—ইলাহাবাদমে বাংলা ভাড়া লিয়ে আছেন। বাবুর ভৌজী আর তিনটি বেটী এখানে বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেখতে এসেছেন, ধরমশালাতে টিকে আছেন, বাবুর নাম মাইশবাবু আছে।

রতিকান্ত তখন চমকিয়া উঠিল, কোন্ মহেশ বাবু? ললিতার পিতা মহেশবাবু নহেন তো? তিনিও তো ম্যাজিষ্ট্রেট?

বিন্ধ্যাচল দর্শনের আশায় তাহাকে যথেষ্ট প্রলুব্ধ করিল। সে বিন্ধ্যাচলে দুই দিন থাকিয়া এলাহাবাদ যাওয়া স্থির করিল। পরের

ষ্টেশনে নামিয়া কমলা ও বিন্দুকে এ সংবাদ দিবামাত্র সানন্দে তাহারাও সম্মত হইল। তীর্থভ্রমণে আসিয়া পুণ্যের সংখ্যা যতই বাড়ে ততই মঙ্গল। বিন্ধ্যাচলে পোঁটলা-পুঁটলী সমেত নামিয়া যখন রতিকান্ত হরদাদাকে তাড়া দিল, তিন মিনিট মাত্র সময়, শীঘ্র নামুন হরদাদা। শশব্যস্তে হুঁকা হাতে হরদাদা নামিয়া পড়িলেন। সহযাত্রীরা "বাবু রাম রাম" বলিয়া বিদায় অভিনন্দন দিল। আর বাবুরাম পাণ্ডা, রামলালের এই আকস্মিক কিস্তীমাতে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। ট্রেণ যখন ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন সে গলা বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল—বাবু, আপনারা যখন ইলাহাবাদে উতারবেন, দোসরা পাণ্ডা ধোরবেন না, বোলবেন বাবুরাম আপনাদের পাণ্ডা আছে, হামি সব গাড়ীতে হাজির থাকবো, মুলাকাৎ হোবেই।

বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনের নিকটেই ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালার নিকটে চারিদিককার ক্ষেত্রে প্রচুর ছোলা মটর ইত্যাদি হইয়াছে, একদিককার ক্ষেত্রে অড়হর গাছের ঘন বন হইয়াছে। দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের কুটীর গুলি ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে দেখা যাইতেছে। অনতিদূরে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত-শ্রেণী শোভা পাইতেছে। যাঁহারা তীর্থদর্শনে আসিয়াছেন, তাঁহারা দল বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।

কমলা ও বিন্দু আজ আর পাহাড় বেড়াইতে বা অষ্টভুজা দর্শনে গেল না। বৈকালে যাইবে স্থির করিয়া হরদাদার সহিত দেবীমন্দিরে গেল। বিশু কিন্তু প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পাহাড় বেড়াইতে যাইবে বলিয়া হাঙ্গামা করিতে লাগিল। রতিকান্ত বিশুকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। গাঁদাফুলের বাগান দেখিয়া বিশু ছুটিয়া ফুল ছিড়িতে গেল। রতিকান্ত ধমক দিল। "দেবীপূজার জন্য ও সব ফুল আছে ছিড়লে পাপ হবে। তুমি পথে এ রকম দুষ্টুমি কোরলে, আমি পাহাড় বেড়াতে নিয়ে যাব না, চলে এস বলছি।" মামার আদেশ বিশু অমান্য করিল না। রতিকান্তর মন ভাল ছিল না। কাল সে ঝোঁকের মাথায় নামিয়া পড়িয়াছে, আজ তাহার মনে হইতেছিল, সে মিছামিছি এখানে নামিল কেন? ধর্ম্মশালায় তো কই তাঁহারা নাই? আর যদিই বা থাকেন তাহাতে তার কি? ললিতা কি এখনও তাহাকে সেই চক্ষেই দেখে? তাহা হইলে সে যে এই দীর্ঘকারাবাসের পর ফিরিয়া আসিল, তাহার খোঁজ লইত না কি?

পিতা তো মহেশ বাবুকে চিঠী দিয়াছিলেন, তাহার উত্তর কি তিনি দেন নাই? যদি দিয়া থাকেন, অনুকূল কি প্রতিকূল? তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, আর সে এখন সেই হাঙ্গামায় জড়িত—অপরাধে চিহ্নিত আসামী, এ হেন লজ্জিত যুবককে তিনি কি তাঁহার সেই প্রিয়পুত্তলী ললিতাকে দিতে সম্মত হইবেন? তবে——

রতিকান্তের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সে পথ চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইল। বৃহৎ আমলকীগাছতলায় তিনটি তরুণী ও একটি সুবেশ যুবক হাস্যালাপ করিতেছিল। বাংলাদেশে ঘরে বসিয় যে কথা—যে শব্দ আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না, সুদূর বিদেশে গিয়া পড়িলে, সেই বাংলা ভাষা—সেই শব্দ,সমস্ত অন্তস্তল ভেদ করিয়া সহজেই আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। স্বদেশ যে আমাদের কত প্রিয় তা আমরা প্রবাসে গিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। মেয়েদের মধ্যে এক জন তখন বলিতেছিল,—

তা আপনি যতই চেষ্টা করুন—মিষ্টার সরকার, আপনার মুখে মেয়েদের সুকুমার লাবণ্য কিছুতেই ফুটে উঠ্‌বে না। বড়দি, তুমি সত্যি কোরে বলো দেখি, সেই যে এমেচার পার্টিতে একটা লোক গোঁফ কামিয়ে জনা সেজেছিল, মিষ্টার সরকারকে হুবহু তেমনি দেখাচ্ছে কি না?

কণ্ঠস্বরে রতিকান্ত চমকিয়া উঠিল, অমিতার কণ্ঠস্বর না? নিশ্চয়ই সেই। রতিকান্ত চকিতে চাহিয়াই শুচিতা, ললিতা ও অমিতাকে চিনিয়া লইল। আজ দুই বৎসরের পর ললিতা তাহার এতো কাছে? এখনি চোখোচোখী হইলে পরিচয় হইয়া যাইবে। রতিকান্তর হৃদয় যেন কাঁপিয়া উঠিল, সে আর অগ্রসর না হইয়া হেঁট মুখে জুতার পেরেক ফুটিতেছে কি না দেখিতে লাগিল। বিশু বলিয়া উঠিল, কি কুল ধরেছে ছোটমামা—ঐ গাছটায়? রতিকান্ত মেয়েদের দিকে পিছন ফিরিয়া বিশুকে কুলগাছ হইতে কুল পাড়িয়া দিতে লাগিল। মামার এতখানি উদারতায় বিশু যথেষ্ট প্রসন্ন হইয়া, টপাটপ কুলগুলি মুখে পুরিতে লাগিল। শুচিতা তখন অমিতাকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—

তোর আব্দার মন্দ না,গোঁফ জিনিসটা ভগবান পুরুষ মানুষদের নামেই উইল কোরেছেন, সে তার যা ইচ্ছে তা কোরতে পারে, তোর আমার তাতে কথা বলবার কি অধিকার?

অমিতা বলিল, বড়দি আমরা যদি একজোড়া গোঁফ পরি কেমন দেখায়? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেরই হাঃ হাঃ হাসিতে বনপথ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যুবকটির নাম রতিকান্তর জানা না থাকিলেও আমাদের অজানা হইতে পারে না। যুবকের নাম নরেন্দু। পরিচয় না জানিলেও নরেন্দুর সৌভাগ্যে রতিকান্তর মন যেন ঈর্ষা প্রকাশ করিতে লাগিল।

নরেন্দু বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে। সেখানে সে তিনবৎসর ছিল; ইংরাজ সমাজে সে খুব মিশিয়াছে, সুন্দরী মিসদের সহিত বলে নাচিয়াছে, পার্টিতে মিশিয়াছে, টেনিস খেলিয়াছে, নৌকায় দাঁড় টানিয়াছে, কিন্তু এই কয় মাসের মধ্যে এই কয়টি বাঙালী মেয়ে তাহাকে যেন বোবা বানাইয়া ফেলিয়াছে। দু'চার খানা ইংরাজী বই পড়িয়া ইহারা যে বাক্যবাগীশদেরও ছাড়াইয়া পড়িল! যে নরেন্দু, সুন্দরমুখ ও সুগঠিতদেহের সুপারিসে, সুদূর সুসভ্য ইংলণ্ডেও সহজে নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাকে কি না এই মেয়েগুলা গোঁফ কামানোর জন্ত তিন সন্ধ্যা নাস্তা নাবুদ করিতে চায়?

নরেন্দুর ছোট নেপালী কুকুরটা বিশুর পায়ের কাছে আসিবা-মাত্র, বিশু কুকুরটি কোলে তুলিয়া লইল। নরেন্দু দেখিতে পাইয়া কহিল, সাবধান খোকা, আঁচড়ে না তায়, বড় দুষ্টু ও।

বিশু কহিল, ছোটমামা, কুকুরটি কি সুন্দর!

নরেন্দু কহিল, ওকে ছেড়ে দাও খোকা।

বিশুর লোভ কিছু বেশী—অন্ততঃ সে জিনিষটাকে সে এখনও ঢাকিতে শিখে নাই, সে সরলকণ্ঠে কহিল, আপনাদের কুকুরছানা হোলে একটা আমায় দেবেন?

বালকের কথায় মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। নরেন্দু কাছে আসিয়া কহিল, ওটা মদ্দা কুকুর খোকা, ছানা হবার আশা একেবারেই নেই। রতিকান্তর দিকে চাহিয়া কহিল, আপনারা কবে এসেছেন মশায়?

"কাল সন্ধ্যার ট্রেণে।"

"কোথায় উঠেছেন?"

"ধর্ম্মশালায়"

নরেন্দু কহিল, আমরাও তো সেখানে নেমেছি। আমরা ওপরের ঘরে আছি। আপনি বুঝি নীচের ঘর নিয়েছেন?

মেয়েরা ঔৎসুক্যভরে রতিকান্তকে দেখিতেছিল, সে তো তাহাদের অপরিচিত নয়,তবে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু দীর্ঘ ও কৃশ দেখাইতেছে। রতিকান্তর কারামুক্তি সংবাদও তাহারা সংবাদ পত্রে জানিয়াছিল। ললিতার কাণে কাণে শুচিতা কহিল, তোর সেই হবু বর না?

ললিতার চক্ষে জালের মতো একটা আবরণ বোধ হইতেছিল। তখনও সে রতিকান্তকে ঠিক্ চিনিতে পারে নাই। আরক্তমুখে শুচিতার মুখের প্রতি একবার চাহিল। এই সময় রতিকান্ত মুখ ফিরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন সবে সূর্য্যোদয় হইয়াছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সোনালী আলোকরেখা রতিকান্তকে সুস্পষ্টরূপে চিনাইয়া দিবামাত্র ললিতা আর রতিকান্তর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। শুচিতা মুখ টিপিয়া হাসিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

কবির প্রেম

(একটি ইংরাজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত)

পুরীর বালুকাসৈকতে দাঁড়াইয়া দুইটি প্রাণী; উপরে অনন্ত নীলাকাশ সম্মুখে অসীম নীলাম্বুরাশি। একটি কিশোরী, অপরটি যুবক। সাত বৎসর দুই জনের জীবন এক সাথে কাটিয়াছে। দুইটি সুকোমল কুসুম যেন এক বৃন্তে ফুটিতেছিল, আজ সহসা যেন বিরহ-ব্যথা আসিয়া দুই জনকেই চঞ্চল করিতেছে। যুবক কবিতা লিখিত বালিকা অনিমেষ আঁখিতে যুবকের আবৃত্তি শুনিত। আজ তাহাদের অতি সঙ্কটের দিন। বালিকা পুরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতেছে। যুবক সতীশচন্দ্র তাই 'বিদায়' কবিতাটি শুনাইতে আসিয়াছে। সতীশ কবিতা আবৃত্তি করিল, বালিকা শুনিল। পবনহিল্লোলে তাহার কৃষ্ণ কুন্তল-রাজি চঞ্চল হইল, সেই সঙ্গে তাহার প্রাণটা আরও চঞ্চল হইল। সে বলিল, আর কি দেখা হবে না?

সতীশচন্দ্র বলিল,তোমার দেখা কোথায় পাব,মীনা! তুমি ধনীর কন্যা আর আমি দরিদ্র সহায় সম্বল হীন।

বালিকা। দেখ! তুমি যেরূপ কবিতা লেখ, নিশ্চয়ই তুমি দেশমান্য ও প্রসিদ্ধ হোতে পার। ক্ষুদ্র পুরী পরিত্যাগ কোরে কলকাতায় চল। সেই খানেই তোমার যশমান বাড়বে।

সতীশ। মীনা! পুরী ক্ষুদ্র নয়, এখানে সবই অনন্ত--সম্মুখে সাগরের বারিরাশি, উপরে অনন্ত আকাশ, পুরী আমার মহাতীর্থ, এই পুণ্যক্ষেত্রেই আমি প্রেমের দেবী পেয়েছি। এই সাধনার তীর্থ আমি ছাড়তে পারব না। এই সুখের স্মৃতিটি লয়ে দুঃখের জীবন যাপন করব—

"আর যাহা চাহ সখা, দিব ফিরাইয়া—স্মৃতিটিকে সুধু দিব না।"

মীনার পিতা রাধানাথ রায় একজন জমিদার। কিন্তু পাটের ব্যবসা করিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকা তাঁহার দেনা হইয়াছিল, কাজেই জমিদারি বন্ধক দিয়া আয় হইতে ঋণ শোধ দিতেন, তাই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সাত বৎসর পুরীতে বাস করিতেছিলেন। সতীশচন্দ্রের পিতা পুরী স্কুলে অল্প বেতনে শিক্ষকতা করেন। উভয়েই প্রতিবাসী, দুই পরিবারে বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল।

খ

মীনাসুন্দরী যখন পুরী পরিত্যাগ করিল, সতীশচন্দ্রের জীবনটা বড়ই শূন্য হইল। কবিতা লিখিতে আর স্পৃহা হইত না। তাহার কবিতা আর কে শুনিবে। তাহার কবিতা আবৃত্তি সময়ে যে দুইটি আঁখি তাঁহার মুখেরপানে চাহিয়া কবিতায় মধু ঢালিয়া দিত, আজ তাহা কোথায়? মীনা যখন সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতে সমুদ্রসৈকতে আসিত, সতীশচন্দ্র প্রতিদিন ঠিক সেই সময়ে সাগরতীরে আসিত। একবার আকাশের অগণন নক্ষত্র রাজির পানে আবার লবণাম্বুরাশির পানে চাহিত। চাহিয়া চাহিয়া নিরাশার তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে ফিরিত।

রাধানাথ রায় কলিকাতায় ফিরিলেন দুইটি সঙ্কল্প লইয়া। প্রথম ও প্রধান মীনার বিবাহ। দ্বিতীয় পুনরায় পাটের ব্যবসার দ্বারা পূর্ব্বসম্পদ লাভ। একবাণে তাঁহার দুইটি পক্ষী বিদ্ধের ন্যায় ঐ অভীষ্ট লাভের আশা হইল। রাধানাথ রায় জমিদার। দেশের—দশের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি, তাহাতে তিনি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গোবিন্দহালদার

নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বংশ মর্য্যাদায় সে রাধানাথের অনেক নিম্নে। কিন্তু পাটের ব্যবসায়ে তাহার প্রতি "মা লক্ষ্মী" প্রসন্ন হইয়াছেন। উল্টাডিঙ্গীতে তাহার প্রাসাদ তুল্য ভবন। লোকে তাহাকে "পেটো হালদার" বলিত। সে কোনও দিন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গিয়াছিল বলিয়া কেহ জানেনা। কিন্তু বিষয়বুদ্ধি তার অতি প্রখর। পাট চিনিতে কলিকাতায় তাহার সমকক্ষ কেহ ছিলনা। বড় বড় হাউসওয়ালা সাহেব তাহার পরামর্শ লইত। গোবিন্দহালদারের এত বড় গৃহটি কিন্তু শূন্য ছিল। সে দুইবার বিপত্নীক। এত সম্পত্তি যে জ্ঞাতিরা ভোগ করিবে— আর 'পুৎ' নামে যে একটা নরক আছে তাহা হইতে তো উদ্ধার হওয়া চাই, কাযেই পার্শ্বচর-গণের পরামর্শে গোবিন্দ হালদার বিবাহ করিতে চাহিল। কিন্তু তাহার বয়স পঞ্চান্ন অতিক্রম করিয়াছে। যখন স্বয়ং ন্যায়বাগীশ মহাশয় পঞ্চাশ ঊর্দ্ধে পরিণয়ের ব্যবস্থা দিলেন, তখন হালদার মহাশয়ের আর কোন আপত্তি রহিল না। তবে মনে মনে এই স্থির করিল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা বিবাহ করিবেনা। যখন রাধানাথ রায়ের ষোড়শী সুন্দরী কন্যার কথা শুনিল, সে একদিন রায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিল। রায় মহাশয় যে দেনার দায়ে পাটের হাট তুলিয়া ফেরার হইয়াছিলেন, গোবিন্দহালদার তাহা জানিত। সে টাকার লোভ দেখাইল—সে ভাবিল পাটের সওয়াদা তো অনেক করিয়াছি এবার একটা "খারা সওদা" করিয়া লই। সে তখন রাধানাথ রায়কে বলিল, রায় মশাই! আপনার মত কাজের লোকের সামান্য টাকার জন্য নিষ্কর্ম্মা হো'য়ে বোসে থাকাটা ভাল নহে। আমাকে হুকুম কল্লেই দুই তিন লাক্ টাকা যাহা দরকার দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছাটাও বলিতে ভুলিল না। রায় মহাশয় শুনিলেন, লোভও বিলক্ষণ হইল। তিন লক্ষ টাকার প্রলোভন বড় সামান্য নয়। কিন্তু গোবিন্দহালদারের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রাণটা একেবারে হতাশ হইল। লোকটা তাঁহারই সমবয়স্ক—হয়তো কিছু বড়ও হইতে পারে। চোহারাটা অতি কদাকার, কথাবার্ত্তা নিতান্ত ইতরশ্রেণীর ন্যায়। ভাবিলেন, তাঁহার এত সাধের মাতৃহীনা কন্যা—এমন রূপবতী এমন সুলক্ষণা, এমন সুশিক্ষিতা মীনাকে জলে ফেলিবেন! আবার ঝনাৎ করিয়া তিন লক্ষ টাকার স্বপ্ন মনে জাগিল। তখন ভাবিলেন অদৃষ্ট—বিধিলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে।

কাযেই রাজি হইলেন। বিবাহটা স্থির হইয়া গেল। শুভ দিনে শুভ মুহূর্ত্তেই মীনাসুন্দরী পাত্রস্থ হইলেন।

গ

গোবিন্দ হালদার মীনাকে সওদা ভাবিত। যাহাকে তিন লাখ্ টাকা দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছে তাহাকে আর অনাদর করা চলে না। অজস্র টাকা মীনার চরণে ঢালিয়া দিল। মীনার নিজের পছন্দ মতো সাহেব বাড়ীর আসবাবে গৃহ সজ্জিত হইল। কিন্তু মীনাসুন্দরী স্বামী পাইলেন না। রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত গোবিন্দহালদার আড়তে কেনা বেচা করিত। তারপর সুরাদেবীর উপাসনা করিয়া বেলগেছিয়া উদ্যান ভবনে সারানিশি কাটাইত। তাহাতে কিন্তু মীনার মনে আঘাত লাগিত না। কেবল লোক-চক্ষুর অন্তরালে মীনা চোকের জল ফেলিত। লোকে যাহা চায় মীনা সে সবই পাইয়াছে। অজস্র টাকা সে যথেচ্ছা খরচ করিতে পারিত। ছবির ন্যায় সুসজ্জিত প্রাসাদ, হীরকমুক্তা ও স্বর্ণের একরাশ অলঙ্কার দাস দাসী গাড়ী ঘোড়া কিছুরই মীনার অভাব নাই।

এইরূপে দুইবৎসর কাটিল। একদিন মীনা সান্ধ্যসমীরণ সেবনে বাহির হইয়াছে। দেখিল—রাজপথে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন—"দশচক্র প্রণেতা বিখ্যাত কবি সতীশচন্দ্র রায়ের প্রীতি-সম্বর্দ্ধনা মরকত রঙ্গমঞ্চ।" এ কোন্ সতীশচন্দ্র—এ কোন্ কবি? একজন তরুণ কবি তাঁহারি জন্য কবিতা লিখিত, তাঁহারি জন্য সাগরতীরে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহাকেই শুনাইত। পাঁচ বৎসর যাহার ছবি তাহার হৃদয়-মন্দির অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কোথায় ক্ষুদ্রপুরীর সেই দীন দরিদ্র সতীশচন্দ্র—আর মহানগরীর গৌরবমণ্ডিত সতীশচন্দ্র! এই সতীশচন্দ্র কি তাহার সেই সতীশচন্দ্র। মীনাসুন্দরী আত্মহারা হইল, সতীশচন্দ্র তাঁহারি তিনিও সতীশচন্দ্রের—মধ্যে মহা ব্যবধান অস্পষ্ট দুর্বোধ মন্ত্র। আর সে যে তিন লক্ষ রৌপ্য মুদ্রায় ক্রীত, স্বামীর খেলনার পুতুল। মানবের কোন্ মন্ত্রের এত মহীয়সী শক্তি আছে যে দেবতার বিধান প্রাণের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। মীনা চোখের জল ফেলিল।

ঘ

মীনা পুরী পরিত্যাগ করিয়া আসিলেও পুরীর সাগরস্রোত সেইরূপেই চলিত। মলয়ানীল সেইরূপেই বহিত, নীলাকাশে চাঁদ সেইরূপেই

জাগিত, পাখীরা সেইরূপেই গাহিত কিন্তু একজন দীন দরিদ্র কবির গান থামিল। সতীশচন্দ্র কবিতা লিখিতে বসিয়া দেখিতেন যে, তাঁহার কবিতার পদ মিল হইতেছেনা। পদ মিল হইলেও সুরতান কাণে বাজিতেছেনা। কি যেন ছিল—কি যেন নাই। শতস্মৃতি আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিত। মীনা তাহার কে—সে তো একবার তাহার দিকে চাহিলনা। সতীশ ভাবিল, তাহাকে ভুলিব। কিন্তু সেই প্রীতি-প্রফুল্ল জ্যোৎস্নাবিধৌত বালিকার ছবি তাহার হৃদয় মথিত করিয়া উঠিল।

পুরী আর ভাল লাগিল না। বিরহ-বিধুর কবি আঁখিজল ফেলিলেন। মীনা এখন পরনারী। চিন্তায় ক্লেশ, আকাঙ্খায় পাপ। তবে মীনাকে ভুলিতে হইবে। কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া মীনাকে ভুলিতে হইবে। একদিন মীনা বলিয়াছিল কলিকাতায় খ্যাতি লাভ হইবে। যখন মীনা হারাইয়াছি খ্যাতি লাভ করিব। সতীশচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন।

সহরে আসিয়া সতীশচন্দ্র সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিতে লাগিলেন। কবিতার আদর হইল বটে, তবে তাহাতে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইল না। পরে পেটের দায়ে নাটক ধরিলেন। বঙ্গ নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র নাই দ্বিজেন্দ্রলাল নাই—সতীশচন্দ্রের প্রথম নাটক "ভগবান ভূত" রঙ্গালয়ের, অধ্যক্ষ সাদরে গ্রহণ করিলেন। অর্থ আসিতে লাগিল। দ্বিতীয় নাটক "দশচক্রে" দেশে হুলুস্থুল্ পড়িয়া গেল। সংবাদ পত্রে, চা-বিপনীতে, স্কুল কালেজে, সাহিত্যিকদিগের বৈটকে সতীশচন্দ্রের নাম মুখরিত হইল। আজ তাঁহার অর্থের অভাব নাই। কোহিনুর রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ দশসহস্র মুদ্রায় "দশচক্র" অভিনয়ের একমাত্র সত্ব ক্রয় করিলেন। অতি অল্প দিন মধ্যে এক লক্ষ কেতাব বিক্রয় হইয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল, এমন শ্লেষ এমন ব্যঙ্গ, এমন সমাজচিত্র অনেক দিন নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয় নাই। সভা সমিতিতে সতীশচন্দ্রের সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। আজ যশ মান ধন জন সতীশচন্দ্রের লাভ হইল। সতীশচন্দ্র সব পাইল; আজ আর সে দীন দরিদ্র উপেক্ষিত ক্ষুদ্র পুরীর কবি নয়,—সে বঙ্গসাহিত্যজগতে আজ উদীয়মান প্রতিভা। তবে যাহা পাইবার নয়, সতীশচন্দ্রের হৃদয় তাহারই জন্ম ব্যথিত হইতে লাগিল।

কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধই বলো, আর রুগ্ন ও বৃদ্ধ পিতার শেষ অনুরোধই বলো সতীশচন্দ্র বিবাহ করিল। যশো গৌরব স্ফীত সতীশচন্দ্রের সব

পরিণীতা পত্নী সরোজ গৃহে যে শিক্ষা পাইয়াছিল তাহাতে তাহাকে এক মহান ধর্ম্মসাধনের পথে লইয়া যাইতেছিল। সে অষ্টাদশ বর্ষকাল জীবনে শিখিয়াছিল ধর্ম্মই মানবের প্রধান সম্বল। ঐশ্বর্য্য অনিত্য, সুখ অনিত্য। সে পূর্ব্ববঙ্গের এক সাধকের কন্যা। পিতৃগৃহে সে গৈরিক পরিত, অজিনাসনে শয়ন করিত, সারাদিন পূজাপাঠে কাটাইত। স্বামীগৃহে আসিয়া সে স্বামী প্রণীত "ভগবান ভূত" পড়িল, যন্ত্রণায় সে অস্থির হইল, সংস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালাময়ী তীব্র বিষে সে কাঁদিল। এই পুস্তকের প্রণেতা তাহার স্বামী! যাহাকে সেবা করিয়া ভক্তি করিয়া সে নারী জন্ম সার্থক করিবে,তিনি স্বর্গের দেবতাকে রঙ্গালয়ে আনিয়াছেন, বারাঙ্গনার মুখ দিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতেছেন! সরোজের সব গেল—ধর্ম্ম রসাতলে গেল, দাম্পত্যজীবন গেল।

স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কেতাব তুমি লিখেছ? সতীশচন্দ্র পত্নীর বিষাদ ক্লিষ্ট ম্লান মুখ খানি দেখিয়া ভীত হইলেন।

সরোজ। এই পুস্তক বিক্রয় কোরে গৃহ সজ্জিত করেছ! ইহার টাকা আমাদের আহার দিতেছ। ও! ভগবান, আমাকে রক্ষা করো!

সতীশ। ইহা আমার নিজের মত নয়। তবে আমোদের ছলে এই প্রহসনখানা লিখেছি।

সরোজ। দেবতা লয়ে প্রহসন! তুমি আমার স্বামী। আর না, আমার বিবাহের সাধ মিটেছে। গুরু ব'লেছিলেন বিবাহ না করলে নারী জীবনের পূর্ণতা হয় না। গুরু! আমায় রক্ষা কর। আজই আমি ঢাকায় যাব।

সতীশচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, স্ত্রীর মন ফিরিলনা। সেই রাত্রেই সরোজ ঢাকায় চলিয়া গেলেন। তিন দিবস বিবাহিত জীবনের পর সতীশচন্দ্র আবার সংসার অরণ্যে একলা হইলেন।

৬

মীনা যখন দেখিলেন, দশচক্রের দেশমান্য-প্রণেতা তাঁহারই সেই সতীশচন্দ্র, তিনি সতীশচন্দ্রকে একদিন স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্র সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। তিনি উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্খা ও আশা পত্রে জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। মীনার পত্ররাশি

সতীশচন্দ্রের গৃহে অনুযুক্ত রহিল। মীনা তখন আপনাকে ভুলিল, বিবাহিত স্বামীকে ভুলিল, বিবাহের মন্ত্রকথা ভুলিল! সে তখন অকূলে ঝাঁপ দিল। সে একদিন সতীশচন্দ্রের বাসগৃহে আসিল। আসিয়া অনেক কাঁদিল। বলিল "সব পেয়েছি কিন্তু কিছুই পাই নাই। যাহা ল'য়ে মানুষ বাঁচে, তাহা আমি পাই নাই। দেখ আমার প্রাসাদ, দেখ আমার রাজসম্পদ—সকলই পেয়েছি। কিন্তু যাহা পেলে নারীজন্ম সার্থক হয়, আমি সে প্রেমের এক বিন্দু পাই নাই। রক্ষা কর! ঐ চরণে মাথা রাখ্‌তে দাও! কিছুই চাই না! সুধু ভালবাসিবার অধিকার দাও! চল পুরীর সেই সাগর তীরে—অনন্তের তলে দাঁড়াইয়া আবার সেই তোমার কবিতা শুনিব।

সতীশচন্দ্র আত্মহারা হইলেন। প্রেমের মহিয়সী মন্ত্রে তাঁহার হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া গেল। মীনা বলিল, চল! সময় প্রশস্ত! প্রেম চির পবিত্র, আমি স্বামীর এক কপর্দ্দকও লইয়া আসি নাই। চল, আমার হৃদয়ের রাজা! আর দেরি কোরো না।

সতীশচন্দ্র তখন তিন দিনের সময় চাহিলেন। তিন দিন পরে প্রেমের মন্দিরে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবেন। যশ, মান, কবিতা সকল যাক, প্রেমের জয় হউক!

*　*　*　*

সতীশচন্দ্র ঢাকায় গিয়া পত্নীকে বলিলেন, এস, আমার গৃহে এস, আমি সমস্ত কবিতা, সমস্ত কেতাব তোমার সম্মুখে পোড়াইব। পুস্তক বিক্রয়ের যত আসবাব, যত টাকা সব বিলাইয়া দিব। জীবনোপায়ের জন্য যে পথ বলিবে তাহাই ধরিব।

সরোজের মন টলিল না। যাহা ছেড়ে এসেছি তাহা আর লইব না। ধর্ম্মে তোমার মতি হউক। ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সতীশচন্দ্র। দেখ আমি জাহান্নামে চলিলাম। তুমি কি আমাকে রক্ষা করিবে না? তুমি আমার স্ত্রী, ধর্ম্মপত্নী। আমি চলিলাম, ভগবানের নিকট তুমি দায়ী। সতীশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন।

*　*　*　*

পুরীর সাগরবক্ষে একখানি তরণী নাচিতেছে। চাঁদের আলো সাগরের অতল জলে ক্রীড়া করিতেছে। মীনা বলিল, 'কবির প্রেম তো

এইরূপ হওয়াই চাই' আজ জগত আনন্দময়। আজ সাগরবক্ষে ভাসিব। আজ মধু যামিনী, মধু জীবন। মাঝিরা বারণ করিল। মীনা শুনিল না, ক্ষুদ্র তরণী কোথায় ভাসিয়া গেল, কেহ সন্ধান পাইল না। পর দিবস বালুকাসৈকতে তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া গেল। উভয়ে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ। সাগরতীরে এখনও যেন শোনা যায়, মীনা বলিতেছে—

"কবির প্রেম এইরূপ"

শ্রীবিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায় (বি, এল)

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

ওলাউঠা (বিসূচিকা)—যশোহর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রণীত ও বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনার ডাক্তার বেণ্টেলে সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ওলাউঠা রোগ সহজে নিবারণ করা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও ইহা সহজে নিবারণ করা যায়।

ভেদ, বমন,মূত্ররোধ,অঙ্গে খিলধরা, পেটের বেদনা ইত্যাদি ওলাউঠা রোগের সাধারণ লক্ষণ। উহার বীজ চক্ষে দেখা যায় না, কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়। ইহা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বীজাণু এবং দেখিতে " " কমার ন্যায়, এই নিমিত্ত ইহাকে কমা বেসিলস্ (দণ্ড) বলে। ওলাউঠা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বমি, মূত্র ও মলে এই বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনক্রমে যদি এই বীজ কাহারও পানীয় দুগ্ধ, জল বা খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তৎপরে উহা কেহ খায়, তাহা হইলে তাহার ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তবে যদি কাহার ঐ বিষ রোধ করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে সে রোগাক্রান্ত না হইতেও পারে। অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে অনেক সময় ওলাউঠা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় নদী পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়ে ধৌত করিয়া উহার জল দূষিত করে এবং তৎপরে যদি কেহ ঐ সমস্ত দূষিত জল পান করে তাহা হইলে সেও ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইতে পারে। যাহারা ওলাউঠা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে, তাহার বমন ও মলাদি স্পর্শ

করিয়া উত্তমরূপে হস্তাদি ধৌত না করিলে তাহারা ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে।

ওলাউঠা রোগীকে বিশুদ্ধ জল পান করিতে দেওয়া ভাল এবং কখনও জল বন্ধ করা উচিত নহে। রোগাবস্থায় রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে দিলে ঔষধ ব্যবহারের অর্দ্ধেক ফল পাওয়া যায় এবং বমন বেগ থাকিলে বরফ মিশ্রিত জলে উপকার হয়। উত্তমরূপে সিদ্ধ করিলে জল বিশুদ্ধ হয়।

যেখানে ঔষধ সহজে প্রাপ্য নহে, সেখানে জলে লেবুর রস ও সামান্য লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে ঔষধ ব্যবহারের ফল দর্শে।

সহজ চিকিৎসা।

শিরা চিরিয়া কিম্বা মলদ্বার দিয়া লবণ জলের পিচ্‌কারী দেওয়া এবং পোটাসিয়াম্‌ পারমাঙ্গনেট্‌ পিল (বটিকা) সেবন অধুনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই প্রকার চিকিৎসা—বিশেষতঃ লবণ জলের পিচ্‌কারী ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত করা উচিত নয়।

পানীয় জল শোধন

স্ফুটন্ত জলের উত্তাপে ওলাউঠার বীজ নষ্ট হয়। সর্ব্বদাই দুগ্ধ ও পানীয় জল সুসিদ্ধ করিয়া পান করিবে, যেহেতু সুসিদ্ধ হইলে রোগ-বীজ নষ্ট হয়, যে সকল নদী পুষ্করিণী কিম্বা কূপের জল ব্যবহৃত হয়, উহা দূষিত হইলে অন্ততঃ ১০ দশ দিন উহার জল ব্যবহার করিবেনা, উহা পুনরায় দূষিত না হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগ বীজ আপনা হইতে নষ্ট হইবে।

পোটাসিয়ম্‌ পারমাঙ্গানেট দ্বারা কূপের জল শোধন করিবে। পুষ্করিণীর কিনারায় ক্লোরাইড অব লাইম ছড়াইয়া দিয়া শোধন করিবে, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায়ই সুসিদ্ধ জল ব্যবহার করিবে, কেননা উহা নিরাপদ।

রোগীর শুশ্রূষায় সতর্কতা

যখন রোগীকে ছুইবে কিম্বা তাহার মলমূত্র, বমনাদি পরিষ্কার করিবে তখনই পারক্লোরাইড অব মারকারির জল কিম্বা ফেনাইল অথবা কারবলিক সাবান নিতান্ত পক্ষে লবণ সংযুক্ত মৃত্তিকা দ্বারা হাত পা ইত্যাদি অতি সাবধানে উত্তমরূপে ধৌত করিবে।

মক্ষিকা নিবারণ

ওলাউঠা রোগীর মলাদি অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে ঐ রোগ একবাড়ী হইতে অন্যবাড়ী বা একব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে মাছি দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে। কারণ, যে সমস্ত মাছি ঐ সমস্ত মলাদিতে বসে, উহারাই আবার খাদ্যাদির উপরে বসে, এবং রোগের বীজ বহন করিয়া খাদ্যাদি বিষাক্ত করে, অতএব রোগী মলত্যাগ বা বমন করিলে তৎক্ষণাৎ ছাই দিয়া ঢাকিবে এবং পরে উহা পোড়াইবে বা মাটীতে পুতিয়া ফেলিবে।

ময়লা পরিচ্ছদ

ওলাউঠা রোগীর কাপড় এবং বিছানাদি পোড়াইয়া ফেলিবে বা শোধন করিবে। কার্পাস বস্ত্রাদি সিদ্ধ করিয়া দিন কয়েক রৌদ্রে শুকাইবে। পশমী বস্ত্র শোধন দ্রব্য,—যথা পার ক্লোরাইড্ অব মারকারির জল অথবা পার মাঙ্গানেট অব পটাসিয়াম দ্বারা ভিজাইয়া জলে ধৌত করিবে এবং রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

ওলাউঠার সময় স্বগৃহে প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী ব্যতীত বাহিরের খাদ্য গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে অথবা যে দ্রব্য সুসিদ্ধ নহে তাহাও ভক্ষণ করা বা জল বা দুগ্ধ যাহা সুসিদ্ধ নহে তাহা পান করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

ম্যালেরিয়া

১। ম্যালেরিয়া জ্বর সহজে নিবারণ করা যায়। মানুষের শরীরে অন্য শরীরোপজীবী অতি ক্ষুদ্র কোন জীবাণু (১) যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিলে এই জ্বর হইতে পারে।

---

(১) পরগাছা যেমন অন্য বৃক্ষ আশ্রয় না করিয়া বর্দ্ধিত হইতে পারেনা এবং সকল সময়ই কোন না কোনও গাছের আশ্রয় ভিন্ন দৃষ্ট হয় না এই ক্ষুদ্র জীবাণুও তদ্রূপ মনুষ্য শরীর এবং এনোফলিস্ নামক এক প্রকার মশক শরীর ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না বা বর্দ্ধিত হয় না। ইহা জলে স্থলে, শূন্যে বা বায়ুতে কোথাও দেখা যায় না, কেবল মশক ও মনুষ্য শরীরে দেখা যায়। এনোফলিস্ মশক আকারে লম্বা একখানি কাঁটার ন্যায় কিন্তু ইহাদের গায়ে পায়ে, শুঁড়ে কোঁটা কোঁটা সাদা দাগ আছে।

২। এই ক্ষুদ্র জীবাণু এনোফিলিস নামক মশার দ্বারায় এক শরীর হইতে অন্য শরীরে নীত হয়। এই জীবাণু যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিলেই জ্বর হয় বটে কিন্তু অপাক এবং ঠাণ্ডার দ্বারায় ইহা বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত হয়। যদি শরীরে ঠাণ্ডা না লাগে এবং অপাক না থাকে তবে ম্যালেরিয়া বিষ সহজে কিছু করিতে পারে না।

৩। রাত্রিতে সাবধানে মশারি ব্যবহার করা এবং জ্বরাক্রান্ত হইলে সর্ব্ব ঋতুতেই কুইনাইন ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা এবং ম্যালেরিয়ার সময় অর্থাৎ আষাঢ়ের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সুস্থাবস্থায় প্রতি-রোধকস্বরূপ কিঞ্চিৎ কুইনাইন সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত ব্যায়াম অর্থাৎ শরীর পরিচালন, বিশুদ্ধ বায়ু এবং বিশুদ্ধ জল সেবন, আহার বিহারে মিতাচার, গৃহাদির পরিচ্ছন্নতা এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি উপায় দ্বারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে মুক্তি লাভ করা যায়।

৪। দেহে যে সমস্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে তাহার ধ্বংস সাধনই ঔষধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এবং এই জীবাণু যাহাতে মশক দংশন দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, এবং মশক দংশন দ্বারা শরীরে বিষ প্রবেশ করিলেও যাহাতে ঐ বিষ শরীরের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে শরীরকে এইরূপ ভাবে রাখা ইত্যাদি প্রতিরোধ উপায়-গুলির তদ্রূপ উদ্দেশ্য। মশারি ব্যবহার করিলে মশায় কামড়াইতে পারেনা সুতরাং ম্যালেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারেনা, এনোফিলিস মশক মারিয়া ফেলিলেও উহা দংশন করিতে পারেনা। বাড়ীর নিকট ডোবা, গর্ত্ত ইত্যাদি বুজাইয়া ফেলিলে এনোফিলিস্ ইহাতে জন্মাইতে পারেনা। গৃহাদিতে আলোক এবং বায়ু স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রবেশ করিতে পারিলে সেখানে মশক থাকিতে পারেনা। আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত অল্প পরিমাণে কুইনাইন খাইতে পারিলে শরীরে যে অবস্থা হইবে তাহাতে মশক দংশনেও কিছু করিতে পারিবে না।

নিবারণোপায়

১। বাড়ীর চারিদিক খোলা রাখিবে; বাড়ীর নিকট কোন গাছ গৃহে আলোক প্রবেশের এবং বায়ু সঞ্চালনের যদি ব্যঘাত করে তাহা কাটিয়া ফেলিবে। বাড়ীর নিকট সমস্ত জঙ্গল কাটিয়া ফেলিবে।

মশকেরা দিনের বেলায় এই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। বাড়ীর বাতায় মধ্যে কোন স্থানে জল জমিতে দিবেনা, নালি কাটিয়া বাহির করিয়া দিবে।

২। গৃহমধ্যে বিশেষতঃ শুইবার ঘরে যত অল্প জিনিস রাখিতে পার তাহা রাখিবে। মাকড়্সা বা অন্য প্রকার আবর্জ্জনা ঘরে রাখিওনা, সংক্ষেপতঃ গৃহগুলি এরূপ ভাবে রাখিবে যেন মশা লুকাইয়া থাকিতে না পারে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবে এবং একটু রাত্রি হইলে খুলিয়া দিতে পার। সন্ধ্যার সময়ই মশা ঘরে প্রবেশ করে। প্রত্যহ সকালে বৈকালে গৃহের সর্ব্বস্থানে ধূপ ধূনা দিবে।

৩। বাড়ীর নিকট ডোবা গর্ত্তাদি বুজাইয়া দিবে, যদি বুজাইতে না পার তাহা হইলে লাঠির আগায় কেরোছিনে নেকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া সপ্তাহে একবার করিয়া ডোবা গুলির কিনারায় ঘুরাইয়া লইবে উহাতে মশকের ডিম্ সব মরিয়া যাইবে। বাড়ীতে পুকুর থাকিলেও তাহাতে ঐরূপ করিবে তাহাতে জলের কোন ক্ষতি হইবেনা। পুকুরে বা ডোবায় যথেষ্ট কই মাছ ছাড়িয়া দিবে উহারা মশার ডিম্ খাইয়া ফেলিবে।

৪। মুখ না ঢাকিয়া হাঁড়ি,কলস ইত্যাদি বাহিরে রাখিবেনা,উহাতে বর্ষার জল জমিলে মশায় ডিম পাড়ে। পরিত্যক্ত হাঁড়ি কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। যদি বাহিরের হাঁড়ি কলস রাখিতে হয়, মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

৫। সকল ঋতুতেই মশারির মধ্যে শুইবে। অতি গরীব লোকেও পুরাতন ধুতি সাড়ির দ্বারা মশারি তৈয়ার করিতে পারে। যদি একান্ত পক্ষে মশারি জোগাড় না করিতে পার তবে গায়ে সরিশার তৈল, মালিস করিয়া শয়ন করিবে। কোনরূপ তীব্র গন্ধের নিকট মশক আসেনা।

৬। বাড়ীতে কেহ জরাক্রান্ত হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র মশারির ভিতর রাখা উচিত।

৭। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে ক্যাষ্টর অয়েল বা তদ্রূপ কোন রেচক দ্বারায় জোলাপ লইবে; প্রত্যহ বাড়ীর বালক বালিকাদের জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যদি জিহ্বায় সাদা আবরণ দেখা যায় তখনই বুঝিবে যে উদর অপরিষ্কার হইয়াছে—জোলাপ দেওয়া দরকার।

৮। আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে সুস্থাবস্থায়ও ৮ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাইবে। যেস্থানে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সেস্থানে ইহাপেক্ষা অধিক খাওয়া দরকার হইবে। যেস্থানে অনেক লোকের পেটে পিলে বড় দেখা যায়, সেইস্থানে বুঝিতে হইবে যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী এবং এইরূপ হইলে সপ্তাহে প্রতিদিন ৪ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন কিম্বা দুই তিন বারে ২৮ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়া আবশ্যক। বালক এবং শিশুদের পক্ষে ইহাপেক্ষা অল্প দিবে কিন্তু এটা সকলের জানা উচিত যে, বয়স্ক ব্যক্তিদের অপেক্ষা বালকেরা অধিক পরিমাণে কুইনাইন সহ্য করিতে পারে। ম্যালেরিয়া ঋতুতে সুস্থাবস্থায় এইরূপ কুইনাইন খাইলে যদি কোন প্রকারে ম্যালেরিয়ার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে তাহা হইলেও কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

চিকিৎসা

৯। যখনই ম্যালেরিয়া জ্বর হয় অর্থাৎ হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া শরীরে কম্প দিয়া জ্বর হয় এবং একদিন বা দুইদিন বা তিনদিন অন্তর বিচ্ছেদ হয়, তখনই কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে জোলাপ লওয়া উচিত এবং প্রতিদিন বিচ্ছেদ অথবা জ্বর কম থাকা সময় চারিমাত্রায় ১৬গ্রেণ কুইনাইন খাইবে। জ্বর সারিয়া গেলে, পরেও এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ ৮ গ্রেণ করিয়া খাইবে এবং তৎপরে একপক্ষ (১৫ দিন) ধরিয়া ৪ গ্রেণ করিয়া খাইবে। অনেকের জ্বর সারিয়া গেলে যে পুনরায় জ্বর হয় তাহা কুইনাইন সেবনের জন্য নহে,—অল্প পরিমাণে এবং অল্প দিনের জন্য কুইনাইন খাইবার ফলে।

ভারতের অন্ধ—ইয়ুরোপের প্রায় সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে অন্ধের সংখ্যা অধিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে অন্ধের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বায়ুর শুষ্কতা, বাসগৃহে বায়ু সমাগমের ব্যবস্থা না থাকা এবং অতিরিক্ত উত্তাপ প্রভৃতি অন্ধতার কারণ বলা যায়। অন্ধত্বের কারণ নিঃসংশয়ে বলা দুরূহ। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থা-শূন্য গৃহে বাস করিলে চক্ষুর অনিষ্ট হয়। শীতের দিনে অথবা মশক তাড়াইবার জন্য লোকে এইরূপ গৃহে ধুঁয়া দিয়া থাকে, উহাতে চক্ষুর অত্যন্ত অপকার হয়। ধূলিতেও চক্ষুর অত্যন্ত অপকারক।

কুশদহ-সমিতির কার্য্য

পূর্ণ চৈতন্য শক্তির কণিকামাত্র স্পন্দনে শিশুর জন্ম। বৃক্ষলতা-গুল্মের বীজ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়—এই কি ঐ মহামহিরুহের জনক! 'কুশদহ-সমিতি' মহানুভাবের একটি রশ্মিরেখা লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। "কুশদহবাসীর মেলামেশা—আলাপ পরিচয় প্রীতি-সদ্ভাব বর্দ্ধন" এই কয়টি বর্ণমালায় বা শব্দে তাহার প্রথম পরিচয় মাত্র। ঐটুকু ধ্বনির মধ্যে যে মহাসত্য—মহাভাব—মহাশক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার প্রকাশ করাই সমিতির প্রকৃত কার্য্য।

কুশদহ-সমিতি সূতিকাগৃহ হইতে বাহির না হইতেই একটি কথা উঠিল, "সমিতি কি কিছু কাজ করিবেন, কিম্বা কেবল মেলামেশাই উদ্দেশ্য?" সেই সঙ্গে সঙ্গে একথাও উঠিল, "সমিতির আগে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হউক, তখন কাযের জন্য ভাবিতে হইবে না। জীবনীশক্তি হইলে কায হইবেই। সজীবপদার্থ নিষ্ক্রিয় হয় না, কিন্তু প্রাণহীন দেহ কি কখনও কোনও কায করিতে পারে?" বলা বাহুল্য যে, মেলামেশা, আলাপ পরিচয়—সদ্ভাব বর্দ্ধনই সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠার সোপান।

প্রাণহীনতা ঘটিয়াছে বলিয়াই তো কুশদহর বা কুশদহবাসীর এত দুরবস্থা, তবে মৃত্যু এখনও হয় নাই, কণ্ঠাগত প্রাণ আছে। সে প্রাণ আবার সর্ব্বাঙ্গে ফিরিয়া আসিতে পারে—যদি কুশদহবাসী প্রেম-সঞ্জীবনী-সুধা পান করেন। জন্মভূমির প্রতি প্রেম—ভাইএর প্রতি প্রেম, এই প্রেমই সঞ্জীবনী সুধা! প্রেমের বীজ কুশদহবাসীর প্রাণে আছে। তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। আবার বলি, "মেলামেশাই" সমিতির উদ্বোধন! মেলামেশাই তো সমবেত শক্তি সঞ্চয় ও বর্দ্ধনের উপায়, তাহার জন্যই তো সমিতির জন্ম। সুতরাং মৌলিকতার হিসাবেও বলা যায়, মেলামেশাই সমিতির সর্ব্ব প্রধান কার্য্য।

এ খানে সেই কুটতর্কের প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে—"বীজ আগে কিম্বা বৃক্ষ আগে?" বীজ হইতে বৃক্ষ, কিম্বা বৃক্ষ হইতে বীজ। সমিতি কায করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিবেন, কিম্বা শক্তি সঞ্চয় করিয়া কায করিবেন?

এখানে আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে বোধ হয় কথাটি সহজেই পরিষ্কার হইতে পারে।

এক সময় কয়েকটি পল্লীবাসী সহরের কলকারখানা দেখিতে গিয়াছিল। তাহারা দেখিল, কলের চারিদিকে "হুড় হুড়—হুড় হুড়" শব্দ হইতেছে আর নানা রকমের পদার্থ ঘুরিতেছে এবং চলিতেছে। কিন্তু মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পদার্থ (বয়লার) রহিয়াছে। সেটা নড়েও না, কোন শব্দও তাহার নাই। ইহা দেখিয়া তাহাদের মনে হইল, অনর্থক কেন এইটা এত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এখানে ঐরূপ সচল পদার্থ আরও থাকিলে, আরও তো কায হইতে পারিত—অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দৃশ্যমানকেই শক্তি বলিয়া মনে করে। শক্তি যে অদৃশ্য বস্তু এ কথা সকলে বুঝিতে পারে না। বাস্তবিক শক্তি দেহে নয়—প্রাণে বা জ্ঞানে, এ কথা মানুষ বুঝিয়াও বুঝে না।

শক্তি যখন সত্যের ভূমিতে দৃঢ় হয়—আবেগময়ী হয়, তখনই তাহা কার্য্যের আকারে প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রাণহীন আকার কোনও কায করিতে পারে কি? হায়রে মানুষ,—প্রাণের দুরবস্থার প্রতি উদাসীন হইয়া বাহিরে কর্ম্মের প্রাচীর খাড়া করিতেই ব্যস্ত! তাই কর্ম্মক্ষেত্রেও ঐ গণ্ডগোল। অধিকাংশ স্থলে ব্যর্থ মনোরথ!

কুশদহ-সমিতি কার্য্য করিবেন বলিয়া মহা তৎপরতার সহিত কলিকাতায় অবস্থিত ৯ জন সভ্য মনোনয়ন করিয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা (এক্জিকিউটিভ কমিটী) গঠন করিলেন। কুশদহর মধ্যে নিতান্ত জলাভাব কোন পল্লীর পানীয় জল সরবরাহ করা যায় কি না এই একটি মাত্র কাযের ক্ষুদ্র আশা লইয়া হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র, (এক-কালীন ৪০০৲ শত বা ততোধিক) অর্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু কায করিবে কে—পল্লীতে অনুসন্ধানে যাইবে কে—কি উপায়ে জল সরবরাহ হইতে পারে—কোন কাযে কত ব্যয় হইতে পারে, এই সকল বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় আলোচনা এবং ব্যয়ের পরিমাণ (এষ্টিমিট) সংগ্রহ হইতে লাগিল। প্রশ্ন উঠিল, পাকা ইদারা করিলে অজ্ঞ পল্লীবাসীরা যদি নষ্ট করিয়া ফেলে! গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটী হইতে ঘটক পাড়ায় একটি পাকা ইদারা নির্ম্মিত হইয়াছিল; মল-মূত্র, ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করিয়া কে বা কাহারা তাহা নষ্ট করিয়াছিল। তারপর পাইপ (টিউব ওয়েল) দ্বারা যে প্রণালীতে জল উত্তোলন করা হইতেছে—তাহার কথাও উঠিল কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইবে কিনা—তৎপরে

পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা যায় কি না, এই সকল বিষয় আলোচনা চলিয়াছে। এ দিকে সম্মুখে বর্ষা। সমিতির নিয়মাবলী প্রণয়ন হইয়াছে, তাহা সাধারণ সভায় অনুমোদিত করিয়া লইতে কত মতভেদ, বহুতর্ক বিতর্ক হইয়া যদিও সভার নিয়মানুসারে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহাদের কোন কোন মত রক্ষা হয় নাই, তাঁহারা নাকি সমিতির কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন।

সমিতির সভ্যগণের মধ্যে কোন কোনও বিষয় মতভেদ, ভাব ভেদ হইবেই। সকল বিষয় সকলের একমত হওয়া কখনও সম্ভবপর নয়। আর তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই বরং স্বাধীন মতের দ্বারাই সমিতির শক্তি পুষ্ট হওয়া সম্ভব। সুতরাং তজ্জন্য সমিতির প্রতি অনুরাগের অভাব হইবে কেন?

আমাদের মনে হয়, সমিতির মেলামেশা ও সদ্ভাববর্দ্ধন কাযটীকে অত্যন্ত গুরুতর ভাবে প্রধান রূপে ধরিতে হইবে। ইহাকে ক্রমশঃ বিস্তার এবং ঘন-নিবিষ্ট ভাবে পরিপুষ্ট করিতে হইবে। এই কার্য্যে প্রথমে অর্থ এবং অনুরাগের প্রয়োজন। সমিতির একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের বিশেষ প্রয়োজন, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিরও প্রয়োজন, এইখানে সকলে অধিকাংশ অবকাশ কালে যাহাতে মিলিতে পারেন, তাহার জন্য সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। এইটি হইবে কুশদহ-সমিতির মূল উৎস। এইস্থান কলিকাতায় হওয়াই স্বাভাবিক। এইখানে আসিলেই প্রাণে সদ্ভাব—আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিবে। দেশের প্রতি অনুরাগ—দেশের হিত চিন্তা—হিতকামনা দ্বারা একটি জমাট ভাব গঠিত করিতে হইবে এবং তাহা কুশদহর পল্লিতে পল্লিতে সংক্রামিত করিয়া, কার্য্যকরী শক্তি লাভে সকলকে সক্ষম করিতে হইবে।

সমিতির আদর্শ এবং কার্য্য সম্বন্ধে আমরা যাহা সুস্পষ্ট দর্শন করিতেছি, প্রয়োজন হইলে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ এবং আন্দোলন করিতে চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, আমরা সমিতির একান্ত হিতকামনা করি বলিয়াই এত কথা বলিলাম। ভগবানের কৃপায় সমিতি জীবন-পথে—কার্য্য-ক্ষেত্রে ক্রমশঃ অগ্রসর হউক। তিনিই ইহার জীবন রক্ষা করুন। কুশদহবাসী একজনও যেন এই সমিতির প্রতি উদাসীন না হন।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যায় ৪নং কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার স্কটীসচার্চ কলেজগৃহে শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে 'কুশদহ সমিতির' একটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। মেঘবৃষ্টি সত্বেও শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী এবং কুশদহ সম্পাদক প্রভৃতি ১৭।১৮টি সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভায় প্রথমতঃ সমিতির নিয়মাবলী আলোচিত হইয়া তাহা সভা কর্তৃক গৃহীত হইল। দ্বিতীয়, কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে শক্তিশালী করিবার জন্য আরো ৩ জন কার্য্যদক্ষ নূতন সভ্য গ্রহণ করা হইবে ধার্য্য হইল।

জমিদার (সেজোবাবু) শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমরা চিন্তিত আছি। তিনি এক্ষণে থার্শিয়াং শৈলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা তাঁহার আরোগ্যসংবাদ শুনিবার জন্য আশা করিয়া রহিয়াছি।

গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী গৈপুর গ্রামে যে একটি পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এবার তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কিন্তু এমন তৎপরতার সহিত কার্য্য হইয়াও এবার খনন কার্য্য জানি না কেন শেষ হইল না—বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং ইহাতে ব্যয়াধিক্য ঘটিবে।

সম্প্রতি আমরা দেখিলাম—খাঁটুরা ছুতার পাড়ায় একটি স্ত্রীলোক মৃত কল্পাবস্থায় নিজের জীর্ণকুটীরের বাহিরে পড়িয়া আছে। তাহার আত্মীয় কেহ থাকিলেও তাহারা শীঘ্রই তাহার মৃত্যুকামনা করিতেছে। অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এভাব আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। রোগিণী ঔষধ পথ্য পাওয়া দূরে থাক—একটু জলও পায় কি না সন্দেহ। বিবস্ত্রা হইয়া পড়িয়া আছে—রাত্রে শৃগাল কুকুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবারও কেহ নাই। সে তো মরিবেই কিন্তু একটু সচ্ছন্দেও মরিতে

পারিতেছে না—হায় রে! মানুষের কি দুর্দ্দশা। খাঁটুরা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "এরূপ ঘটনা এখানে মধ্যে মধ্যে যে দেখা না যায় এমন নয়, কিন্তু কোনও উপায়—ব্যবস্থা নাই।" সমবেত শক্তিতে কায করিবার জন্য 'কুশদহ-সমিতির' জন্ম,—দেখুন সম্মুখে কি ভীষণ দৃশ্য! মানুষ মরিতেছে, তাহার মুখে এক ফোঁটা ঔষধ পথ্য—জল পর্য্যন্ত দিবার কেহ নাই—আর আমরা সচ্ছন্দে আহার করি—নিদ্রা যাই। আমাদের মনে হয় খাঁটুরা দাতব্যচিকিৎসালয়ের সহিত দুঃস্থরোগী থাকিবার একটু সামান্য ব্যবস্থাও যদি হয়—কুশদহবাসীর মধ্যে একজন ধনীর প্রাণেও কি ধনের স্বার্থকতা ও এই বেদনার কথা জাগিতে পারেনা?

কুশদহ-পঞ্জী

—:-:—

গতবারে চৌধুরীবংশের বিবরণে দুইটি ভ্রম ঘটিয়াছে। পাঠকবর্গ ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া সংশোধিত আকারে পাঠ করিবেন।

১। বৈদ্যনাথ চৌধুরীর বিবাহ হেঁড়ে বায়সায় গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নীর স্থলে চক্রবর্ত্তীর ভগ্নী হইবে।

২। ননীগোপাল চৌধুরীর বিবাহ খাটীকোমরা ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের কন্যার স্থলে তাঁহার পুত্রের দৌহিত্রীর সহিত হইবে। (সংগ্রাহক)

গোবরডাঙ্গা—মুখোপাধ্যায়

গোবরডাঙ্গার বর্ত্তমান জমিদার রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এবং ভ্রাতৃগণের (উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ) বৃদ্ধ প্রপিতামহ—

৺শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়।

জেলা যশোহর—সারষা গ্রামের শ্যামরাম মুখোপাধ্যায় ইছাপুরের রামচরণ (তিতু) চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করেন। শ্যামরাম, বাণেশ্বর, ও সীতারাম তিন সহোদর। বাণেশ্বর সাগরদাড়ী, সীতারাম ধান্দিয়ায় ও শ্যামরাম নিজবাটী সারষায় বাস করেন। বাণেশ্বর ও সীতারামের সন্তান সন্ততির বিবরণ অপ্রাপ্য। শ্যামরামের দুই পুত্র—জগন্নাথ ও খেলারাম।

৺জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়।

জগন্নাথের শ্বশুরালয় পীরজঙ্গে। জগন্নাথের ৪ পুত্র, ৩ কন্যা।

পুত্র (১) গৌরসুন্দর। (২) মদনমোহন। (৩) দেবনারায়ণ। (৪) লালমোহন।

কন্যা—(১) তারামণি। (২) রামপ্রিয়া। (৩) ব্রহ্মময়ী।

(১) গৌরসুন্দরের শ্বশুরালয় দত্তপুকুর। তৎপুত্র বেচারাম। বেচারামের শ্বশুর—গৈপুরের ৺শিবনারায়ণ চৌধুরী। বেচারাম শ্বশুরালয়ে বাস করেন।

বেচারাম মুখোপাধ্যায়ের ৩ পুত্র। (১) সুরনাথ। (২) অন্নদা। (৩) ফণী।

(১) সুরনাথের শ্বশুর, ইছাপুরের প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরনাথের ৩ পুত্র। (১) ভূপেন্দ্র। (২) বীরেন্দ্র। (৩) ধীরেন্দ্র।

(১) ভূপেন্দ্রের শ্বশুরালয় হেতমপুরে। (২) বীরেন্দ্রের ১ম শ্বশুর ইছাপুরের ভূষণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২য় শ্বশুরালয় সেখপুরে।

(২) অন্নদার শ্বশুরালয়, ২৪ পরগণা—পীরোজপুরে। (৩ ফণীর ১ম শ্বশুর সারষার রাইচরণ বন্দোপাধ্যায়, ২য় স্ত্রী ইছাপুরের অটল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নী।

গৌরসুন্দরের বংশের বিবাহ বিবরণ এই পর্য্যন্তই পাওয়া গেল।

৺ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র মদনমোহন। তাঁহার স্ত্রী, নদে গোক্‌নার কৃষ্ণ রায়ের ভগ্নী। মদনমোহনের কন্যা মহেশ্বরী দেবীর স্বামী সারষার গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

(৩) দেবনারায়ণের শ্বশুরালয় হাদিপুরে।

(৪) লালমোহনের শ্বশুরালয়, বগচরের বক্‌সীদিগের বাড়ী। লালমোহনের দুই পুত্র—(১) চন্দ্রমোহন। (২) কৃষ্ণমোহন। দুই কন্যা—(১) পীতাম্বরী দেবীর স্বামী বেহালার শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার পুত্র বেচারাম চট্টোপাধ্যায় (আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য)

(২) দিগম্বরী দেবীর কুমারী অবস্থায় মৃত্যু হয়।

(১) চন্দ্রমোহনের ১ম শ্বশুরালয় ধর্ম্মদহে, ২য় মহেশপুরে। প্রথম পত্নীর পুত্র যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্রের স্ত্রী, তারামণি দেবী—ইছাপুরের নীলকণ্ঠ চৌধুরীর কন্যা।

যোগেন্দ্রের ২ পুত্র—(১) মহেন্দ্র, (২) জ্ঞানেন্দ্র; ২ কন্যা (১) প্রমীলা। (২) ঊর্ম্মিলা।

(১) মহেন্দ্রের শ্বশুরালয় কচুয়া গ্রামে।

(২) জ্ঞানেন্দ্রের স্ত্রী ইছাপুরের তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। জ্ঞানেন্দ্রের ৩ কন্যা—(১) বীণাপাণি, (২) সুরধনী, (৩) অবিবাহিতা।

(১) প্রমীলা দেবীর স্বামী কালনার প্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(২) ঊর্ম্মিলা দেবীর স্বামী বেহালার নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১) বীণাপাণি দেবীর স্বামী বৈঁচির হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

(২) সুরধনী দেবীর স্বামী বৈঁচির সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়।

(১) চন্দ্রমোহনের কন্যা সৌরভী দেবীর স্বামী সারষার নেপাল মোহন চট্টোপাধ্যায়।

(১) তারামণি দেবীর শ্বশুরালয় সেখপুরে গঙ্গোপাধ্যায়-বাড়ী।

(২) রামপ্রিয়া দেবীর শ্বশুরালয় পূর্ব্বনপাড়া। ইঁহার পুত্র ভোলা-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩) ব্রহ্মময়ী দেবীর শ্বশুরালয় সুন্দরীবল্লভপুর।

জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশ বিবরণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গেল।

৺খেলারাম মুখোপাধ্যায়।

খেলারামের প্রথমা স্ত্রী আনন্দময়ী দেবীর পিত্রালয় যশোহর জেলার ক্ষেত্রপাড়া গ্রামে। ইঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ নিঃসন্তান। দ্বিতীয়া স্ত্রী দ্রৌপদীদেবীর পিত্রালয় ধর্ম্মদহে। দ্রৌপদীদেবীর পুত্র ৺কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং এক কন্যা। এই কন্যার স্বামী শান্তিপুরের রামকিশোর চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার ৩ পুত্র—দ্বারিকানাথ, জানকিনাথ ও হারাণচন্দ্র। ইঁহারা গোবরডাঙ্গায় বাস করেন।

৺কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

কালিপ্রসন্ন বাবুর তিন বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর পিত্রালয় বাগআঁচড়া। ইহার একমাত্র কন্যাটিকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করেন। সম্ভবতঃ অবিবাহিত কালেই সেটীর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয়া পত্নী বিমলা দেবীর পিত্রালয় হুগলি জেলার হারিতি গ্রামে। ইঁহার পুত্র স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয়া পত্নী শ্যামাসুন্দরী দেবীর পিত্রালয় শান্তিপুর। ইঁহার পুত্র ৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। কালিপ্রসন্নের ৬ কন্যা।

(১) নবীনকালী দেবীর শ্বশুরালয় শান্তিপুর।

(২) মাতাঙ্গিনীদেবীর স্বামী শান্তিপুরের ৺হরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি গোবরডাঙ্গায় বাস করেন।

(৩) সিংহবাহিনী দেবীর স্বামী ধর্ম্মদহের ৺বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়। ইনিও গোবরডাঙ্গাবাসী।

(৪) দশভুজা দেবী ও অন্য ২টি কন্যা সম্ভবতঃ অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিতা হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়—সংগৃহীত

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিনস্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

দশম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২৫ { তৃতীয় সংখ্যা

কীর্ত্তন

—o—

(দোলন সুর)

মা নামে পাষাণ গলে, দু'নয়ন ভাসে জলে,
উথলে হৃদয়ে প্রেম পাথার।
নিরাশ অন্ধকারে, মা ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে,
অন্তরে হয় আশার সঞ্চার।
বিপদে সম্পদে, জননীর অভয় পদে,
একান্তে যে জন লয় শরণ,
থাকে সে সদানন্দে, নির্ভয়ে নিরাপদে,
করে সুখ-সাগরে সন্তরণ।
মাতৃপ্রেম সহজ সাধন, সহজে করে যে জন,
সহজে যায় সে শান্তিধামে,
যোগ, যাগ, কর্ম্ম জ্ঞানে, শান্তি না হয় প্রাণে,
মা নাম ভরসা পরিণামে। (কেবল)

([illegible])

কুশদহের ইতিহাস

বণিক

বণিকগণ যখন বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, তখন তাঁহারা শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন দেখা যায়। তখনও তাঁহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই। চণ্ডীকাব্য পাঠে জানিতে পারা যায়, ভোজনকালে গণ্ডুষ করা বণিকদিগের অভ্যাস ছিল এবং ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের নিকট বণিকবালকেরা ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ভাগবত প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ গ্রহণ করিত। সুতরাং জানা যাইতেছে, সে সময় বণিকগণ বৈশ্য বা দ্বিজ শ্রেণীতে গণ্য ছিলেন। সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত হয়েন নাই।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বণিকগণের বৈশ্যত্ব প্রদর্শনে আমি যত্নবান্ কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিতে চাহি যে, প্রাচীন গ্রন্থ হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, আমি তাহাই লিখিতেছি মাত্র নিজের কোন উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতেছি না।

যে সময় মুকুন্দ রামের চণ্ডীকাব্য লিখিত হয়, তাহার পূর্ব্ব হইতে বণিকেরা বাংলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী জাতি। তখনও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাংলার বাণিজ্য চলিতেছে। বাঙালী বণিকেরা বিদেশে বাণিজ্যার্থে পোতারোহণে যাইতেছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত স্থলপথে ও জলপথে তাঁহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং বণিকেরা যে বাংলায়, অতিশয় উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা বিদেশে বাণিজ্য করিতেন, তাঁহাদের সাতখানা করিয়া জাহাজ থাকিত। সওদাগরের নিজের ব্যবহারের জাহাজখানি কারুকার্য্য শোভিত হইত। স্থলপথে যাতায়াত করিবার জন্য হস্তী, অশ্ব, রথ, দোলা থাকিত। রাজ-সমীপে যাইতে হইলে দোলা চাপিয়া যাওয়ার রীতি ছিল। রাজাও বণিকদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভাষণ করিতেন।

কুকর্ম্মরত বণিকেরা গোরু চুরী করিত। পথিককে বাড়ীতে বাসা দিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। আবশ্যক হইলে প্রাণ বিনাশও করিত। সুবর্ণ বণিকেরা চোরাই মালের ব্যবসাও করিত। তথাপি সমাজ মধ্যে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী থাকায় রাজাকেও সকল সময় উচিত কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইত না। অন্যান্য জাতি তাহাদের মুঠার মধ্যে থাকিত।

ব্রাহ্মণদিগকেও তাহারা বিশেষ গ্রাহ্য করিত না। তবে অশূদ্র প্রতিগ্রাহী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে অসৎবৃত্তি ও ভ্রষ্টাচারের জন্য হেয় জ্ঞান করিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পালরাজগণের অভ্যুদয়ের সময়ে বাংলায় বণিকগণের আগমন ঘটে। পালরাজগণের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল মধ্যে বণিকেরা ঐশ্বর্য্যশালী ও ধনগর্ব্বিত হইয়াছিল। সেন বংশের আবির্ভাবের সময় সম্ভবতঃ তাহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মহারাজ বল্লালকেও তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখিতে চাহেন নাই। না দেখিবারই কথা। বহুদিন রাজত্ব করিয়া পালরাজগণ প্রজার যে শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন, আগন্তুক সেন রাজগণের সে প্রীতিভাজন হওয়া সম্ভবপর নহে।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, তৎপিতা বিজয়সেন গৌড়জয় করিয়াছিলেন। গৌড়রাজ নিহত হইলে তাঁহার শিশুপুত্রেরা সম্ভবতঃ বেহার দেশের পার্ব্বত্যভাগে পলাইতে বাধ্য হইয়া পার্ব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মহারাজ বল্লাল রাজ সিংহাসন লাভ করিয়া এই শত্রুদিগকে জয় করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ না হইলে যুদ্ধযাত্রা সম্ভবপর হয় না। এ দিকে যুদ্ধযাত্রা না করিলেও নয়। কাজেই সুবর্ণ বণিকগণের প্রধান বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট বল্লালসেনের এককোটী নিষ্ক (১) ঋণ করিতে হয়। তিনি সে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। কিন্তু দণ্ডপুর পতিকে (পালবংশীয় শেষ ভূপতিকে) জয় করিতে না পারিলে বল্লাল বৈরীশূন্য হইতে পারেন না। সুতরাং পুনরায় যুদ্ধযাত্রা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। পুনরায় বল্লভানন্দের নিকট দেড় কোটী নিষ্ক ঋণ চাহিয়া দূত পাঠাইলেন। রাজার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া বল্লভানন্দ তীব্র ভাষায় রাজনীতির সমালোচনা করিলেন। রাজা অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অযশ ভাগী হইতেছেন,—প্রজার অনিষ্ট করিতেছেন, বল্লভানন্দ কঠোর ভাবে দূতের নিকট রাজনীতির নিন্দা করিলেন। পরে হেরিকেলীয় নামক জনপদ বন্ধক রাখিলে টাকা ধার দিতে পারেন, এরূপ ইঙ্গিত করিলেন।

রাজদূত বিক্রমপুর রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া মহারাজ বল্লালকে বল্লভানন্দের, প্রস্তাব নিবেদন করিলে রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। কিন্তু বল্লভানন্দ তখন শঙ্ককোট অর্থাৎ আধুনিক যশোহরের নিকটবর্ত্তী সাঁকো

(১) একশত আট তোলা স্বর্ণে, একটি নিষ্ক।

নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন কাজেই তাঁহাকে পাইলেন না। অন্যান্য বণিকগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সুবর্ণ বণিকগণের জাতিপাত হইল। তাঁহাদের জল অনাচরণীয় হইল।

পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ সংস্রবে বণিকগণ ক্রিয়াহীন হইয়াছিলেন।* আশ্রম ধর্ম্মের ক্রিয়ার অভাব হওয়ায় তাঁহারা বৈশ্যত্ব নাম রক্ষা করিতেছিলেন মাত্র। তবে বল্লালের সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা উপবীত ধারণ করিতেন। কিন্তু মহারাজ বল্লালের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া বণিকেরা যেরূপ অশিষ্ট আচরণ করেন, ভোজনশালা হইতে বিনাভোজনে, বিনা কারণে বহির্গমন করেন, কারণ জানিতে চাহিলেও যেরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন, তাহাতে রাজা বল্লাল অতিশয় রুষ্ট হইয়া বণিকগণকে উপবীত ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন।

নগরে নগরে রাজভৃত্যেরা ঢক্কা রবে ঘোষণা করিল যে, বণিকেরা উপবীত ত্যাগ না করিলে দণ্ডার্হ হইবে। রাজ্যবাসী যাবৎ বণিককেই এই রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে হইল। কেহ বা অযোধ্যা, কেহ মুঙ্গের, কেহ তাম্রলিপ্তি, কেহ পাটলীতে যাইয়া আত্মরক্ষা করিল। যাঁহারা পলাইতে অক্ষম তাঁহারা তাণ্ডব ও হৈম উপবীত ত্যাগ করিলেন। তদবধি গন্ধবণিক-গণ বৈশ্যত্ব হারাইলেন। বল্লালের পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে ভোজনশালা হইতে নিমন্ত্রিত বণিকগণের স্থান ত্যাগ দ্বারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ না ঘটিলে এই বিপদ ঘটিত না।

কিন্তু ইহা হইতে আরও বুঝিতে পারা যায়, বণিকগণ তখন কতদূর প্রতি-পত্তিশালী হইয়াছিলেন এবং রাজভবনেও কিরূপ সম্মানের দাবী করিতেন। এই ব্যাপারের ফলাফল যাহাই হউক, বণিকগণ যে তখন সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কেননা এ সময় কান্যকুব্জগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের সন্তানেরা মুষ্টিমেয় মাত্র। তাহাতে আবার, তাঁহারা নানা স্থানে বিস্তৃত হইলেন, কাজেই তাঁহাদের সন্তানেরা বা কায়স্থগণ তাদৃশ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। বৈশ্যনামধারী বণিকগণেরই এ সময় বঙ্গসমাজে একাধিপত্য ছিল। অপর দিক হইতে দেখা যায় যে, যত দিন বণিকগণ মনসা পূজা করিতে স্বীকার করেন নাই, ততদিন বঙ্গসমাজে

---

* বৈদিক ধর্ম্মের নিষ্প্রভ অবস্থায় মহাত্মা বুদ্ধ যে সজীব সাধনপথ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে তখন মানুষকে ক্রিয়াহীন করিয়াছিল লেখকের এই মতের সহিত আমরা সায় দিতে পারি না। (সম্পাদক)

সে পূজা প্রচলিত হয় নাই। মঙ্গল চণ্ডীর পূজাও প্রথম বণিক কুলবধূ খুল্লনা কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল।

পাল নৃপতিগণের সময়ে বণিকগণ সামাজিক উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। বঙ্গসমাজে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সময় তাঁহারা অত্যন্ত উদ্ধত ও গর্ব্বিতও হইয়াছিলেন। কেবল মাত্র বৌদ্ধ-সংসর্গে আচারহীনতা ঘটিয়াছিল এরূপ নহে, অর্থশালী হইলে যেরূপ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও দ্বেষ আসিয়া থাকে, তাহাও যথেষ্ট আসিয়াছিল। ধনপতি দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আহূত বণিকসভায় মালাচন্দন লইয়া যে বিবাদ হয়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বণিকগণ তখন পরস্পরের প্রতি কতদূর বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। পরস্পরকে খাটো করিতে কিরূপ চেষ্টা করিতেন। স্ত্রীলোকের কুৎসা রটনা করিয়া কিরূপ আমোদ পাইতেন। প্রকাশ্য সভায় ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা তাঁহাদের কত ভাল লাগিত। আত্মীয় ও বন্ধুগণ পরস্পরকে অবমানিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সম্ভবতঃ আত্মবিচ্ছেদের চরম অবস্থায় মহারাজ বল্লাল সেনের সহিত বণিক-গণের বিরোধ ঘটিয়াছিল এবং নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গদেশে বণিকগণের প্রতি সেনরাজ বল্লাল যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে ইহুদীজাতির প্রতি রাজা জন ও তাঁহার সামন্তগণ ততোধিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যেমন নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়া ইহুদীগণ ব্যবসায়ে লাভবান হইবার আশায় সে দেশ ছাড়িতে পারে নাই, বাংলায় কিন্তু তাহা হয় নাই। বণিকগণ দলে দলে বাংলা ছাড়িয়া অযোধ্যা মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। যাঁহারা পলাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে রাজা বল্লাল উৎপীড়িত করিতে পারেন নাই সুতরাং তাঁহাদের উপবীত ত্যাগ করিতে হয় নাই। যাঁহারা সহসা ব্যবসায় ছাড়িয়া, লাভের আশা ছাড়িয়া স্থানত্যাগ করিতে পারেন নাই, রাজার অত্যাচার তাঁহাদিগকেই সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহারাই সামাজিক সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে সে সম্মান আর তাঁহারা পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই।

গন্ধ বণিকজাতির চারিটি আশ্রম যথা—দেশ, শঙ্খ, আউধ ও ছত্রিশ। প্রবাদমতে ছত্রিশ আশ্রমের আদিপুরুষ—পদ্মোৎপল। পদ্মোৎপলের ছত্রিশটি পুত্রের নামানুসারে ছত্রিশ আশ্রম হইয়াছে। ছত্রিশ আশ্রমের নাম—

অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, গোকর্ণ, কালোসোনা, প্রয়াগ, দ্বারকা, দ্বারবাসিনী, কর্ণাট, আটগ্রাম, বটগ্রাম, কুলান, সপ্তগ্রাম, মণ্ডলহাট, বর্দ্ধমান প্রভৃতি। এই ছত্রিশ আশ্রমের উপাধি—দত্ত, লাহা, নাগ, পাল, দাঁ, দে, দাস, চন্দ্র, বিদ, কর, ধর, বৃন্দ, সেন, সিদ, কুণ্ডু, ভদ্র, বাদল, হরি, হেম, আইচ্, তুরঙ্গম, সোম, নন্দী, নন্দন, সিংহ, ভুঁই, তাল, ধন, সাঁই, বজ্র, রাজ, জুই, ব্যোম, দিন, বিষ্ণু।

বণিকগণের গোত্র অনেক। তন্মধ্যে অগস্ত্য, অত্রি, উর্ব্ব, কাশ্যপ, কৌশিক, কৌণ্ডিল্য, ক্রতু, গর্গ, গৌতম, চ্যবন, দুর্ব্বাসা, নৃসিংহ, পরাশর, পুলহ, ব্যাস, বশিষ্ট, বিভাণ্ডক, ব্রহ্মদূত, মৌদ্গল্য ভার্গব মাণ্ডব, সৌভরী, সাবর্ণ, শুকদেব, শাণ্ডিল্য, প্রভৃতি।

পূর্ব্বোক্ত ছত্রিশ আশ্রম হইতে ক্রমে ৭২টি চাকলা হইয়াছিল। অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত বণিকগণ ৭২টি স্থানে যাইয়া বসতি করিতে থাকেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে এই আশ্রম স্থানগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ দেখা যায়। যথা—বর্দ্ধমান, সপ্তগ্রাম, দশঘরা, সাঁকো, কর্জ্জুলা, খণ্ডঘোষ ইত্যাদি।

আধুনিক বঙ্গের বণিক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার হইবে; তন্মধ্যে এক মাত্র কলিকাতা সহরে গন্ধবণিক সংখ্যা প্রায় আট হাজার হইবে। সহরবাসী গন্ধবণিক শিক্ষিত ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। পল্লীগ্রামের লোকের তাদৃশী উন্নতি হয় নাই।

সহরবাসী বণিকগণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পুনরায় বৈশ্যত্ব লাভের স্পৃহা জাগরুক হইতেছে। জাতীয় উন্নতির দিনে এ আকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত মনে করা অন্যায়। তবে বাংলার পল্লীগ্রামে যতদিন শিক্ষা বিস্তার না হইতেছে, ততদিন সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের সহানুভূতি লাভ সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বি, এ)

প্রায়শ্চিত্ত

সপ্তম

বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর আরতি দেখিতে এক ললিতা ছাড়া সকলেই গিয়াছে। ললিতার দাসী থাকমণি ললিতার জন্য যাইতে পারে নাই। ললিতার শরীর টা ভাল ছিল না, সকাল হইতে মাথা ধরিয়া বড় কষ্ট পাইতেছে, সে জন্য সে আর বাহির হয় নাই।

থাকমণি মেজেতে বসিয়া মালসার গণগণে আগুণে হাত পা গরম করিতে করিতে বলিতেছিল, বাবা, পোড়া দেশে কি শীত গো, ঠক্ ঠক্ কোরে গা হাত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ললিতা কহিল, তবু তো দিন রাত্তির আগুণ কোলে কোরে বোসে আছিস, ধর্ম্মশালার বুড়ী মহারাজীন্ আর দাইকে দেখেছিস্, এই শীতে কোন্ ভোরে উঠে জল ঘাঁটতে আরম্ভ করে,আর এ দিকে সেই রাত বারোটা পর্য্যন্ত খাটে।

থাকমণি কহিল, ওদের কথা ছেড়ে দে ললতে, ওদের ভুট্টা খেকো খোট্টার জান্, ওরা সব সইতে পারে। ললিতা হাসিয়া কহিল, তা বটে, তোদের দেশে এম্‌নি শীত হোতো তো তোরাও সইতিস, তা তুই আগুনের কাছ থেকে একটু সরে বোস, নয় তো এখনি তোর ঢুলুনী আসবে, আর ঘুমের ঘোরে আগুণে মুখ গুঁজে পড়বি।

থাকমণির সন্ধ্যার পর, ঘুমে ঢোলা, নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস থাকিলেও, সে এ অপবাদটা মোটেই সহিতে পারিত না, সুতরাং ললিতার কথায় সে বেশ জোরের সহিতই কহিল, এ বিদেশ বিভুঁয়ে তোকে একলাটি রেখে আমি কি ঘুমুতে পারি ? তবে সারা দিন এদিক ওদিক কোরে গা মাটি মাটি করছে, আমি খানিক মাটীতে শুয়ে একটু গা গড়া দিই, তুই পয়ার পড়, আমি শুনি। থাকো অবিলম্বে শুইয়া পড়িল। ললিতা একখানি বই হাতে করিয়া সম্ভবতঃ মনে মনে পড়িতেছিল, থাকমণি পয়ার শুনিতে বড় ভালবাসে, সুতরাং সে তাহাকে শুনাইয়া পড়িতে লাগিল,

"স্মৃতির সাগর দুলিয়া ফুলিয়া কাপিয়া উঠিছে ঐ,
কেন কেন কেন, হেন শিহরণ, কারণ ইহার কই ?
হায় নিষ্ফল প্রয়াস,
ঠেলি' সব বাধা, রুদ্ধ দুয়ার খুলিল মত্ত বাতাস,

শুভ্র জ্যোছনা পশি' সেথায়,
গোপন যা কিছু প্রকাশিতে চায়,
ওগো, যাহা আমি ভুলেছিনু, তাহা জাগিল মানসে গো,
এক যুগ ধরি', সাধনা আমার সকলি বিফল গো।
সেই সেই মুখ, ঊষার তরুণ অরুণ কিরণে গড়া,
সেই সে নয়ন, শান্ত কোমল, ভাবের মাধুরী ভরা,
সেই সে ওষ্ঠাধর—
একি মোহ আজি ঘেরেছে আমায়—কেন কাঁপে অন্তর,
ভেবেছিনু মনে, ভুলেছিনু তায়,
একি দেখি আজি, সবি বৃথা হায়,
গোপন মর্ম্মে-মরম দেবতা নিভৃতে আছে বসি',
হিয়ার পরতে পরতে তাহার স্মৃতিটি রয়েছে পশি'।
আমি দিয়াছিনু বিদায় তাহারে—সে তো কই যায় নাই,
মম অন্তর ছলেছে আমারে, একি জ্বালা—কি বালাই।
বিশ্বাসঘাতী প্রাণ,
মোর অজ্ঞাতে, তাহারি চরণে করেছে আপনা দান.
বাহিরে আমার ভোলার প্রয়াস,
গোপনে হৃদয়ে পূজার আয়াস,
বরষ বরষ ছলেছে এমনি, হা অভিমানিনী নারী,
দর্প তোমার লুটাল ধূলায়, আজিও তুমি আছ তারি।"

থাকো, ও থাকো, শুনছিস্? আর থাকো, সে তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, প্রমাণ নাসিকা ধ্বনি! ললিতা তখন কবিতার অর্থে মনোনিবেশ করিল। কবিতার প্রতি ছত্রে, যে তাহারি মনের অন্তর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শৈশবে ললিতা মাতৃহীন হয়, পিতা একমাত্র কন্যাকে সযত্নে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। আর মাতৃস্নেহের কতকটা অভাব পূরণ করিয়াছেন, তাঁহার স্নেহময়ী জ্যাঠাইমা। তিনি অল্পবয়সে বিধবা হইয়া দুটি শিশু কন্যাকে লইয়া দেবরের সংসারেই আসিয়া বাস করিতেছেন। বড় মেয়ে শুচিতার সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে,অমিতা ললিতারই প্রায় সমবয়স্কা। বাটীতে শিক্ষক রাখিয়া মহেশবাবু তিনটি কন্যাকেই সুশিক্ষিতা করিয়াছেন।

সাহেব মেমদের সহিত তাঁহার মেলামেশাটা কিছু বেশী রকম, সেজন্য

মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষায় বেশ দোরস্ত করিয়াছেন। মেয়েদের চালচলনও খাঁটী হিন্দুয়ানী-সঙ্গত নয়, এবং জ্যাঠাইমার চক্ষে এই ম্লেচ্ছপনা নিতান্ত বিসদৃশ হইলেও, উপায়ান্তর নাই, ক্রমে তাঁহারও এটা সহিয়া গিয়াছে।

ললিতা ও শুচিতা বেশ শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু অমিতার প্রকৃতি একেবারে বিপরীত, সে অত্যন্ত চঞ্চল—তবে সরল ও অমায়িক। তাহাতে কৃত্রিমতার আবরণ ছিল না, সে যাহারই সহিত মিশিত, অতি সহজে তাহাকে আপনার করিতে পারিত। অপরিচিত বা নূতনত্বের সঙ্কোচ তাহাকে পিছু হঠাইতে পারিত না. কিন্তু এই প্রগলভা বালিকার ধৃষ্টতায় শুচিতা ও ললিতা সময়ে সময়ে বড় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত।

আজ সকালে কোথা হইতে, একখানা কবিতার বই আনিয়া. ছাদে বসিয়া অমিতা সুর করিয়া পড়িতেছিল। ললিতা যখন চা খাইবার জন্য নীচে যাইতেছিল, অমিতা ডাকিয়া কহিল. ছোট দি, মিষ্টার সরকার আজ একখানা কবিতার বই এনেছেন. কি সুন্দর এই কবিতাটা। আচ্ছা ভাই, কবিরা কি মানুষের মনের ফটো তুলে বেড়ায়? এই কবিতাটা দেখো না, তোমারি মনের হুবহু ফটোগ্রাফ।

ললিতা অমিতার কথাটায় মনঃসংযোগ না করিয়া নীচে নামিয়া গেল, কিন্তু যে ললিতা. কবিতার খুব বেশী পক্ষপাতী, এবং নিপুণ ভাবগ্রাহী ও সমালোচক, তাহার হঠাৎ এতটা ঔদাসীন্য ভাব. অমিতাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল, যে তাহার ধারণা অমূলক নয়।

সন্ধ্যার সময় যখন সকলে বিন্ধ্যবাসিনীর আরতি দেখিতে গেল, ললিতা গেল না। মানুষের এমন বয়স এমন দিন এক সময় সকলেরই আসে, যখন পরিণত জীবনে, যে গুলি অতি তুচ্ছ কথা, অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, অতি সামান্য কারণ বলিয়া মনে হয়,সেই গুলিরই উপরে ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য এমন কি, গতি পর্য্যন্ত নির্ভর করে। কাল রতিকান্তর সহিত আকস্মিক সাক্ষাতের পর ললিতার মনের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তাহার মনের মধ্যে যে প্রবল আন্দোলন, তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা আর কেহ না লক্ষ্য করিলেও, ললিতার চিরসঙ্গিনী অমিতার অগোচর ছিল না।

মনের এই চঞ্চল অবস্থাতেও. ললিতা সহজেই অমিতার বইখানির কবিতাটিতে নিজের মনের ফোটোগ্রাফ দেখিতে প্রলুব্ধ হইল. এবং এই নির্জ্জন সন্ধ্যায় সহজেই সেই বইখানি বাহির করিয়া, কবিতাটি পাঠে সত্যই তাহার মনে হইল, অমিতার কথা মোটেই মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়।

অষ্টম

সে কিছু বেশী দিনের কথা নয়, দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন মহেশবাবু রতিকান্তদের গ্রামে ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন, রতিকান্ত তখন বি-এ পড়িতেছিল। সে তখন,বলিষ্ঠকায় সুদর্শন যুবা। পিতার অবস্থা খুবই স্বচ্ছল, বনিয়াদী বংশ, শ্রীকান্তবাবুর সহিত পরিচয়—সূত্রে রতিকান্তও অচিরে মহেশবাবুর পরিচিত ও প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিল। মহেশবাবুর বাটীর দ্বার তাহার নিকট অবারিত হইল। মহেশবাবু রতিকান্তকে জামাতৃপদে বরণ করিতে উৎসুক হইয়া শ্রীকান্ত বাবুকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার অসম্মতির কোনও কারণ ছিল না। ক্রমে ক্রমে সকলেই এ শুসংবাদ জ্ঞাত হইল। ললিতা সুন্দরী, ধনী পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা, সুতরাং এ উপযুক্ত নির্ব্বাচন সকলেরই মনোনীত হইল। রতিকান্ত বি-এ পাস দিয়া এম-এ পড়িতে লাগিল। মহেশবাবু শ্রীকান্তবাবুকে কহিলেন, আমার ইচ্ছা রতি বিলাত গিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে আসুক, তার কিন্তু সে রকম আগ্রহ নেই। সে যে রকম বুদ্ধিমান তাতে আমার মনে হয়,ইচ্ছা ও চেষ্টা কোরলে ভবিষ্যতে সে একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী হোতে পারবে।

শ্রীকান্তবাবু কহিলেন, আমার তো আপত্তি নেই,কিন্তু রতির গর্ভধারিণীর মত নয় যে, রতি বিলাত যায়। তিনি বলেন,আমাদের যা আছে,তাই যথেষ্ট। রতি বরং সেই সব দেখা শোনা করুক।

মহেশবাবু ভাবী বৈবাহিকার এই কথায় মোটেই প্রীত হইতে পারেন নাই, তবে এখন বাদানুবাদ নিষ্ফল। রতিকান্ত এখন শ্রীকান্তবাবুর পুত্র, সে যখন তাঁহার জামাতা হইবে, তখন যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিবেন এ আশা তাঁহার অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই।

যে বৎসর রতিকান্ত এম-এ পরীক্ষা দিল পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে ইণ্টার্ণড্ হইল। মহেশবাবু স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না যে, এই উদ্ভ্রান্ত যুবার হস্ত হইতে তাঁহার প্রাণাধিকা দুহিতা বড় রক্ষা পাইয়াছে, ভাগ্যে বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার আসল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল। এত হীন এত কৃতঘ্ন,এই সুন্দর মেধাবী কৃতবিদ্য যুবা। রতিকান্তর যে কতখানি দোষ সত্য, সেটার খোঁজে হায়রাণ হইবার মতো বাজে সময় তাঁহার ছিল না, কয়েকবার মেয়েদের নিকট রতি-কান্তর ধৃষ্টতা ও অন্যায়াচরণের তীব্র সমালোচনা করিলেন। শুচিতা ও ললিতার

কাছে অবাধে নিজের মতামত প্রকাশ করা চলে, কিন্তু ঐ যে দুষ্ট মেয়ে অমিতা, উহাকে ঠেকাইয়া রাখা বড় কঠিন। লেখাপড়া শিখাইয়া অবশেষে এই মুখরা মেয়েটিকে লইয়াই দায়ে ঠেকিতে না হয়। সে কিন্তু খুড়ার মুখের উপরে স্বচ্ছন্দে বলিয়া বসিল, একটা জিনিষ দেখতে হোলে যেমন শুধু একটা দিক দেখে তার ভালমন্দর বিষয়ে নিষ্পত্তি বিচার হয় না, তখন একটা জীবন্ত মানুষের শুধু একটা ক্রুটি, বা দোষ ধরেই কি তার সমস্ত জীবনের ভাল মন্দ নির্দ্ধারণ করা উচিৎ ? তারও তো জবাবদিহি কিছু আছে, আপনি তাকে যতটা গুরু অপরাধে অপরাধী ভাব্‌ছেন, অতোটা হয়তো সে নয়, অন্ততঃ আমাদের তো সেই রকমই মনে হয় কাকামণি।

মহেশবাবু যত শীঘ্র পারেন, এই উশৃঙ্খল যুবার কথা মেয়েদের মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন, যেহেতু, এই যে নারীজাতি, এদের তো কোনও দায়ীত্ব-বোধ বা দূর-দৃষ্টি নাই, হাতের কাছে যাহাকে পাইবে, তাহাকেই আপনার করিয়া বসিবে, ভদ্রতার সূত্রে এক জনকে তাহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দাও—তাহারা অমনি তাহাকে আদর যত্নে, মিষ্টকথায় শিষ্টব্যবহারে—এমন কি, খাদ্য পানীয়ে পরিতুষ্ট করিয়া দু'দিনেই তাহাকে পরমআত্মীয়ে পরিণত করিয়া লইবে। তাহার একটু আপদ বিপদে, অমনি হা-হতাশ করিতে থাকিবে, এই রতিকান্তকে দিয়াই তো বুঝা যাইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার সহিত কিছুমাত্রই তো জানা শোনা ছিল না। সে ইন্টার্ণড্ হইয়াছে, অবশ্য দুঃখের কথা, তা বলিয়া, বাড়ীর গৃহিনী হইতে, এই অবোধ মেয়েগুলা পর্য্যন্ত তাহার জন্য এত আক্ষেপ করে কেন ? এখনো তারা রতিকান্তের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারায় নাই ? মহেশবাবু পরুষ কণ্ঠে অমিতাকে কহিলেন, তুই ভারী পাকা হয়েছিস্, কথায় তোর সঙ্গে কেউ পারবে না, ব্যারিষ্টার হবি দেখছি।

অমিতা রাগভরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঐ দুষ্ট অশান্ত মেয়েটিকে না হইলে মহেশবাবুর এক দণ্ড চলে না। মহেশ বাবুর খুঁটী-নাটী কাজ ও তাঁহার সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় সকল জিনিষের ভার ঐ অমিতারই উপর। ললিতা, শুচিতা যেখানেই থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু অমিতাকে একদিন কাছ ছাড়া করিলে মহেশবাবুর অসুবিধার অন্ত থাকে না। অথচ মেয়েটা এমনি মুখরা হইয়াছে যে, এক দিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চা পার্টিতে মহেশবাবুর সহিত নিমন্ত্রণে গিয়া, যখন মোকদ্দমা প্রসঙ্গ উঠিল, তখন

সে স্বচ্ছন্দে বলিয়া ফেলিল,ডাক্তার হাজার সার্টিফিকেটই দিক যে,কুলীটা পিলে ফেটেই মরেছে, তাহোলেও মোকদ্দমার আর একটু তদন্ত হওয়া উচিত ছিল। সে যদি নিতান্ত দীন হীন কুলি না হোয়ে, গণ্যমান্য কেউ হোতো, তা হোলে আপনারাও একটু ভাল কোরে তদ্বির কোরতেন, আর ডাক্তারও "পিলে ফাটা" না বোলে হয়তো আরও কিছু বোলতো।

মহেশবাবু অমিতার এ প্রগল্‌ভতা ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলেন, মেয়েটা আস্ত পাগল, কি যে বলে, তা নিজেই বোঝে না। রাজার ন্যায়বিচার যে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য রাখে না, সেখানে যে শুধু সত্য আর ন্যায়ের মর্য্যাদা, তা ভুলে যাস্ কেন?

মেয়েটা তবু বলিয়া বসিল, স্বর্গের রাজা সম্বন্ধে এ কথাটা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, কিন্তু পৃথিবীর রাজার সম্বন্ধেও বিশ্বাস রাখতে পারি না, কাকামণি। ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙালী হইলে কি প্রমাদ ঘটিত জানি না, কিন্তু ইংরাজ সিভিলিয়ান একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ভক্ত, তিনি বালিকার কথায় প্রীত হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন;

"Oh my God, Your true Judgment in
heaven and earth,
We bow Thee with bending heart,'
How splendid is the faith of this young girl !"

বালিকার ধৃষ্টতা শেষে বিশ্বাসের গৌরব লাভ করিল দেখিয়া মহেশবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন। নতুবা সে দিন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল আর কি।

নবম

মহেশবাবু অন্যত্র বদলী হইয়া গেলেন। ক্রমে রতিকান্তর সম্বন্ধে বড় আর উচ্চবাচ্য কেহ করিত না। শুচিতার জন্য শীঘ্রই একটি ভাল পাত্র জুটিয়া গেল। অমলচন্দ্র ওকালতী পাস করিল বটে, কিন্তু সে শীঘ্রই বুঝিতে পারিল এ কাজ তাহার মতো লোকের পোষাইবে না। কথার ব্যবসা তাহার চলিবে না, তাই সে সুপারিশের জোরে মুন্সেফীতে বাহাল হইয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতে লাগিল।

মহেশবাবু অমলচন্দ্রের সহিত শুচিতার বিবাহ দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। এইবার ললিতার পালা, মেয়ের বিবাহ দিলেই পর

হইয়া যাইবে। একমাত্র আদরিণী দুহিতাকে কাছ ছাড়া করিতে একান্ত ইচ্ছা না থাকিলেও উপায় নাই। তবে দুদিন আগু পাছু চলে বটে, কিন্তু বৌ ঠাকরুণের তাড়ায় আর বিলম্ব করা চলে না।

বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ীর তাগাদায় অমলও নিজের অবিবাহিত বন্ধুদের মধ্যে শ্যালিকার জন্য ঘটকালী করিতে নিযুক্ত হইল, এবং তাহার সে চেষ্টাও সফল হইল। সদ্য বিলাত প্রত্যাগত নবীন ব্যারিষ্টার নরেন্দু পিতামাতার নির্ব্বাচিত নোলক-পরা একটি ছোট্ট বৌ মোটেই বিবাহ করিতে রাজী নয়। ললিতাকে দেখিয়া তাহার খুব পছন্দ হইল।

মহেশবাবুও নরেন্দুকে স্নেহের চোখে দেখিলেন, মেয়েদের সহিত নরেন্দুকে পরিচিত করিয়া দিলেন, পিতার ইঙ্গিত বুঝিয়া ললিতা মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল।

সম্প্রতি দুই মাসের ছুটি লইয়া মহেশবাবু এলাহাবাদে বেড়াইতে আসিলেন,নরেন্দুকেও সঙ্গে লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা বিবাহটা শীঘ্র শীঘ্র চুকিয়া যায়। শুভস্য শীঘ্রং, রতিকান্তের স্মৃতি যাহাতে ললিতার মন হইতে চিরতরে মুছিয়া যায়, সেইটাই তাঁহার কামনা, যেহেতু মেয়েদের বিশ্বাস নাই। ক্ষুদ্র ব্যাপার—তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া ইহারা অনর্থ বাধাইতে বেশ মজবুৎ।

নরেন্দু প্রথমে খুব উৎসাহের সহিত এ পরিবারে যোগ দিলেও সে যেন শীঘ্রই দমিয়া গেল। ললিতার মতো লাজুক মেয়ের সহিত ভাবের আদান প্রদান যে কত কঠিন সে সহজেই বুঝিতে পারিল। অথচ এই বয়ঃপ্রাপ্তা তরুণীর মনোভাব না বুঝিয়া সে কেমন করিয়াই বা তাহাকে বিবাহ করে। শুচিতা ও অমিতা আছে বলিয়াই নরেন্দু টিঁকিয়া আছে, নচেৎ ললিতা তো তাহার সহিত কথাই কহে না। রতিকান্তর কথা সে আদৌ শোনে নাই, তাহা শুনিলে সে বেশ বুঝিতে পারিত।

একদিন সে ললিতার অনুপস্থিতিতে ঠাট্টা করিয়া অমিতাকে বলিয়াছিল, তোমার বোনটির মনের খোঁজই যে পাওয়া যায় না, যেন কোন্ অন্ধকার অতল সমুদ্রের গর্ভে সে মন ডুবে আছে!

অমিতা উত্তর দিয়াছিল—আপনি যদি নিপুণ ডুবুরী হোতেন্, তা হোলে সেই অন্ধকার সমুদ্র-গর্ভ থেকেই সে মনটিকে হাঁতড়ে বের করতেন।

নরেন্দু হাসিয়া বলিয়াছিল "তোমার বোনের মনটি ঠিক্ জায়গায় আছে, কি চুরি টুরি গেছে, সেটা ভাল রকম জানো কি?

উত্তরে অমিতা এমন চোখ রাঙাইয়াছিল, যে, নরেন্দু বেচারা ভয়ে অন্য আর কোনও দিন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। শুচিতা বরং হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি যদি গোয়েন্দাগিরিতে বাহাদুরী দেখাতে পার তা হোলে কত বড় বকসীস পাবে তাতো বুঝতেই পারছ।

ললিতা চিরদিনই স্বল্পভাষিণী, রতিকান্তর সহিতও তাহার কোনদিন বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু উভয়ে যে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত তাহা উভয়ের নিকট অবিদিত ছিল না। ললিতা রতিকান্তর প্রকৃতিতে এমন একটি বিশুদ্ধ গর্ব্ব ও তেজের আভাস পাইয়াছিল, এমন একটি স্বাধীন উদার প্রকৃতির পরিচয় লাভ করিয়াছিল, যাহাতে তাহার প্রতিভানুরাগী নারী-হৃদয় সহজেই সেই মহত্ত্বের চরণে আত্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

রতিকান্ত কারারুদ্ধ হইবার পর, যখন তাহার লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার কথা মুখে মুখে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইতে চলিল, পিতা যখন সেই সর্ব্বনেশে ছেলেটার সংস্রব হইতে সহজেই নিষ্কৃতি পাইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, ললিতার তখন অন্তর কাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহার মনে হইতেছিল, সেই লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার অংশভাগিণী হইতে পারিলেই বুঝি তাহার ভাল ছিল।

যখন নরেন্দুকে, মহেশবাবু স্বীয় পরিবারের মধ্যে পরিচিত করিয়া দিলেন, এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন,ভবিষ্যতে সে কোন্ স্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ললিতা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও সঙ্কুচিত হইলেও লজ্জার মাথা খাইয়া পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল না। যে পিতা, কত খানি স্নেহে, যত্নে তাহাকে লালনপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহার মঙ্গল চেষ্টায় প্রাণপাত করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার ইচ্ছা সে করিতে পারে না, সে শক্তিও তাহার নাই। পিতাকে সুখী করিবার জন্য এটুকু ত্যাগস্বীকার সে করিতে পারিবে না?

দিনের পর দিন, রতিকান্তের স্মৃতি তাহার কিশোর হৃদয়ে মলিন হইয়া যাইতে লাগিল, ক্রমে অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিল, কিন্তু তথাপি ভাবী পতির প্রতি যথোচিত অনুরক্তি হইল না কেন?

দুইটি সম শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত তরুণ হৃদয় পরস্পরের সম্মুখীন হইলে, সহজেই প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চায়, ললিতা ও নরেন্দুর মধ্যে তাহা হইল না। নিকটে থাকিয়াও দূরত্বের ও অপরিচিতের ব্যবধান ও সঙ্কোচ রহিয়া গেল। নরেন্দু ক্ষুণ্ণ হইলেও হতাশ হইল না। সে মনে করিতে চেষ্টা পাইত, ললিতার

অত্যধিক লজ্জাই এ সঙ্কোচের কারণ, কিন্তু এ লজ্জাও যেন নূতন রকমের। প্রিয়জনের নিকটে রমণীর লজ্জা—তাহার মুখে,কপোলে যে এক সুন্দর নীলিমা দান করে, চোখে এক অপূর্ব্ব ভাবের ছায়া ঘনাইয়া তোলে, সে লজ্জার পরিচয় তো ললিতার ভাবভঙ্গীতে পাওয়া যায় না। তবে এ কি? নরেন্দু যেন আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, তবে কি ললিতার তাহাকে পছন্দ হয় নাই? এদিকে ললিতা ভাবিতেছিল, নরেন্দুকে এখন ভাল বাসিতে না পারিলেও, বিবাহের পর স্ত্রীর কর্ত্তব্যোচিত ভালবাসা সে তাহার স্বামীকে দিতে পারিবে, প্রথম দর্শনে নভেলিয়ানা রকমের আত্মদান নাই বা হইল, কিন্তু রতিকান্তর সহিত কি এই রকম নভেলিয়ানাই ঘটে নাই?

রতিকান্তর কারামুক্তির সংবাদ যথা সময়ে সেও শুনিয়াছিল। লাঞ্ছিত যুবকের জন্য ঈশ্বর-চরণে মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বেকার রতিকান্ত-জড়িত স্মৃতি বার বার মনের মধ্যে মাথা নাড়িয়া জাগিবার প্রয়াস পাইলেও, ললিতা সে দিন বার বার এ কথাও মনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, পিতার মনোনীত নরেন্দুই তাহার ভাবী স্বামী,আর কেহ নয়। রতিকান্তর সহিত তাহার দেনা পাওনা হিসাব সব চুকিয়া গিয়াছে।

হা, অবোধ মানবসন্তান, অন্যের কাছে প্রতারিত হইবার ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া ফিরিতেছ,অথচ নিজের নিকট নিজেকে কতখানি বাঁচাইতে পারো?

তারপর সহসা, বিন্ধ্যাচলে জ্যাঠাইমার সহিত তীর্থ দর্শনে আসিয়া শান্ত অরুণোজ্জ্বল প্রভাতে, তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন বনপথে একি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। মনোরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত, পরিত্যক্ত, বিস্মৃত রতিকান্ত, অকস্মাৎ কোথা হইতে এতদিনের পর ফিরিয়া আসিয়া অকম্পিত চরণে অগ্রসর হইয়া আপনার ত্যক্ত অধিকার প্রার্থনা করিবার জন্য মহিমাময় ভঙ্গীতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ওগো স্বর্গের দেবতা, একি তোমারই বিচিত্র লীলার পরিচয়, না, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল নারীর সহিত ছলনা বা নিষ্ঠুর পরিহাস? কে বলিয়া দিবে গো, আজ অভাগিণী নারীর কর্ত্তব্য কি?

ক্রমশ

শ্রীসরসীবালা বসু।

—০—

বর্ষা-নিশীথে

এ কি মেঘমালাময়ী, ঘোরা রাত্রি !
এ-কি ছন্দোময়ী সঙ্গীত সুধাময়ী রাত্রি !
এ-কি বিচিত্র পুলকাঙ্কিত
চরাচর পরি বাঞ্ছিত
রাগ রূপ রস গন্ধ দাত্রী,
ও গো, শ্যাম শোভাময়ী রাত্রি।
ত্যজি নিশীথ সুখ শয়নে
জাগি প্রেম আকুল নয়নে
কে প্রেম মন্দার চয়নে——
নন্দন বনযাত্রী,
ও গো, গীত মধুময়ী রাত্রি।
নীল নব জলধর দল
সুমণ্ডিত অম্বর তল
বিজলী হার ঝল মল
ও গো, রূপ ময়ী রাত্রি,
ও গো লীলাময়ী রাত্রি।
বহি, শীকর সম্পৃক্ত পবন মৃদুমন্দ
কহে প্রিয় বারতা মধুময় ছন্দ
মাখি, প্রিয় নিশ্বাস মধুময় গন্ধ
প্রিয় পরশ পুলকিত গাত্রী,
ও গো, প্রেম রঙ্গময়ী রাত্রি।
হেরি, কিবা নীল রূপ ব্যাপি ভূলোকে
আঁখি তিরপিত দ্যুতি দ্যুলোকে
প্রিয় নব অনুরাগ পুলকে
প্রেম কণ্টকিত গাত্রী ;
ওগো প্রিয় নীল রূপময়ী রাত্রি,
ওগো মোহিনী, সুখ দাত্রী"।

শ্রীপ্রীতিবালা সরকার

একটি ধর্ম্মবন্ধুর কথা

বাংলা ১২৯৩ সালে শ্রদ্ধেয় বন্ধু (অন্ধ) চুনীলাল মিত্রের দ্বারায় বন্ধুবর হরমোহন মিত্রের সহিত কলিকাতায় আমার পরিচয় হয়। তিনি তখন নয়ানচাঁদ দত্তের গলিতে সপরিবারে বাস করিতেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তাঁহার বয়স ২৬।২৭ বৎসর হইবে। সম্ভবতঃ তিনি আমার সম বয়সী ছিলেন। এখন তিনি পরলোকে। বোধ হয় ১২।১৩ বৎসর হইল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

হরমোহন বাবু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয়। অল্প বয়সেই তিনি ধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন। মহাত্মা পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর কোন্ সময় পতিত হয় তাহা আমি জানি না, কিন্তু যখন আমার সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় তখন হইতে আমি ইঁহাকে তাঁহার একজন ভক্ত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা বক্তৃতা এবং সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদির প্রতিও তাঁহার আন্তরিক টান পূর্ব্বাপর ছিল।

এমন মিষ্ট স্বভাব সহাস্য-বদন যুবক আমি অল্পই দেখিয়াছি। এখনও তাঁহার সেই মধুর প্রকৃতি এবং প্রসন্ন মুখ আমার চিত্তে বেশ জাগিতেছে। তাঁহার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি সরল ও সেবা-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার সেবার ভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। সেই জন্য তাহার মধ্যে কিছু মাত্র আড়ম্বর ছিল না। সামান্য বস্তু দ্বারাও তিনি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।

আমি যখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয়ভূষণকে বোর্ডিংএ রাখি তখন সে ১০ বৎসরের বালক মাত্র। বোর্ডিং বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীতে হরমোহন বাবু থাকিতেন। তিনি একদিন বিনয়কে কিছু খাবার (বড় লেডিকেনি) কিনিয়া দেন, সে দেওয়াটা এমন ভাবের যে এখনও তাহা আমার মনে জাগিতেছে—কি স্বভাবসিদ্ধ তাঁহার সেবার ভাব ছিল! শেষ অবস্থায় ঐ থানে আর একটা বাড়ীতে যখন তিনি বিপত্নীক অবস্থায় কেবল সন্তান সন্ততি গুলি লইয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার বাসা বাড়ীটি একটি সাধারণ বিশ্রামাগারের ন্যায় বোধ হইত। বন্ধুবান্ধব যে যখন আসিতেছেন, থাকিতেছেন, যেন তাঁহাদের নিজেরই বাড়ী। পরমহংস মহাশয়ের একটি শিষ্য

(লাটু মহারাজ) প্রায় ঐ খানেই থাকিতেন। হরমোহন বাবু কিছু কিছু নারিকেল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, তাহা দ্বারাই অনেক সময় অতিথি সৎকার করিতেন। আমাকে মধ্যে মধ্যে এক একটি নারিকেল দিতেন।

প্রথম জীবনে তিনি জীবিকার জন্য কোন চাকুরী করিতেন কিনা তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি তাঁহাকে যেপর্য্যন্ত দেখিয়াছি তখন তাঁহাকে স্বাধীন বৃত্তির পরিচালনাতে রত থাকিতেই দেখিয়াছি। তিনি স্বীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসকে ধরিয়া তাহাই প্রচারের উদ্দেশ্যে পরমহংসের উক্তি ও উপদেশ এবং ভক্ত বিশ্বাসীগণের পুস্তকাদি সঙ্কলন ও প্রকাশিত করিয়া বিক্রয় করিতেন। তাহাতে যাহা কিছু আয় হইত তদ্দ্বারাই তিনি পরিবার পালন এবং ভক্ত সেবা করিতেন। ফলতঃ তাঁহার আর্থিক অবস্থা-তত্ত্ব বড় কেহ বুঝিতে পারিতেন না। কখনও দারিদ্রতার তাপে তাঁহাকে মুহ্যমান হইতে দেখি নাই।

যাঁহারা সংসারত্যাগী ফকির—সন্ন্যাসী বা ধর্ম্মসমাজান্তর্গত প্রচারক, তাঁহাদের ভিক্ষাবৃত্তি এবং দানভাণ্ডারের সাহায্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাঁহারা গৃহস্থ-সাধক—তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য যাঁহারা দৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাসী—এমন ব্যক্তিদিগের মধ্যেও ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুকূলে জীবিকানির্ব্বাহ—এবং তাহাতেই সন্তোষ শান্তি লাভ করিতে কয়জনকেই বা দেখা যায়; মনে হয় মানুষ, মণ্ডলীগতধর্ম্মে ও তাহার সাধনে যোগ দিয়াও সামাজিক লৌকিকতা—মান সম্ভ্রম—প্রয়োজনাতিরিক্ত পান ভোজনাসক্তিরূপ ব্যাধি মুক্ত হইতে না পারিয়াই প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন না। তাহার ফলে শারিরীক স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে না। এই জন্যই কথিত হইয়াছে, "সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"। ফলতঃ সমাজ মুখীন ধর্ম্ম, অর্থসমস্যা ও স্বাধীনতা রক্ষা, একত্রে সাধন মানুষের পক্ষে আজও অসাধ্য সাধনের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

আমার সহিত হরমোহন বাবুর আলাপের বোধ হয় ৭।৮ বৎসর পরে তিনি বিপত্নীক হন। তখন তাঁহার বয়স ৩৫সের অধিক হয় নাই। তারপর আর তিনি বিবাহ করেন নাই—বিপত্নীক জীবন সচ্ছন্দে কাটাইয়াছেন।

তাঁহার ৪টি পুত্র, ২টি কন্যা। স্ত্রী বিয়োগের পর সংসারে একমাত্র তাঁহার বিমাতা ছিলেন। তিনিও সাধারণ সংসারী স্ত্রীলোকের মত নহেন। তিনিও পরমহংস দেবের ভক্ত—ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। একটা প্রবাদ কথা শুনিয়াছিলাম যে,"বিমাতা সচরাচর সপত্নীপুত্রে স্বাভাবিক স্নেহশীলা হন না। কিন্তু যদি হন তবে অতিমাত্রায়।" এই কথাটি সর্ব্বথা সত্য

কিনা জানি না, এ ক্ষেত্রে কিন্তু সফল হইতে দেখিয়াছি। হরমোহন বাবুর বিমাতা হরমোহন বাবুকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, অথচ ধর্ম্ম-কর্ম্মে সাধুসেবায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেন।

মানুষ নিজের সন্তানকে নিজেরই অনুগামী করিতে চায়। সাধ্যানুসারে সকলেই সন্তানের শিক্ষা সংস্কারের সেইরূপই ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সাংসারিক বিষয় অধিকাংশস্থলে তাহার সফলতাও দেখা যায় বটে কিন্তু স্বভাব-প্রকৃতি রাজ্যে কিম্বা আধ্যাত্মিক জীবনে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায় না। মহাপুরুষ অথবা উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানী ভক্ত সাধু-সজ্জনের পুত্র পিতৃানুরূপ প্রায় দেখা যায় না।

হরমোহন বাবু অনেকদিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যচরণ নিতান্ত বালক, তখন তিনি তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত কোন কোন পুস্তকের "প্রকাশক সত্যচরণ মিত্র" এইরূপ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় তাঁহার প্রিয় পুত্রকে এই সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় তাঁহার সে চেষ্টা বা বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং প্রসঙ্গ ক্রমে (অনেক কথা বলিবার থাকিলেও) সংক্ষেপে শ্রীমান্ সত্যচরণ মিত্র সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পিতার মৃত্যুকালে সত্যচরণ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বালক মাত্র। এই বালক-দিগের সাধারণতঃ যে প্রকার অবস্থা তাহাতে সামান্য স্কুলের পড়াশুনা ব্যতীত অধিক আর কিছু হয় নাই। তারপর অল্প বয়সে অর্থোপার্জ্জন চেষ্টায় সংসারস্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই সত্যচরণের নিয়তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহার মন কেবল ক্ষুদ্র সাংসারিক চিন্তার দিকে না গিয়া ধীরে ধীরে ঐ পিতার প্রদর্শিত পথে—ধর্ম্মচর্চ্চা সাহিত্যসেবার দিকেই গেল। এইখানে বিধাতার গূঢ় রহস্য কে অস্বীকার করিবে?

বন্ধুবর হরমোহনের মৃত্যুর কিছুদিন বাদে অনুমান সত্যচরণ যখন ২০৷২১ বৎসরের যুবক তখন আবার আমি সহসা একদিন তাঁহাকে ধর্ম্মবন্ধুর অনুগত বিনীত পুত্র রূপেই দর্শন করি। তদবধি মধ্যে মধ্যে সত্যচরণ আমার নিকট যাতায়াত করিতেন। ক্রমে ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সাহিত্যানুরাগী হইতে দেখিতে পাই। পরমহংসদেবের প্রতি এবং ব্রাহ্মসমাজের সাধুভক্ত দিগের প্রতিও তাঁহার সরল হৃদয়ের অনুরাগ ফুটিয়া উঠিতেছিল।

তারপর সহসা দেখিলাম সত্যচরণ, বরাহনগর হইতে "প্রতিবাসী" মাসিক

পত্র বাহির করিয়াছেন। কিছুদিন সেই কাজে তাঁহাকে সম্পূর্ণ উদ্যমশীল ও অনুরাগী দেখিতে লাগিলাম। বরাবর শুনিয়া আসিতেছি, বিবাহাদি করিয়া সংসারী হইতে সত্যচরণের প্রবৃত্তি নাই। তাঁহার মুখে মধ্যে মধ্যে শুনিতাম, "আর্থিক অবস্থা যখন ভাল নয়—তখন বিবাহ করা অনুচিত।" (জানিনা এরূপ অনুচিত বোধ কয়জন যুবক করিয়া থাকেন)—বিশেষতঃ আর ৩ টি ভাই তাঁহারা একত্রে থাকিয়া একভাবে চলিবেন কি না তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং তিনি আর সাংসারিকজীবনে জড়িত হইবেন না এই কথাই শুনিতেছিলাম।

তারপর আজ বৎসর তিন হইল একদিন সহসা শুনি সত্যচরণ বিবাহ করিয়াছেন। ব্যাপার কি? না—এক বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়া (অবশ্য বন্ধুটি কায়স্থ) দেখেন দেনা-পাওনার গণ্ডগোলে উপস্থিত বিবাহ ভাঙিয়া গেল। পাত্রীটির তেমন কেহ নাই—এক মাসীমা অভিভাবিকা মাত্র। তিনি এই আসন্নবিপদে আত্মহত্যা করিতে উদ্যতা —মহা গোলযোগ!

এই অবস্থায় সত্যচরণের কোন বন্ধু বলিলেন, "সত্য, তুমি এই কন্যাটিকে বিবাহ করো।" সত্যচরণ বিধাতার কি ইঙ্গিত বুঝিলেন, তাই তিনি সম্মতি দিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে শতাধিক টাকা ব্যয়ে বিবাহের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সকল দিক রক্ষা এবং কন্যাটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।

ঈশ্বর-কৃপায় এই মিলনের ফল ভালই হইয়াছে। এই দম্পতীর মধ্যে পারিবারিক শান্তি দেখা যাইতেছে। মেয়েটি অতি লক্ষ্মী—শান্তশীলা ধর্ম্মানুরাগিণী। সরল প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত স্বামী লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন—বাস্তবিক নর নারীর এইখানেই কৃতার্থতা, প্রত্যেক জীবনের জন্যই কোন না কোন আকারে ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছেই, মানুষ তাহা দেখিয়া যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়, তবেই সুখ শান্তির মূল প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য এই সন্তোষ বুদ্ধি টুকুই এই বালিকার জীবনে বিধাতার দান। বিধাতা করুন, এই নব দম্পতি যেন চিরদিন জীবনে তাঁহার করুণা ধরিয়াই থাকিতে পারেন।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমান্ সত্যচরণ বরাহনগরে বাস করিতেছেন। প্রবন্ধ বাহুল্য আশঙ্কায় আর অধিক কিছু বলিতে পারিলাম না।

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

ভারতে শিক্ষার প্রসার—শিক্ষাবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার স্কুল সংখ্যা—

	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১৯১৫-১৬ সালে	৭,৩০২	১১ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৫১
১৯১৬-১৭ ,,	৭,৬৯৩	১১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৩৫

বৃদ্ধি স্কুল সংখ্যা—৩৯১, ছাত্র ৫৩ হাজার ৫৮৪ জন।

কলেজ—১৯১৫-১৬ সালে ২০০ ছিল, ১৯১৬-১৭ সালে ১৯৫ হইয়া ৫টি কমিয়াছে কিন্তু ছাত্র সংখ্যা ৫৫ হাজার ৬২০ স্থলে বাড়িয়া ৫৮ হাজার ৬৩৯ হইয়াছে।

বালিকাবিদ্যালয়—১৯১৫-১৬ সালে ১২ হাজার ৫৬১। ছাত্রী—১১ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৪০ ছিল।

১৯১৬—১৭ সালে ছাত্রী—১২ লক্ষ ৩০ হাজার ৪১৯ হইয়াছে সুতরাং আলোচ্য বর্ষে শিক্ষার্থিণীর সংখ্যা ৪২ হাজার বাড়িয়াছে। তথাপি ভারতে একশত স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ টির মাত্র বর্ণ পরিচয় হইয়াছে। পুরুষের মধ্যেও সমগ্র ভারতে একশতের মধ্যে ৯৫ জন বর্ণ জ্ঞান শূন্য।

ব্রাহ্মণাদির স্বধর্ম্ম ত্যাগ—কেবল যাজনা, অধ্যাপনা, এবং প্রতিগ্রহ (দান লওয়া) দ্বারাই ব্রাহ্মণ জীবন ধারণ করিবেন, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। কিন্তু ১৯১১ সালের আদম সুমারি রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ তালিকা হইতে দেখা যায়, পূর্ব্ববাংলায় শতকরা ২৮ জন, পশ্চিমবাংলায় শতকরা ১৯ জন ব্রাহ্মণ আংশিকভাবে মাত্র স্বধর্ম্মপালনে বা নিজবৃত্তিতে টিকিয়া আছেন। ঐরূপ ক্ষত্রিয়, প্রজার কর গ্রহণ করিয়া, বৈশ্য, কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদ অথবা শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, সেই স্থানে (ক্ষত্রিয় তো ইংরাজ) বৈশ্য পূর্ব্ববাংলায় শতকরা ১৫ জন, পশ্চিমবাংলায় একজনও নয়, কায়স্থ পূর্ব্ববাংলায় একজনও নয়, পশ্চিমবাংলায় শতকরা ১৯ জন স্ববৃত্তিতে আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববাংলায় শতকরা ৭২ জন পশ্চিমবাংলায় ৮১ জন, বৈশ্য ৮৫ জন কায়স্থ ৮১ জন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ" শাস্ত্র বাক্য রক্ষা করিয়া নিধন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন নাই।—বঙ্গদেশে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাস, তাহার মধ্যে ৮১ হাজার গৃহস্থ বা রকম ৵১০

চোদ্দ পাই মাত্র যাজনা ও অধ্যাপনা করেন। অবশিষ্ট ৸১০ সাড়ে বার আনা রকম ব্যবসায় ও চাকুরী করেন। চাকুরীর মধ্যে গৃহপাচকের কার্য্য ও অন্যান্য হীনবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহভৃত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণপাচকের সংখ্যা ২৫ হাজার, কায়স্থ ভৃত্য ১১ এগার হাজার, কৈবর্ত্ত্য ১০ হাজার, গোপ ৮ হাজার, সদ্‌গোপ ৫ হাজার, নমঃশূদ্র ৫ হাজার। অর্থাৎ শাস্ত্রবর্ণিত শূদ্রবৃত্তি গ্রহণে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যা অধিক দেখা যায়।

মুসলমান অধিকারের সময়ে হিন্দুসমাজ ইস্‌লাম (সাম্যের) ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন। শ্রীচতন্যদেব তখন "চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণ" ভক্তি পথে এই নীতি প্রচার দ্বারা আহারে এবং বিবাহে জাতিভেদ রহিত করিয়া হিন্দুসমাজকে ইস্‌লামের আকর্ষণ হইতে নিবৃত করেন। কিন্তু প্রবল বাধার সম্মুখে ঐ স্রোত মন্দীভূত হইয়া গেল। ইংরাজ অধিকারে ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদ —ভারতের লুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জাতিভেদের বিরোধী সাম্যের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া খৃষ্টীয়ান স্রোত রুদ্ধ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও ব্রহ্মানন্দ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন হিন্দুসমাজ রক্ষার উপায়ান্তর ছিল না। অথচ তাঁহাদের প্রথা বেদ স্মৃতি বিরোধী নহে। অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহে ও আহারে পরস্পর স্পর্শ, দোষনীয় ছিল না। কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অনুবর্ত্তিত পথে আজো যাঁহারা সমগ্র হিন্দুসমাজকে টানিয়া রাখিতে চান, তাঁহারা কি উজান স্রোতে সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবেন? (সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত)

কারাগারে বালকদিগের শিক্ষা—আলিপুরে বালক-কারাগারে গভর্ণমেণ্ট কয়েদী বালকদিগের সংশোধনের চেষ্টায় যে কায করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। বাবু জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী গত ৬ মাস যাবৎ আলিপুর কারাগারের বালকদিগের মধ্যে সুনীতি ও সদ্ভাব প্রচার করিতেছেন। এবং ঐ কারাগারে বালকবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে লইয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক শনিবারে নীতি বিদ্যালয়ের কায হয়।

বালকদিগের সঙ্কল্প শিক্ষা দান—

১। আমি কখনও মিথ্যা কথা কহিব না। আমাকে কেহ গালি দিলে আমি তাহাকে গালি দিব না। যদি কেহ আমাকে কষ্ট দেয় আমি জমাদারের নিকট রিপোর্ট দিব।

২। আমি কোন ওয়ার্ডারের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিব না,যথাযথ হুকুম মান্য করিব। আমি আমার কাজ মনোযোগের সহিত করিব ও শিখিব।

৩। অন্য কোন ছেলের সঙ্গে অনর্থক কথা বলিব না। মনোযোগের সহিত পাঠ করিব। নম্বরে বন্ধ হইবার পর কোন ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিব না।

৪। চক্ষু, কর্ণ, দন্ত ও শরীরের অন্যান্য অবয়ব পরিষ্কার রাখিব। মনোযোগের সহিত ব্যয়াম করিব ও শিখিব। তামাক কিম্বা অন্য কোনও মাদক দ্রব্য হাত দিয়াও ছুঁইব না।

৫। প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করিব। আমি এই জেল হইতে ভাল ছেলে হইয়া বাহির হইব।

দেহ পুষ্টি—কলিকাতার একজন দৈনিক ডাক্তার এক প্রবন্ধে দেহ পুষ্টির কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। ১ম। সুস্থ বা অসুস্থ যে কোন অবস্থায় আহারে রুচি না হইলে আহার করিবে না। ২য়। ভালরূপে চর্ব্বন করিয়া আহার করিবে। ৩। দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যার পর আহার করিবে। ৪। ভাত ডা'ল মাছ মাংশ কম খাইয়া দুধ, ফল ও তরকারি উপযুক্ত পরিমাণ খাইবে।

মন্তব্য—১। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই যাঁহাদের আহার করিতে হয় তাঁহারা রাত্রে না খাইয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আহার করিবেন। রাত্রি ৯টা বা ১০টায় শয়নের পূর্ব্বে সামান্য পানীয় ব্যতীত আর কোন আহার করিবেন না। ইহাতে প্রাতে শরীর স্বচ্ছন্দবোধ এবং বেলা ৯।১০টায় আহারে বেশ রুচি হইবে।

২। ভাত কিছু কম খাইয়া ফল দুধ দৈ এবং সন্দেশ খাইলে ভালই হয় বটে কিন্তু যাহাদের ভাতই প্রধান খাদ্য তাঁহারা অধিক তরকারি এবং মশলা বেশী দেওয়া ব্যাঞ্জনের পরিবর্ত্তে সাদা সিদা রান্না তরকারি বা কেবল সিদ্ধ তরকারি ও ডা'লের যুষ আর ভাত খাইলে অধিক উপকার পাইবেন। পরীক্ষায় আমরা ইহাই বুঝিয়াছি।

মহাসমরে জেলখানার আনুকূল্য —বঙ্গীয় কারাগার সমূহ হইতে গত দুই বৎসরে মেসোপটেমিয়ায় ৬০৬ জন কয়েদীকে শ্রমজীবির কাযে পাঠান হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ছাতা, ছট, ক্যাষ্টর অয়েল, সরিষার তৈল, এবং ৪৪ হাজার কম্বল ও ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ব্যাণ্ডেজ পাঠান হইয়াছে।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গত ১১ই আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে গোবরডাঙ্গার মহামান্ত জমিদার রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। গোবরডাঙ্গার নূতন বাসভবনেই তাঁহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রোধ হইয়া সহসা এই ঘটনা হয়, সুতরাং তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সমস্ত কুশদহবাসী এবং ঐ প্রদেশস্থ সর্ব্বসাধারণ জনমণ্ডলী অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে—হইবারই কথা, বাস্তবিক গিরিজাপ্রসন্ন বাবু সুবিখ্যাত বহুগুণান্বিত জমিদার এবং প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অভাবে সকলেই দুঃখিত হইবেন ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁহার ন্যায় চিরদিন পল্লীবাসী হইয়া প্রজা পালনে রত থাকিতে সহসা দেখা যায় না। তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে বাহির হইয়া একাদিক্রমে নূন্যাধিক ৪০ বৎসর কাল (বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স অনূন্য ৬২ বৎসর হইয়াছিল) স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যেই জীবন অবসান করিলেন। দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠান গুলিতে তাঁহার প্রধান আসন দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি তেজস্বী বিচক্ষণ অথচ মিষ্টভাষী ছিলেন। আমরা সত্য সত্যই তাঁহার জন্য হৃদয়ে গভীর আঘাৎ বোধ করিতেছি। অতঃপর তাঁহার শোকাতুরা পত্নী এবং শোকার্ত্ত পুত্র কন্যাগণ ও সমস্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা অনুভব করিয়া এক্ষণে এই কথাই মনে হইতেছে যে, যিনি ইহপরলোকস্থ সকলেরই একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, সেই সর্ব্বাশ্রয়দাতা ভগবান ভিন্ন ইহ পরলোকে শান্তিদাতা আর কে আছেন? আমরা যেন তাঁহারই দ্বারে শান্তনার প্রার্থী হইতে পারি।

গত ১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সেণ্ট্রাল-কলেজ ভবনে (৭১।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের পরলোকগমনোপলক্ষে "কুশদহ-সমিতির" একটি বিশেষ অধিবেশনে 'শোকসভা' আহুত হইয়াছিল। সম্পাদক-প্রেরিত তদ্বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

জমিদার গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর পরলোকগমনে "শোকোচ্ছ্বাস" শীর্ষক ২টি কবিতা—১টি, হয়দারপুর জমিদার তরফ হইতে, আর ১টি গোবরডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ স্বাক্ষরিত, এবং গোবরডাঙ্গা হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—লিখিত 'বিলাপ' শীর্ষক প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

কতিপয় গ্রামবাসীর উদ্যোগে ২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সায়ংকালে গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপাল হলে স্বর্গীয় গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর জন্য আর একটি "শোকসভার" অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ভিষকাচার্য্য, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় এবং "কুশদহ-সম্পাদক" প্রভৃতি বক্তাগণ সময়োপযোগী ভাবে লিখিত প্রবন্ধ ও মৌখিক বক্তৃতা দ্বারায় শোক প্রকাশ করেন। সঙ্গীত এবং কবিতা পাঠ দ্বারাও সভার কার্য্যকে জমাট করিতে চেষ্টার ক্রটী হয় নাই। এই "শোকসভা" সম্বন্ধে নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে আমরা কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এই শোকসভার প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তিন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি অনুষ্ঠানপত্র কুশদহ সমিতির সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া কুশদহ-সমিতিকেও উক্ত শোকসভায় যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে সমিতির পক্ষ হইতে দু' একটি সভ্য ব্যতীত অধিক সংখ্যক সভ্যের কলিকাতা হইতে গোবরডাঙ্গায় যাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। যথা সময়ে সমিতির কলিকাতাস্থ সভ্যগণের সম্মিলনে গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর জন্য একটি শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। আমরা জানি, কুশদহ-সমিতি কোন ব্যক্তিগত বা গ্রামগত প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু ইহা সমগ্র কুশদহবাসীর সম্মিলনের স্থল। কুশদহ-সমিতি নিয়মতন্ত্র-প্রণালী দ্বারা পরিচালিত। সমিতি নিয়ম প্রণালীগত ভিত্তি স্থাপন-রূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কুশদহর পল্লীতে পল্লীতে 'শাখা-সমিতি' স্থাপনাদি কার্য্যে আজও হস্তক্ষেপ করিতে না পারায় সহসা গোবরডাঙ্গায় শোকসভার অধিবেশন করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু গোবরডাঙ্গার অধিবাসীগণ যদি এই উপলক্ষ্যে প্রথমেই সমিতির যোগে গোবরডাঙ্গায় এই "শোকসভা" আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে কাজ

আরো ভালই হইত। যাহা হউক গোবরডাঙ্গার মহামান্ত জমিদার বাহাদুরের জন্য গ্রামবাসীর পক্ষে এই শোকসভার অধিবেশন একেবারে অস্বাভাবিক নয়। অতঃপর সভার অনুষ্ঠান পত্রে স্বাক্ষরকারী এক কুঞ্জবাবু ব্যতীত—শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র,তদ্ভিন্ন জমিদার পরিবারের প্রধান শোককারীগণের মধ্যে রায় বাহাদুরের পুত্রদ্বয় ব্যতীত শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ প্রসন্ন বাবু ও তাঁহার ভ্রাতাগণ কিম্বা স্বর্গীয় ছোট বাবুর পুত্রগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিতে না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

সকলেই জানেন গৃহ-বিবাদে গৃহস্থ কেমন বিনষ্ট হয়। জমীদারে জমীদারে বিবাদেও কত সময় অনর্থপাত হইয়াছে। গত ১০ বৎসর ব্যাপিয়া গোবরডাঙ্গার জমিদার মধ্যম তরফে এবং হয়দারপুরের বসুমল্লিক জমীদারে, বেড়ী-রামনগর বাঁমড় সংক্রান্ত বিষয় লইয়া পরস্পর বিবাদ চলিতে ছিল। আমরা এপর্য্যন্ত ব্যক্তিগত বিবাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত মনে করি নাই। সম্প্রতি বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিয়া সুখী হইলাম যে,ঐ বিবাদ এবার সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইহা দেশের পক্ষেও সুসংবাদ বটে।

এবার গোবরডাঙ্গা স্কুলের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থি ১০টি ছাত্রের মধ্যে ১ম বিভাগে ৩, ২য় বিভাগে ৪, ৩য় বিভাগে ১টি; মোট ৮টি ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। এজন্য প্রধান শিক্ষক এবং তাঁহার সহযোগীগণের সহিত আমরাও আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

সমগ্র কুশদহবাসী কত ছাত্র কে কোন্ বিষয়ে কোথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা জানা যায় না। এজন্য আমরা অসম্পূর্ণ-সংবাদ দিতে পারিলাম না, কিন্তু আমরা সমস্ত ছাত্রগণের মঙ্গল কামনা করি।

বেড়গুম নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, কলিকাতার ৩৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন মেডিকেল-কলেজে, ৬ষ্ঠ বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়িতে ছিলেন, এমত সময় (২৮শে পৌষ) "কুশদহ-

সমিতির” জন্ম হয়। শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বিধাতা-পরিচালিত হইয়া সমিতির সম্পাদকীয় গুরুতর কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করেন। এম্ বি, পরীক্ষার শেষ সময়ে এই নব সমিতির কার্য্যভার বহন করিয়াও নিয়মিত কলেজ গমন ও পরীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া ঈশ্বর-প্রসাদে তিনি এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং ভেষজ বিষয়ে (মেডিসিনে) বিশেষত্ব লাভ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা উচ্চচিন্তা—মহৎ বিষয়ের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া নিজ জীবনের কর্ত্তব্য পথে চলেন, তাঁহারা অধিক শক্তিশালীই হন। একত্রে বহু বিষয় কর্ত্তব্য পালন তাঁহাদের পক্ষে কঠিন বোধ হয় না। অন্যথা ক্ষুদ্র চিন্তা লইয়া যাঁহরা সংসারযাত্রা আরম্ভ করেন, তাঁহারা কোন গতিকে পৃথিবীর ধনী হইলেও বাস্তবিক 'বড় লোক' হইতে পারেন না।

শোক-সভা

(প্রাপ্ত)

গোবরডাঙ্গার মহামান্য জমিদার

রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের

পরলোকগমনোপলক্ষ্যে

কুশদহ-সমিতির বিশেষ অধিবেশন।

তারিখ—২রা জুলাই ১৮ই আষাঢ় ১৩২৫।

স্থান—সেণ্ট্রাল কলেজ-ভবন

(৭২।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট)

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক, ” পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যা, ” নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদক) ” গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, (সহঃ সম্পাদক) ” ব্রজকিশোর মিত্র, ” সতীশচন্দ্র মিত্র, ” হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ” যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ” যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু (কুশদহ-সম্পাদক) ” সুরেশচন্দ্র পাল, ” রাযেশ্বর রক্ষিত, ” রামচন্দ্র দত্ত, ” নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, ” নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল, ” নীলাচল মুখোপাধ্যায় বি-এল, ” কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়, ” বিনয়কৃষ্ণ কুণ্ডু, ” মনীন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, ” বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ২৭।২৮ জন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্যা-

রম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ কুণ্ডু পরলোকের ভাবোদ্দীপক "ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম, অপূর্ব্ব শোভন—ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়!" এই সুন্দর সঙ্গীতটি গান করিয়া সকলকে পরম পরিতুষ্ট করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে প্রথমবক্তা শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, গিরিজাপ্রসন্ন বাবু আমাদের দেশের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ জমিদার অতি বিরল। তাঁহার অভাবে আমাদের দেশ শ্রীহীন হইল।

পরবর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়, জমিদার মহাশয়ের গুণাবলী ব্যাখা করিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর কোন দোষ ছিল না, এরূপ নহে, কিন্তু অদ্যকার সভায় আমরা স্বর্গীয় ব্যক্তির দোষ ভুলিয়া গুণাবলী আলোচনা করিবার জন্যই সকলে সমবেত হইয়াছি। তিনি বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নিজ গুণেই তিনি এত উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরোপকারী এবং বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে বিজ্ঞ বিচারক ছিলেন। বিষয় বুদ্ধিতে তাঁহার ন্যায় জমিদার বাংলাদেশে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ধনী জমিদার হইয়াও অতি সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরিদ্র প্রজাদিগেরও সংবাদ রাখিতেন। তিনি শ্রমের মর্য্যাদা জানিতেন, শারীরিক পরিশ্রমকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। সকল বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা এক আশ্চর্য্য রকমের ছিল। তাঁহার অভাবে আমাদের কুশদহের বিশেষ ক্ষতি হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তাঁহার নেতৃত্ব শক্তির একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার কথা কেহ অন্যথা করিতে সাহস করিত না। তিনি আমাদের দেশের সুবিখ্যাত জমিদার ছিলেন।

তৎপরে কুশদহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়, গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যু এবং "কুশদহ সমিতির" কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক সুন্দর ভাবপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "কুশদহ-সমিতির" কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ আলোচিত হয় যে, শীঘ্রই সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন গোবরডাঙ্গায় হওয়া আবশ্যক, এবং তাহাতে শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বাবু যাহাতে সভাপতির কার্য্য করেন তাহার সমস্ত ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে

হইবে। কিন্তু হায়! আজ আমরা তাঁহার জন্য 'শোকসভা' করিতেছি! কিন্তু ইহার মধ্যেও বিধাতার হস্ত দেখিতে হইবে। এ বিশ্ব-সংসারের সমুদয় ঘটনা তাঁহারই অভ্রান্ত নিয়মে পরিচালিত। আজ আমরা যাঁহার অভাবে সন্তপ্ত হইয়াছি, তাঁহার জীবনের কথা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ বলিয়াছেন, আমি সে কথার পুনরুক্তি করিয়া সময় নষ্ট করিব না। কিন্তু আমি সবিনয়ে আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আজ কি আমরা কেবল শোক করিয়া সেই শোকের অন্ধকার নিরাশা লইয়াই ঘরে ফিরিব?—না। আমি আপনাদিগকে এই কথাই স্মরণ করাইতে চাই যে ভারতবাসী - এমনকি এই বর্ত্তমান বাঙালী জাতির সম্মুখেও আর একটি আদর্শ আছে। তাঁহারা মৃত্যুতে ডুবিয়া থাকেন নাই। তাঁহারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, ভারতবাসী মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন। ভারতের ঋষি বলিয়াছেন, "যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি" অর্থাৎ যাহার শেষ নাই তাহাই সুখের কিন্তু কোন পরিমিত বিষয়ে সুখ নাই। আজ আমাদের সম্মুখ হইতে গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর সেই সুন্দর দেহ অন্তর্হিত হইলেও তাঁহার আত্মা বিনষ্ট হয় নাই, বরং এত দিন যিনি আমাদের জমিদার-শাসকরূপে বাহিরে ছিলেন, আজ তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি যোগে আমাদের অন্তরের হইলেন; আমরা একটু অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিশ্বাস চক্ষে দেখিতে পারিলে দেখিব, তিনি আত্মিকভাবে আমাদের ছাড়া নন।

গিরিজাপ্রসন্ন বাবু কুশদহের এক ছত্রী শাসক ছিলেন, আজ তিনি ইহলোকে নাই,—কিন্তু তাঁহার গমনের পূর্ব্বেই কুশদহ-সমিতির জন্ম হইয়াছে। তিনি ছিলেন একাধিপতি—এক মাত্র নায়ক। অপরদিকে দেখুন "কুশদহ-সমিতি" সেই কুশদহের একজনের শক্তি লইয়া জন্মায় নাই, ইহা সকলের সমবেত শক্তি। তিনি ছিলেন মহামান্য একমাত্র শাসক, আর "কুশদহ-সমিতি" নগণ্য ক্ষুদ্র হইতে মহামান্য সকলের সেবক।

গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর বিস্তর গুণ ছিল। আমি তাঁহার গুণের সহিত অন্যের তুলনা করিবার পক্ষপাতি নহি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি,—আমাদের কুশদহে গুণবান, চরিত্রবান—সাধু প্রকৃতির বিদ্বান, জ্ঞানী, ভক্ত, সেবক, কর্ম্মী সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

অবশেষে বক্তা বলেন, জগতে একনায়কত্বের দিন চলিয়া যাইতেছে। সমবেত শক্তির প্রতিষ্ঠান গুলিই জাগিয়া উঠিতেছে। কিসে "কুশদহ-সমিতি" কুশদহবাসীর কেন্দ্রীভূত শক্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে ইহা ভাবিবার কথা।

তাই বলি বাহিরে শোক প্রকাশ করিলে চলিবে না; আজ আমরা দিব্যচক্ষে দর্শন করি যে, সেই একছত্রী নায়কের শক্তিও কুশদহ-সমিতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। ইহা অনুভব করিয়া আমরা যাঁহাকে বাহিরে হারাইলাম আসুন তাঁহাকে ভিতরে লাভ করিয়া সমবেত ভাবে দেশের সেবায় নিযুক্ত হই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয় একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় স্বর্গীয় জমিদার মহাশয় তাঁহাকে খাঁটুরা বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় কতদূর সাহায্য ও সহায়তা করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার স্ত্রীশিক্ষানুরাগ এবং তাঁহার উদার ভাবও যে খুব ছিল তাহা প্রকাশ করেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় জমিদার মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপনসূচক পত্র প্রেরণ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সকল বক্তব্যের সারভাব প্রকাশের সহিত তাঁহার নিজের পারিবারিক ঘটনা উল্লেখ করিয়া যে অভিভাষণ প্রকাশ করেন, তাহাতে গিরিজাপ্রসন্ন বাবু সমাজিক বিষয়েও যে উদার মতাবলম্বী ছিলেন তাহাই প্রকাশ করেন।

অতঃপর কুশদহ-সম্পাদক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
(কুঃ সমিঃ সম্পাদক)

কুশদহ-পঞ্জী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বর্গীয় সাদরাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবুর স্বর্গীয়া পত্নী, বনগ্রামের অন্তর্গত-পানচিতা নকপুল গ্রাম নিবাসী ৺ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা। সারদাপ্রসন্ন বাবুর ৫পুত্র—৪কন্যা।

১ম পুত্র গিরিজাপ্রসন্ন। ২য়, অন্নদাপ্রসন্ন। ৩য়, জ্ঞানদাপ্রসন্ন। ৪র্থ, ৺প্রমদাপ্রসন্ন। ৫ম, ৺কুলদাপ্রসন্ন।

১ম কন্যা যোগমায়া দেবী (বর্ত্তমান-বিধবা)। (২য়) সুরকুমারী। (অবর্ত্তমান) (৩) নিশামণি (অবর্ত্তমান)। (৪র্থ) সুমতি দেবী (বর্ত্তমান-বিধবা)।

৺ রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী,২৪ পরগণার পাইখাটী গ্রামের ৺কালাচাঁদ দানিয়াড়ীর কন্যা। গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর ২ পুত্র—৯য় কন্যা, তন্মধ্যে শৈশবে মৃতা ১টি।

১ম পুত্র জগৎপ্রসন্ন। ২য় শৈলজাপ্রসন্ন।

১ম কন্যা শৈবলিনী (বিধবা)। ২য় সরোজিনী (অবর্ত্তমান)। ৩য় পঙ্কোজিনী (বিধবা)। ৪র্থ নলিনী (বিধবা)। ৫ম শ্রীমতী চারুভাষিনী। ৬ষ্ঠ শ্রীমতী পদ্মিনী। ৭ম শ্রীমতী কদম্ববালা। ৮ম শ্রীমতী পুষ্পবালা।

১। জগৎপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, কলিকাতা শোভাবাজার ১নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটের যোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৪র্থ কন্যা।

২। শৈলজাপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, উক্ত যোগেন্দ্র বাবুর ৫ম কন্যা।

১। শৈবলিনী দেবীর স্বামী, ২৪ পরগণার এঁড়েদহের ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ৺অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।

২। সরোজিনীর বিবাহ হইয়াছিল বিল্বগ্রামের দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত।

৩। পঙ্কোজিনীর স্বামী, হাওড়া জেলার মৃগকল্যাণ গ্রামের ঈশানচন্দ্র ঘোষালের পুত্র, ৺ননীগোপাল ঘোষাল।

৪। নলিনীর স্বামী, বিল্বগ্রামের ৺ ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, ৺যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

৫। চারুভাষিনীর স্বামী, জনাইয়ের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। পদ্মিনীর স্বামী, বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৭। কদম্ববালার স্বামী, বেহালার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের (আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য) পুত্র, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৮। শ্রীমতী পুষ্পবালার স্বামী,চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

৺সারদাপ্রসন্ন বাবুর ২য় পুত্র অন্নদাপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, হুগলি জেলার ভাণ্ডার হাটী গ্রামের ৺ মতিলাল চৌধুরীর কন্যা।

অন্নদাপ্রসন্ন বাবুর ৩ পুত্র—৪ কন্যা; তন্মধ্যে জীবিতা ১টি মাত্র।

১ম পুত্র জ্যোতিপ্রসন্ন, ২য় সতীপ্রসন্ন, ৩য় ক্ষিতিপ্রসন্ন।

* জ্যোতিপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, হুগলি জেলার শিমলাগড় গ্রামের জয়চন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা। জয়চন্দ্র বাবু এক্ষণে হুগলিতে বাস করেন।

সতীপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, আহিরিটোলার বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।
ক্ষিতিপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের ৺ উমেশ বটব্যালের পৌত্রী।
অন্নদাপ্রসন্ন বাবুর একমাত্র জীবিত কন্যা শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরীর স্বামী, পূর্ব্ব ন' পাড়া গ্রামের ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একটি মৃতা কন্যার স্বামী, চোরবাগানের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গুলী।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

৺ সারদাপ্রসন্ন বাবুর ৩য় পুত্র জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবুর তিন বিবাহ।
১মা স্ত্রী—হেতমপুরের রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর কন্যা।
২য়া স্ত্রী—গোয়াড়ীর দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।
৩য়া স্ত্রী—শান্তিপুরের রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।
জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী আশালতার স্বামী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁর বর্ত্তমান ঠিকানা কলিকাতার বলরাম দের ষ্ট্রীটের ডবলিউ, সি, বাড়ুর্য্যের বাটী। আশালতার জননী, জ্ঞানদা বাবুর ১মা পত্নী।

৺প্রমদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

৺সারদাপ্রসন্ন বাবুর ৪র্থ পুত্র—৺প্রমদাপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, জানাই নিবাসী, কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ প্রবাসী দীননাথ বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা। প্রমদাপ্রসন্ন বাবুর ৩ পুত্র—১ কন্যা।
১ম পুত্র সচীপ্রসন্ন, ২য় কমলাপ্রসন্ন, ৩য় অসিতাপ্রসন্ন।
১। সচীপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, চন্দননগর সরিষাপাড়ার অবিনাশচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা।
২। কমলাপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, কলিকাতা মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটের সুশীলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ২য় কন্যা।
৩। অসিতাপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী, উক্ত সুশীল বাবুর ৩য় কন্যা।
৺প্রমদাপ্রসন্ন বাবুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মোহিতকুমারীর স্বামী, শিবপুরের জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৺ সারদাপ্রসন্ন বাবুর ৫ম পুত্র কুলদাপ্রসন্নের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়।
৺ সারদাপ্রসন্ন বাবুর কন্যাগণ——
১মা, (বর্ত্তমান) যোগমায়া দেবীর স্বামী, এড়েদহের ৺কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২য়া, (অবর্ত্তমান) সুরকুমারী দেবীর স্বামী, কচুয়াগ্রামের ৺ বরদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
৩য়া, (অবর্ত্তমান) নিশামণি দেবীর স্বামী, উক্ত বরদা বাবুর ভ্রাতা ৺অন্নদা-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
৪র্থা, (বর্ত্তমান) সুমতীদেবীর স্বামী, ধাত্রীগ্রামের ৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্‌স প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার
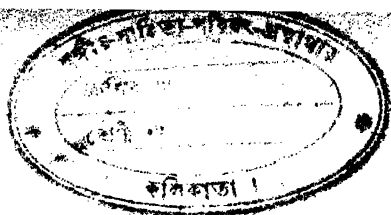
সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

দশম বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩২৫ { চতুর্থ সংখ্যা

সঙ্গীত *

—০—

তাল আড় খেমটা

তোমার মতো 'বড্ডভাল মা' আর কে আছে বলো?
ব্রহ্মাণ্ড পালনী-শক্তি, পূর্ণরূপে তুমি কেবল।
বীজাকারে তুমি পিতা, ধৃত-শক্তি তুমি ধাতা,
স্নেহময়ী রূপে মাতা, সৎস্বরূপে তুমি সম্বল।
ন্যায় রূপে তুমি রাজা, আমরা সাধারণ প্রজা,
(আবার) যখন করি তোমার পূজা, তুমি ভকত বৎসল।
বহু রূপে তুমি একা, বিশ্ব-ছবি তব আঁকা,
তোমার ভাব রূপের নাহি অন্ত, তুমি অনন্ত মঙ্গল।

(সংশোধিত)

---

* ১৩১০ সালের ১৯শে আশ্বিন, গোবরডাঙ্গার বাটীতে অবস্থিতি কালীন উপাসনান্তে এই গানটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক লিপিতে (ডায়েরী) লিখিত ছিল। দাস—

—০—

কুশদহের ইতিহাস

স্মুবর্ণ বণিক—প্রবাদমতে অযোধ্যা হইতে স্বর্ণবণিক গৌড়ে আগমন করেন, এবং গৌড় হইতে ধনপতি দত্তের অনুরোধে উজানী নগরে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, গন্ধবণিক ও স্বর্ণবণিক একই শ্রেণী নহেন এবং এক সময়েও বঙ্গদেশে আসেন নাই। ধনপতির আদেশে যে পাঁচজন সুবর্ণবণিক গৌড় হইতে উজানীতে আসিয়া বাস করেন তাঁহাদের নাম নরহরি বড়াল, কর্ণদাস বড়াল, নিরানন্দ দে, বারাণসী চন্দ ও শঙ্করনাথ বণিক।

গন্ধবণিক অপেক্ষা সুবর্ণবণিক যে অধিক অর্থশালী ছিলেন, তাহাও জানিতে পারা যায়। কেননা আশীপণ সোনা কিনিবার আবশ্যক হওয়ায় ধনপতি দত্ত নরহরি বড়ালের সহিত পরিচিত ও মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহা হইলে তখন যে কেবল গন্ধবণিকগণ সমুদ্রপথে দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিতেন, তাহা নহে। সুবর্ণ বণিকগণও উক্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। খৃষ্ট জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও সোনা যে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্র পথে বিদেশে রপ্তানী হইত,তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

খৃষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় বণিক বাবিলন, মিসর প্রভৃতি দেশের সহিত সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিতেন। ডাক্তার সয়েশের মতে বাবিলন ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিত। ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র, চন্দনকাষ্ঠ, তণ্ডুল, প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্য ছিল। হিউয়েট সাহেবও উক্ত মতাবলম্বী। কেনেডী, রসম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে বাবিলনের রাজা নেবুকাডনজরের রাজভবনে ভারতীয় কাষ্ঠ দ্বারা ছাদ প্রস্তুত হইয়াছিল। এরূপ একটি কাষ্ঠ বাবিলন হইতে লণ্ডনের যাদুঘরে নীত হইয়াছে এবং ভারতীয় কাষ্ঠের অবশিষ্ট বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়াই আমরা ভারতীয় বণিকের প্রতিপত্তি বাড়াইতেছি না। আমাদের দেশের প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে বাবেরু জাতক নামক গ্রন্থ আছে। তাহাতে লিখিত আছে, কিরূপে প্রথম ময়ূর লইয়া বাবিলনের রাজার নিকট ভারতীয় বণিক সমুদ্র পথে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক বুলর বলেন, পশ্চিম

ভারতের বণিকগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাবিলনের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বাবিলন হইতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য অন্যান্যদেশে নীত হইত।

বাইবেল হইতেও জানা যায় ভারতীয় হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, হীরক, চন্দন কাষ্ঠ, কার্পাস, চাউল, বানর ও ময়ূর সলোমানের (Salomon) রাজধানীতে নীত হইত। আরব দেশেও ভারতীয় বণিকের সমুদ্র পথে যাতায়াত ছিল। মিসরদেশের সমাধি স্থানেও ভারতীয় নীল, তেঁতুলকাঠ দেখা গিয়াছে। অধ্যাপক ল্যাসেন অনুমান করেন যে. মিসরবাসীগণ ভারতীয় নীল দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করিতেন এবং ভারতীয় মসলিন বস্ত্রে তাঁহাদের শবদেহ আচ্ছাদিত করিতেন। গ্রীক ও রোমক লেখকগণ ভারতীয় "স্বর্ণখননকারী পিপীলিকার" কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যখন মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সমুদ্র পথে পঞ্জাব হইতে পারস্য দেশে গমন করেন, তখন প্রায় দুই হাজার ভারতীয় পোতাশ্রয় করিতে হইয়াছিল। তাহা হইলে তখন যে, ভারতবাসীর বৈদেশিক বাণিজ্যের কিরূপ উন্নত অবস্থা ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। একমাত্র সিন্ধুনদ বাহিয়া এত গুলি বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিত। এতদ্ভিন্ন ভৃগুকচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, সুপর্ণরক পথে আর্য্য ও দ্রাবিড়গণের কত পোত যাতায়াত করিত কে বলিবে? এখনও তো আমরা বঙ্গ ও কলিঙ্গের বাণিজ্য ও বিদেশগামী পোতাবলীর কথা বলি নাই। কৌশম্বী, শ্রাবস্তী প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ যে সকল পোতে সমুদ্র পথে যাইতেন, তাহারই উল্লেখ করা হইল।

বঙ্গদেশ হইতে সমুদ্র পথে বিজয়সিংহ সিংহল গমন করেন। ইহার পূর্ব্বে সমুদ্র যাত্রা ও জলপথে বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। বিজয়সিংহ যে পোতে আরোহণ করেন. তাহাতে তাঁহার শত শত অনুচর ছিল। আর দুই খানি পোতে তাঁহাদের পরিবারবর্গ আরোহন করেন। সুতরাং তখন বাংলায় কত বড় পোত নির্ম্মিত হইত, তাহা বুঝা যাইতেছে। বিজয়ের পর তাঁহার বংশীয় অনেক ব্যক্তি সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। সিংহল ও ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জে ও চীনের সহিত বাংলার ব্যবসা চলিত। চীন হইতে রেশমী বস্ত্র আনিয়া তাহাতে জরীর কাজ করিয়া সমুদ্র পথে মিসর ও রোমে বাংলার বণিক লইয়া যাইতেন। বাংলার মসলিন ও নীলও নীত হইত। ইহার বিনিময়ে রোম সাম্রাজ্য হইতে প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা আসিত।

কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র নামক কবির রচিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, মৌর্য্য সম্রাট অশোক যখন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আসীন,তখন বণিকেরা জলদস্যু ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে যে, নাগ নামে জলদস্যুগণ তাহাদের পোত ও যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে এবং সমুদ্র পথে বাণিজ্য যাত্রা দুষ্কর ও অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। বোধ হয় এই নাগগণ আরাকানবাসী মগ জলদস্যু। মহারাজ অশোক ইহাদের শাসন করেন। কিন্তু যতদিন তাহারা বৌদ্ধ না হইয়াছিল, ততদিন সম্পূর্ণ শাসিত হয় নাই। অবশেষে অশোকের প্রেরিত সন্ন্যাসীগণ তাহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলে ঐ সকল জলদস্যু শান্তিপ্রিয় হইল এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি প্রত্যার্পণ করিয়াছিল। মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরু চাণক্য যে অর্থ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহাতে আধুনিক কালের নৌবিভাগ ও তাহার অধ্যক্ষের ন্যায়—"নাবাধ্যক্ষ" নামে রাজ কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে এবং সমুদ্রযাত্রা ও শুল্ক আদায় প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ও উপদেশ আছে। মৌর্য্য ও অন্ধ্র রাজগণের সময়ে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের অর্থাৎ সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের চরম উন্নতির অবস্থায় বোধ হয়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই বাণিজ্য অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং বলেন, বঙ্গদেশ হইতে সমুদ্রযাত্রা তাঁহার সময়ে তত নিরাপদ ছিল না। পাল রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য বাঙালী বণিকের হাতে ছিল বলিয়া মনে হয় না। সমুদ্র পথে অন্যান্য জাতির আবির্ভাব ও দেশের অরাজকতা—এই অবনতির কারণ বলিয়া মনে হয়।

কবি কঙ্কনের সময়ে প্রায় ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে সুবর্ণবণিক বাংলায় আসিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম কিন্তু এই বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেছেন যে, সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও যায় নাই। ঘরে বসিয়াই তাহারা নানা ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে তখন বিদেশের বণিক আসিয়া সপ্তগ্রামে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

সমুদ্রযাত্রা রহিত হইলে বণিকগণ বিদেশ গমন দ্বারা যে অভিজ্ঞতা, উদারতা লাভ করিতেন ও যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহা ক্রমশঃ রহিত হইল, ক্রমে কুটিলতা দেখা দিতে লাগিল, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের কালকেতুর উপাখ্যান ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ক্রমে স্বর্ণকারের সংসর্গে স্বর্ণ চৌর্য্যাদি দোষে তাঁহারা পতিত হইলেন। মহারাজ বল্লালও তাঁহাদিগকে

পতিত বলিয়া প্রচার করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণমতে তাঁহাদের পতিত হইবার কারণ স্বর্ণকার সংসর্গে স্বর্ণচৌর্য্য। প্রবাদ মতে মাতার অলঙ্কারের স্বর্ণাপহরণ ও স্বর্ণধেনুচ্ছেদ। বল্লাল চরিত মতে ও দণ্ডপুরের যুদ্ধযাত্রাকালে বল্লালের সহিত বণিক বল্লভানন্দের কপট ব্যবহার। যাহা হউক, যাঁহারা আনন্দভট্ট কৃত বল্লালচরিত পাঠ করিবেন, তাঁহারা জানিতে পারিবেন মহারাজ বল্লাল 'ক্রিয়াহীন' এই ছল ধরিয়া সুবর্ণবণিকের জল অপ্রচলিত করিয়া এই শ্রেণীকে পতিত করিলেন। কেহ কেহ মনে করেন "বুদ্ধের সজীব সাধন পথ গ্রহণ করিলে মানুষ ক্রিয়াহীন হয় না।" বা লেখকের এই মতে তাঁহারা সায় দিতে পারেন না। কিন্তু এটা লেখকের কথা নহে। ইহাতে "সায়" দিবারও কিছু নাই। বল্লাল সেনের সময় যাহা ঘটিয়াছিল লেখক তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। তবে বুদ্ধ যে সজীব সাধন পথ দেখাইয়াছিলেন,তাহার দেড় সহস্র বৎসর পরে সে সাধন পথ তাহাই ছিল কি? তাহাতে অনেক আবর্জ্জনা জন্মিয়াছিল। সুতরাং তাহার সংস্রবে মানুষের মতি গতি ও ধর্ম্মভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা জানা আবশ্যক। বুদ্ধের সময়, মৌর্য্যরাজগণের সময়, অথবা হর্ষবর্দ্ধনের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবস্থা ছিল বাংলায় পালরাজগণের সময় সে অবস্থা ছিল কি? এ সকল না জানিয়া টিপ্পনীকাটা সঙ্গত নহে। *

যাহা হউক, ইহা লইয়া সময় নষ্ট করা অনাবশ্যক। সুবর্ণবণিকগণ সমাজে নিগৃহীত হইয়া প্রায় চারি শত বৎসর একটু সঙ্কুচিতভাবে দিনযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বঙ্গদেশ ধন্য হইল, তাঁহার হরিনাম প্রচারে বাংলার আচণ্ডাল সকলেই ধন্য হইল। হরিনামের মাহাত্ম্যে মূর্খ, নীচ, দরিদ্র, ধনী সকলেই যেন নবজীবন লাভ করিল। এই নবধর্ম্মের প্রধান প্রচারকর্ত্তা প্রভু নিত্যানন্দ। তাঁহার ন্যায় প্রেমভক্তির প্রচারক পৃথিবীর ইতিহাসে অল্পই দেখা যায়। তিনি সুবর্ণবণিককে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরম ভাগবত উদ্ধারণ দত্ত তখন সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক-

---

* কালক্রমে মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত সাধনপন্থায় "আবর্জ্জনা" প্রবেশ করিলে তাহা "ক্রিয়াহীন" হয় না, বরং ভাবহীন হইয়া ক্রিয়া বাহুল্য হয়। দেড় সহস্র বৎসর পরে "ক্রিয়াহীন" "ছল" ধরার প্রকৃত কারণ স্বার্থপরতা এবং ক্রোধ। সুতরাং "ক্রিয়াহীন" কথাটা প্রবন্ধ লেখকের স্বমত কল্পনা অনুযায়ী নয় কি? (সম্পাদক)

দিগের মধ্যে ধনে মানে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের কৃপায় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অর্থ সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তদবধি সুবর্ণবণিকগণ সকলেই প্রায় বৈষ্ণব। যদিও সিংহবাহিনীর পূজাও তাঁহারা করিয়া থাকেন তাহাও বৈষ্ণব মতে। এই চারিশত বৎসর মধ্যে কত কত ভক্ত ও সাধক এই শ্রেণীর মধ্যে জন্মিয়াছেন।

এই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ মিতব্যয়ী। কিন্তু পর্ব্ব ও উৎসবাদি উপলক্ষে মুক্ত হস্ত। মিতব্যয়ী ও মিতাচারী বলিয়া পুরুষানুক্রমে জাতীয় ধন সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদিও সুবর্ণবণিকেরা সংখ্যায় অল্প, তথাপি তাঁহাদিগকে বাংলার ধনকুবের বা লক্ষ্মীর বরপুত্র বলা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা আলস্য ছাড়িয়া নিজের চেষ্টায় জীবিকানির্ব্বাহ করিতে উদ্যোগী। এই জন্য প্রায় সকলেরই অবস্থা উন্নত। এই শ্রেণীর মধ্যে নিরন্ন লোকের সংখ্যা অল্প।

এই শ্রেণীর ৺রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বহু নিরন্ন লোককে প্রত্যহ অন্নদান করিয়া থাকেন। এই কাঙ্গালী ভোজনের সুব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই তৃপ্তি-লাভ করেন।

সুবর্ণবণিকের উপাধি মধ্যে আঢ্য, মল্লিক, শীল, পোদ্দার, দে, বড়াল, দত্ত প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়।

সম্বন্ধ নির্ণয় নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের একস্থানে সুবর্ণবণিক প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

"কি কহিব নিত্যানন্দের জাতের পরিপাটী।
উদ্ধারণ দত্ত সোনারবেনে যার ডা'লে দেয় কাটী॥"

এই বচনটি চৈতন্য ভাগবতের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রিত চৈতন্যভাগবতে এবচনটি দেখা যায় না। বোধ হয় সাধারণ প্রবাদ হইতে এই বচন সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে এবিষয় জানিয়া লইবার সুবিধা হইত। পাঠকগণের মধ্যে কেহ যদি ইহার সন্ধান দিতে পারেন অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বি-এ)

প্রায়শ্চিত্ত

—•—

দশম

নিশ্চল প্রস্তর প্রতিমার মতো ললিতা বসিয়া ভাবিতেছিল। তাহার হৃদয়ের তারে শত ঝঙ্কারে যেন বাজিতেছিল,—

গেল, গেল ঐ নিখিল ভুবন, আঁখি আগে মিলাইয়া,
দ্যুলোক, ভূলোক, সব একাকার, একি ছায়া, একি মায়া।
চির ঈপ্সিত, প্রিয়ের মুরতি, মোহন মাধুরী ধরি'
অই যে উঠিল জাগি,'
ওগো চিরদিন বিরহিনী হিয়া, তোমারি মিলন লাগি',
রয়েছে বসিয়া তব প্রতীক্ষায়
আমি তো সে-কথা বুঝিনিকো হায়,
তবে আর কেন, মিছে অভিমান, সব আজি হোক্ দুর,
দর্প, গরব. সরম, ভরম, সব আজি হোক্ চুর।

ললিতা প্রথমে মনে করিল,একথা গুলি কবির কল্পনা—ভাবের আতিশয্য মাত্র, বাস্তবের সহিত ইহার যোগ কই? কিন্তু তাহার বুকের মধ্যে বসিয়া, চুপে চুপে, অথচ বেশ জোরের সহিত কে যেন বলিতে লাগিল, ওগো, ইহা রূপক নয়, মিথ্যা নয়, কিন্তু অতি সরল, সত্য কথা। আমারি বেদনার ইতিহাসকে তুমি লজ্জা ও সঙ্কোচের আবরণ দিয়ে ঢাক্‌বার নিষ্ফল চেষ্টা কোরো না।

ললিতা চঞ্চল হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষে জল আসিল, আবার তাহার কাণে বাজিতে লাগিল,—

বাহিরে তোমার ভোলার প্রয়াস,
গোপন হৃদয়ে পূজার আয়াস,—

ইহার পরিণাম যে শুভ নয়,ইহা ধ্রুব সত্য। বিস্মৃত,পরিত্যক্ত রতিকান্ত কেন আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে বিচলিত করিল। সে তো কর্ত্তব্যের চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, হঠাৎ আবার একি বাধা উপস্থিত হইল?

এই দুই দিনে রতিকান্তর সহিত যতবার তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইয়াছে সে চক্ষে যেন কি এক বেদনার ভাব। সে পরিস্ফুট দেখিয়াছে। "ললিতা কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করিবার সময় যেন মনে হইয়াছে, সে কণ্ঠস্বরে আরো কত প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ললিতা কিন্তু তাহার উত্তরে একটি ছোট্ট "হ্যাঁ" কথা বলিয়াই সারিয়াছে, অথচ তাহার সে উত্তরে যে কত উত্তর লুকান ছিল, তাহা কি রতিকান্ত বুঝিতে পারে নাই?

রতিকান্তর সহিত যদি সমস্ত জড়তা ও সঙ্কোচ কাটাইয়া সরল ভাবে সে মিশিতে পারিত—কথাকর্ত্তা কহিত, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যেকার জটিল ভাব দূর হইয়া যাইত, কিন্তু তাহা তো হয় না।

কেন রতিকান্তকে দেখিলে ললিতার বক্ষের স্পন্দন অস্বাভাবিক দ্রুত হইয়া পড়ে, শিরার রক্ত স্রোত উপচিয়া যেন চোখে মুখে আভা ফুটাইয়া তোলে, আর সেই সঙ্গে রতিকান্ত জড়িত অতীতের খুটি নাটি প্রত্যেক ঘটনার কথা মনে পড়ে?

ললিতা নিমেষে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন ভাবিয়া লইল, এমনি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে এক জনের চিন্তাকে স্থান দিয়া বাহিরে লোকসমাজে সে অপরের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহার গৃহের গৃহিণী—পুত্র কন্যার জননী হইবে। দাম্পত্যজীবনের অভিনয় যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহার ত্রুটি করিলে চলিবে না, অথচ এ কপটতার জন্য স্বর্গের দেবতার নিকট বড় রকম জবাবদিহি—পাপপুণ্যের দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, সমাজ অবশ্য ইহার কোনো কৈফিয়ৎ কোনো দিন চাহিবে না। ভিতরে তোমার যত বিরোধ, যত বড় দ্বন্দ্বই চলুক, উহার খবর সে রাখিতে চায় না, সে চায় উপরের শান্ত ভাব, বাহিরের দিকটি সুন্দর, হইলেই চলিবে।

আর একটা মস্ত বড় কৈফিয়ৎ নিজেরই অন্তর নিবাসী অন্তর দেবতার নিকট দেওয়া চাই। তাঁহাকে ফাঁকি দিবার সাধ্য কারো নাই, অথচ তাঁর আদেশ মানিবার মতো শক্তি ও সংযম দুর্ব্বল মানুষের আছে কই? একি নিগূঢ় সমস্যা আজ ললিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার সমাধান করিবার মতো বিচার শক্তি সংসারানভিজ্ঞ তরুণী কোথায় পাইবে?

সিড়িতে দুপ দাপ করিয়া তিন চারি জোড়া জুতার শব্দ, ও কলহাস্যধ্বনিতে ললিতার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়া তাড়ি বই খানি লুকাইয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল। অমিতা, শুচিতা ও জ্যাঠাইমা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

জ্যাঠাইমা কহিলেন, থাকো তো খুব নাক ডাকাচ্ছিস্, ওঠ্ ওঠ্ সন্ধ্যে হোতে না হোতেই ঘুমে বেহুস।

থাকো চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল, ঘুমোব কেন জ্যাঠাইমা, ললিতে সুর কোরে ছড়া পড়ছিল আমি শুয়ে শুয়ে তাই শুনছিলুম, একটুক্ তন্দ্রার ঘোর এসেছিল মাত্তর, উঠে জায়গা করি, মেয়েদের খেতে দাও।

থাকো উঠিয়া পাশের ঘরে আহারের স্থান করিতে গেল, অমিতা ললিতাকে ঠেলা দিয়া কহিল, বিশুকে আর রতিবাবুকে ধোরে এনেছি, আমাদের সঙ্গে খাবেন।

শুচিতা কহিল, মাথা ছাড়লো ললিতা ? খাবি চল্।

ললিতা বলিল, সে দুধ ছাড়া আর কিছু আজ খাইবে না।

শুচিতা অমিতা আহার করিতে চলিয়া গেল। তাহাদের গল্প ও হাসির শব্দ দেয়ালের আড়াল ভেদ করিয়া, ললিতার কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল। সবার কণ্ঠস্বরকে অতিক্রম করিয়া রতিকান্তর কথাগুলি প্রতিবারে তাহার বক্ষের মধ্যে কি এক স্পন্দন তুলিতে লাগিল। মানুষের কণ্ঠস্বরেও কি বৈদ্যুতিক শক্তি আছে ?

আহারান্তে অমিতা আসিয়া ললিতাকে তাস খেলিবার জন্য ডাকিল, জ্যাঠাইমা মেয়েকে ধমক দিয়া কহিলেন, তোর কাণ্ড জ্ঞান নেই অমি, ওর অসুখ কোরেছে ও তাস খেলতে যাবে ? ভালো ধিঙ্গী হয়েছিস্ যা হোক।

অমিতা চলিয়া গেল. ললিতা, জ্যাঠাইমার এ ওকালতীতে খুসী হইল, যেহেতু পীড়াপিড়ীকে এড়াইবার শক্তি তাহার মোটেই ছিল না, অথচ তাস খেলিবার বা খেলা দেখিবার মতো মনের অবস্থাও তাহার এখন নয়।

একাদশ

মানুষ আপনার দেশে ঘরের গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া আপনার ক্ষুদ্র সংসারটির মধ্যে আত্মীয় স্বজনকে লইয়া এক রকম নিশ্চিন্ত মনে বাস করে, নিছক পরের সহিত মেলা মেশার সুযোগ বা উপদ্রব তাহার দুয়ারে বড় একটা আসিয়া জোটে না। কিন্তু সেই গণ্ডী ছাড়িয়া, যখন মানুষ বিদেশের পথে বাহির হয়, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখে, এই নিছক পর চির অপরিচিত

লোকগুলাও দু'একদিনের আলাপেই বেশ আপনার হইয়া যায়। মানুষের সহিত মানুষের এই যে সহজ স্বাভাবিক যোগ, ইহাতে কি আমরা বুঝি না যে এক পরমাত্মা হইতেই এই প্রতি মানব আত্মার উদ্ভব, স্থিতি ও পরিণতি।

বিন্ধ্যাচলের ধর্ম্মশালায় তিনটি বাঙালী ও দুইটি হিন্দুস্থানী পরিবার তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছেন, কয়দিনে সকলের মধ্যে বেশ একটি সদ্ভাব স্থাপন হইল, ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কাহারো মনে রহিল না, একত্রে গঙ্গাস্নান, দেবীদর্শন, পর্ব্বত ও বন ভ্রমণ সকলে মিলিয়া মিশিয়া করিতে লাগিলেন। আর হরদাদার সরল হাস্যকৌতুকে, প্রাণঢালা কথাবার্ত্তায় সকলে এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করিয়া প্রবাস ভ্রমণের স্মৃতিকে মনের মধ্যে চির মুদ্রিত করিয়া লইতে লাগিলেন। কমলা সত্যই আনন্দিত হইয়া রতিকে কহিল, অজানা, অচেনা বিদেশে বেরোবার নামে আমার বড় ভয় হোতো ভাই কিন্তু এখানে যে এ ত আনন্দ পাওয়া যায়—এমন কোরে সকলের সঙ্গে ভাব হোয়ে, মনে হয় যেন এঁরা পর নয়—আমাদেরই একগ্রামের লোক।

রতিকান্ত কহিল, তোমাদের জন্যই ভগবান এ আনন্দটা বিশেষ কোরে সৃজন কোরেছেন। আমরা তোমাদের মতো অতো সহজভাবে মিলে মিশে, পরকে আপনার কোরে নিতে পারি না, দিদি!

অমিতা আসিয়া কহিল, বেড়াতে যাবেন না কমলা দি? কাকামণি এলাহাবাদ থেকে দরোয়ানকে পাঠিয়েছেন, আমাদের কালই ফিরতে হবে, আজকের দিনটা বেড়িয়ে নিই। মা, বড়দি, সব বেরিয়েছেন, আপনারা আসুন।

নরেন্দুর সহিত বিশুর বনিয়াছিল বেশ, সে কুকুরটিকে লইয়া আগেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। হরদাদা সেদিন দেবীমন্দিরের প্রাঙ্গনে সাধু দর্শনে গিয়াছেন। বিন্দু ও ধর্ম্মশালার আরও অনেকে মিলিয়া হরদাদার সঙ্গ লইয়াছিলেন।

কমলা রাস্তায় বাহির হইয়া অমিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ ললিতা কেমন আছে? অমিতা কহিল, ভালই আছে, ব্যাধিটা তো ঠিক্ শারীরিক নয়—অমিতা থামিয়া গেল, রতিকান্তর সহিত তাহার চোখাচোখী হইল, রতিকান্তর বুকে যেন একটা মোচড় পড়িল।

কমলা রতিকান্তর সহিত ললিতার বিবাহের প্রসঙ্গ জানিত। সেদিন ললিতার জ্যাঠাইমার সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়া কথাক্রমে তাঁহার নিকট নরেন্দুর

সহিত ললিতার আশু বিবাহের কথাও শুনিয়াছিল। জ্যাঠাইমা বলিয়াছিলেন, বেচে থাক রতি, হীরের টুক্‌রো ছেলে, ওর জন্যে কনের ভাবনা কি মা। আজ কাল যে রকম পাত্তরের বাজার! অমিতার জন্যে আমার বড় ভাবনা, মেয়ের রং ময়লা, তাতে যে দস্যি।

কমলার তিনটি ভ্রাতাই রূপে গুণে, কুলে মানে আদরনীয়। রতিকান্তর যে পরীর ন্যায় পাত্রী জুটিবে ইহা কিছু স্তুতি বাক্য নয়, সুতরাং ললিতার সহিত বিবাহ না হওয়াতে সে মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তবে মেয়েগুলির স্বভাবে সে মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ললিতার ও রতিকান্তর মধ্যে যে প্রণয় বলিয়া একটা ব্যাপার ঘটিয়া বসিয়া আছে এ সন্দেহ কমলার হয় নাই। ছেলেমানুষ রতি যে এই বয়সে ভালবাসার মারপ্যাঁচ শিখিয়াছে, স্নেহশীলা দিদির তাহা মনে হয় নাই। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদের চক্ষে, কনিষ্ঠ ভাইয়ের যৌবন সুলভ ব্যবহার সহজে বুঝি চোখে পড়ে না!

পথে সকলে একত্র হইল, একটি ক্ষেতে কয়েকজন লোক, ছোলার গাছ ও মটর শুটি তুলিতেছিল। বাবুরাম পাণ্ডা তখন ষ্টেশন হইতে কয়েকটি নূতন যাত্রী সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে ছিল। সে কহিল, খোঁকাবাবু বুট খাবেন? এ হামার খেত আছে, যেত্‌না ইচ্ছা আপ লোক খান্, তাজা বুট বড়া মিঠা লাগবে বাবুজী।

অমিতা ও বিশু উল্লাসের সহিত অগ্রসর হইয়া ক্ষেতে নামিয়া পড়িল। অমিতা কহিল, কিনে তো খাই, কিন্তু ক্ষেত থেকে এমন কোরে নিজের হাতে তুলতে কি ভালই লাগছে, এস বড় দি, ছোট দি—ও, তোমাদের বুঝি লজ্জা হোচ্ছে? শুচিতাও যোগ দিল। কমলা কহিল, খোলা জায়গায় এমন কোরে বেড়াতে বাস্তবিকই বড় আনন্দ হয়, না শুচিতা? শুচিতা হাসিয়া কহিল, সে কি একবার কোরে? এই তীর্থস্থান গুলি আছে বোলেই বাঙালীর মেয়েরা বেচে আছে, কালে ভদ্রে তবু এখানে এসে নিশ্বেস ফেলে বাঁচে।

অমিতা কহিল, কিন্তু পুরুষরা কি স্বার্থপর! তারা নিজেরা সমস্ত পৃথিবীর আলো, বাতাস, শোভা, সৌন্দর্য্য যা কিছু সব আশ মিটিয়ে ভোগ কোরছে, আর মেয়েদের জন্যে খাঁচার বন্দোবস্ত, সে খাঁচার ফাঁক দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারলেই অমনি লগুড়ের ব্যবস্থা।

রতিকান্ত হাসিয়া কহিল, কড়াই শুটি খেতে খেতে বেশ তো সমাজ

নীতির চর্চ্চা কোরতে লেগেছ। তা আমাদেরও দু' চারটে ছুঁড়ে দাও, কি বলেন নরেন্দু বাবু ?

অমিতা দু'একটা গাছ রতিকান্তর দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, 'মিষ্টার সরকার সাহেব মানুষ তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিকট মুখভঙ্গী কোরে চর্ব্বণ কার্য্যে নিযুক্ত হোয়ে অসভ্যতার পরিচয় দিতে রাজী নন, ছোটদিও তাই।

রতিকান্তর সম্মুখে এ বিদ্রূপ ললিতার যেন অসহ্য বোধ হইল, সে মনে মনে অমিতার মুণ্ডপাত করিয়া গম্ভীর মুখে দাড়াইয়া রহিল। বিশু কিন্তু নরেন্দুর জন্য যথেষ্ট ছোলা ও কড়াই শুটি সংগ্রহ করিয়া নরেন্দুকে উপহার দিল। নরেন্দুও হাসি মুখে সে গুলির সদ্ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। শুচিতা কয়েকটা কড়াই শুটির ছোট ছোট নীল রঙের সুন্দর ফুল তুলিয়া, সকলকেই উপহার দিল। এমন সময় হরদাদা আসিয়া মৌনী সাধুর কথা বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। তিন বৎসর যাবৎ সাধু কাহারো সহিত কথা না কহিয়া, নীরবে আপনার সাধনায় নিযুক্ত আছেন, একবেলা স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া আহার করেন, কোনো কিছু আবশ্যক হইলে কাগজে লিখিয়া মন্দিরবাসী কাহাকেও জানান। সকলেই এই সাধুর বাক্ সংযমে বিস্মিত হইয়া পরদিন সাধু দর্শনে যাইবার অভিপ্রায় জানাইল— কেবল মুখরা অমিতা কহিল, ইচ্ছে কোরে, কথা বলবার আনন্দ হোতে যে নিজেকে বঞ্চিত কোরেছেন তাঁকে আমি দূর থেকেই নমস্কার করি। ভগবানের দান বাক্‌শক্তির এতো বড় অবমাননা শ্রদ্ধার চোখে তো আমার মতো দুষ্ট মেয়ে দেখতেই পারে না। শুচিতার এক ধমকে অমিতা আর বেশী কিছু বলিল না।

দ্বাদশ

একটি বড় বাগানের মধ্যে সকলে ঢুকিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ললিতা ঘাসের মধ্যে হেঁট হইয়া কি যেন আগ্রহের সহিত খুঁজিতেছে দেখিয়া রতিকান্ত কাছে আসিয়া কহিল, কিছু হারিয়েছে বুঝি ?

ললিতা নত মস্তকে মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমার ব্রোচটা কোথায় পড়ে গেল।

রতিকান্ত খুজিতে আরম্ভ করিল, ললিতাও নিশ্চেষ্ট রহিল না। কিন্তু তার বক্ষের স্পন্দন ঠিক আর সহজ ভাবে হইতেছিল না, হঠাৎ রতিকান্ত, ব্রোচটি পাইয়া, হাসি মুখে ললিতাকে কহিল, এই দেখ, আমি পেয়েছি।

ললিতা সানন্দে হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল, কাঁধের উপর গুজিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, রতিকান্ত কহিল, এসো আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। রতিকান্ত ব্রোচটি লাগাইয়া দিল। ব্রোচটি লাগাইবা মাত্র, ললিতা ধন্যবাদ যুক্ত একটি কথাও না বলিয়া, রতিকান্তর মুখের দিকে একবার না চাহিয়া, দ্রুত পদে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। অমিতা ললিতারই খোঁজে আসিতে ছিল, ললিতাকে দেখিয়া কহিল, কোথা ছিলে ছোট দি? আমি আবার খুজতে এলুম। যে প্রকাণ্ড বাগান, খুঁজে, বার করা দায়।

ললিতা কহিল, ব্রোচটা হারিয়ে ছিল তাই খুজতে এসেছিলুম। এদিক দিয়ে যাবার সময় বোধ হয় পড়ে গেছলো, রতিবাবু খুজে দিলেন।

অমিতা হাসিয়া কহিল, মিষ্টার সরকার সেটা জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন, না?

ললিতা হাসিয়া চলিয়া গেল, কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু সে হাসিতে চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। অমিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উহা এড়াইল না, সে মনে মনে কহিল "তোমার মনের কথা আমি সব বুঝতে পারছি, আমায় তুমি ঠকাতে পারবে না ছোট দি. আর যে ঠকবে, সে ঠকুক।

অমিতা ললিতার অনুসরণ করিল না, রতিকান্ত যেখানে দাঁড়াইয়া অদূরে নীল আকাশে মেঘের স্তরের ন্যায় ধূসর বর্ণ বিন্ধ্যপর্ব্বত শ্রেণীর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া সম্ভবতঃ উহার গাম্ভীর্য্য অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল সেই খানে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রস্তরাসনের উপর বসিয়া পড়িয়া, কহিল, উঃ বেড়িয়ে, বেড়িয়ে পা দুটো ধরে গেছে, একটু বসে নি, আসুন রতিবাবু, দুটো গল্প করা যাক্। ও হাজার পাহাড় দেখে কবির ভাবে হৃদয়কে ঝোঝাই কোরে তুলুন কিন্তু ছন্দ টন্দ আপনার কলম থেকে বেরুবে না।

রতিকান্তও বসিল। কহিল, অমিতা তুমি তেমনি দুষ্টুই আছ একটুও বদলাওনি! বেশ আনন্দে দিন কাটাচ্ছ—

অমিতা বাধা দিয়া কহিল, আপনার হিংসে হচ্ছে নাকি? আচ্ছা বলুন তো মশাই, আপনি এবারে এত গম্ভীর কেন? বাগানে এসেছেন বেড়াতে তা একটুও বেড়ান নি, এইখানে দাঁড়িয়ে বুঝি নিভৃতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাসনা করছিলেন? রতিকান্ত হাসিল—উত্তর দিল না, বালিকা অমিতাকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে, তাহার জীবনের গতি ঘটনা সূত্রে কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অমিতা আবার কহিল, আচ্ছা রতিবাবু, সেই উপাসনার মধ্যে যদি ভালবাসার পাত্র কাউকে এনে দাঁড় করানো যায়, তা হোলে সে উপাসনা কি খুব প্রাণস্পর্শী হয় না ?

রতিকান্ত এবার কথা কহিল, "অমিতা তুমি ঠাট্টা তামাসাটা খুব শিখেছ, কথায় তোমার সঙ্গে এঁটে উঠা ভার। জ্যাঠাইমা আমায় তোমার জন্যে বর খুঁজতে বলেছেন, তুমি এক কাজ করো, আগেকার রাজকন্যাদের মতো পণ কোরে বোসে থাকো, যে তোমায় কথায় হারাতে পারবে, তার গলায় মালা দেবে।"

অমিতা কহিল, এই যে আপনার মুখে বুলি ফুটেছে, আপনাকে দেখে আর সে রতিবাবু বোলে চেনবার বো ছিল না, স্ফূর্ত্তি নেই মুখে সে কথার ফোয়ারা নেই, সে হাসি নেই, যেন হঠাৎ সংসারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বুড়িয়ে গেছেন। তা দেখুন রতিবাবু আমি কিন্তু আর একটা নতুন বিদ্যে শিখেছি, হাত গুণে মনের কথা বোলে দিতে পারি, হয় না হয় পরীক্ষা কোরে দেখুন।

রতিকান্ত যেন থত-মত খাইয়া গেল, হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না।

অমিতা আবার কহিল,দেখি আপনার হাত, আচ্ছা—হাত দেখতে হবে না, মুখ দেখেই বলছি ; আপনি এখুনি ভাবছিলেন, ললিতার ব্রোচটা খুঁজে দিলুম, তা সে মুখের একটা সহজ সাধা বুলি, ধন্যবাদটাও উচ্চারণ করলে না, মেয়েগুলো এমনি অকৃতজ্ঞ। বলুন দেখি, এই কথাই আপনি ভাবছিলেন কি না ?

রতিকান্ত ফাঁপরে পড়িল, তাহার মন, বুকের মধ্যে বসিয়া এই রকমই কি কতকগুলা ফিস্ ফাস করিতেছিল, বরং এর চাইতে আরও কত বেশী। অতীতের স্মৃতিকে বর্ত্তমানে টানিয়া আনিয়া, তাহারও সমালোচনা করিতেছিল। সহসা একটা কৌতূহল সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা!, ললিতার মনের কথা গুণে বলতে পারো ?

অমিতা বুঝি এই সুযোগই খুজিয়া ফিরিতেছিলে। বেশ গম্ভীর ভাবেই কহিল, তার মনের কথা বড় জটিল, নিজের মনের গোপন কথা সে নিজেই জানে না, কিন্তু আমি কতকটা খবর জানি রতিবাবু, নিজেকে পোড়াবার জন্যে, নিজেরই অন্তরে সে ইন্ধন জ্বালিয়েছে—এক দিনে দু'দিনে জ্বলে মরবার জন্যে নয়, বছরের পর বছর ধোরে সারা জীবন জ্বলে মরবার ব্যবস্থা। যে পরকে ঠকায় সে ভাল লোক নয়, সে জোচ্চোর প্রতারক বটে, কিন্তু যে

মানুষ আত্ম-প্রতারণা করে, তার কি কোনো বিশেষণ নেই, সে কি আরও ভয়ানক লোক না?

রতিকান্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল, অধীর কণ্ঠে কহিল, কি বোলছো অমিতা, আমি তো কিছুই বুঝছি না।

অমিতা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, আবেগভরে কহিতে লাগিল, সে ভালবাসার অভিনয় কোরতে চায়, কিন্তু সে অস্বীকার করলেও আমি জানি সে আজও আপনাকে সেই রকমই ভালবাসে, অথচ বাবার ইচ্ছায় নরেন্দুকে বিয়ে কোরতে প্রস্তুত হয়েছে। কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে, হৃদয়ের বিরুদ্ধে এতো বড় অন্যায় করা আমার ভাল বোলে মনে হয় না। মিষ্টার সরকারকে সে অন্তরের সহিত কখনো ভালবাসতে পারবে—আর আপনাকে যে একেবারে ভুলবে তা তো বিশ্বাস হয় না—অমিতা বোধ হয় আরও কিছু বলিত, কিন্তু রতিকান্তর বিবর্ণ মুখ মণ্ডল তাহাকে চমকিত করিল।

অমিতার কথা গুলা রতিকান্তর বক্ষের শোণিত প্রবাহকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সে কাতরকণ্ঠে কহিল, কি পাগলামী কোরছো অমিতা, ছেলেমানুষ তুমি, এ রকম বাজে মিথ্যা কল্পনার ফল যে কি রকম দাড়াবে—

অমিতা উদ্যত ফণিনীর মত উঠিয়া দাঁড়াইল, রুক্ষকণ্ঠে কহিল, অমিতা দুষ্টু চঞ্চল কিন্তু সে মিথ্যা বলে না, খুব স্পষ্ট কথা, সত্য কথাই সে বলে। তাতে যা হবার হোক্—এটা মনে রাখবার চেষ্টা কোরবেন।

অমিতা দ্রুতপদে চলিয়া গেল, রতিকান্ত অমিতার দিকে চাহিয়া স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

পাটকেবাড়ী*

—০—

১৩১৪ সালে গোবরডাঙ্গার বাড়ীতে অবস্থিতি কালীন আমার নিকট এই ঘটনাটি উপস্থিত হয়। কত সময় ঘটনার মধ্যে ভগবানের উজ্জ্বল হস্ত দেখা

---

* গতবারে "একটি ধর্ম্মবন্ধুর কথা" এবং এই "পাটুকেবাড়ী" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের মনে হইতে পারে যে, ইহাতো সেই "দাসের আত্ম-কথা'রই পুনরাভিনয়। বাস্তবপক্ষে আত্ম-কথার শেষ অংশ যেরূপ সংক্ষেপে শেষ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে কোন কোন উপকৃত ধর্ম্মবন্ধু বা ব্যক্তি অথবা ঘটনার দ্বারা এ জীবনপথে যে উপকার ও আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা জ্ঞাতসারে অপ্রকাশ রাখা নিতান্ত অকৃতজ্ঞের কায। দ্বিতীয়, যে ঘটনায় নিজে আনন্দিত হইয়াছি তদ্দ্বারা যদি অন্যের প্রাণেও সদ্ভাব ও আনন্দের উদ্রেক করা যায় তাহার চেষ্টা করাও একান্ত কর্ত্তব্য।　　দাস—

যায়। তাঁহার ইঙ্গিত অনেক ঘটনার দ্বারা প্রকাশ পায়। অবশ্য ইহা প্রত্যেক জীবনের পক্ষেই ঘটে, কিন্তু ঈশ্বরে যাঁহার অটলবিশ্বাস তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন। ঈশ্বর-দর্শন, ঈশ্বর বিশ্বাসের ফল। ইহা ধ্রুব সত্য।

"ঈশ্বর-দর্শন" শব্দ শুনিয়া হয়তো অনেকে বিস্মিত হইবেন। হইবারই কথা। কিন্তু এই বিস্ময় অবিশ্বাসের নামান্তর মাত্র। বিশ্বাসী ব্যক্তিই ঈশ্বরবিশ্বাসের মহিমা দর্শন করিয়া তাহার নিগূঢ় রহস্যভেদ করিতে সক্ষম হন। বিশ্বাসবলে জগতে অসাধ্য সাধিত হইয়াছে, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে।

ভগবানের দর্শন লাভ হইলে, তাহার সাক্ষ্য দান না করিয়া মানুষ নিস্তব্ধ থাকিতে পারেনা—পারা অসম্ভব। পক্ষান্তরে এই সাক্ষ্যদান কখনই ব্যর্থ হয় না। মানবান্তর হইতে মানবান্তরে বিশ্বাসের শক্তি সংক্রামিত হইয়া থাকে।

১৮ই বৈশাখ কলিকাতা হইতে আসিয়া শুনিলাম, আমাদের প্রতিবাসী পরলোকগত রাধানাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাকরি করিতে গিয়া বৎসরাধিককাল হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বাড়ীতে তাহার অল্পবয়স্কা স্ত্রী আর একটি শিশু পুত্র আছে মাত্র। অর্থাভাবে তাহারা নিরুপায় এবং দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাটুকেবাড়ী গ্রামে এক জমিদার যুবকের সহকারী কর্ম্মচারী হইয়া বাদল সেখানে আছে। কিন্তু বারম্বার পত্র লিখিয়া কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার বাবুকে পত্র লিখিয়া তদুত্তরে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, বাদল তাহার মনিবের নিকট একবৎসর হইতে মাহিনা পায় নাই, সেইজন্য রিক্ত-হস্তে বাড়ী যাইতে পারিতেছে না।

এই অবস্থায় এখান হইতে কেহ সেখানে গিয়া স্বচক্ষে অবস্থা দর্শন এবং তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক ফিরাইয়া আনা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। কিন্তু প্রতিবাসী সকলেই নিজ নিজ কাযে ও অবস্থায় আবদ্ধ। এ কাযে যাইবার মতো কাহাকেও পাওয়া যায় না।

স্বর্গীয় রাধানাথ মুখোপাধ্যায়কে আমরা 'রাধ্‌দা' বলিতাম। সুতরাং বাদল আমাকে কাকা বলে। আসল কথা নিতান্ত স্নেহ-ভাজন প্রতিবাসী। দেওয়ান বাটীর শ্রীমান্ নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় (যাহাকে সকলে "ফটিক" নামেই জানেন) আমাকে আসিয়া বৌটীর "কান্না-কাটীর" কথা বলিয়া বলেন যে, "আপনি যদি গিয়া বাদলকে আনিতে পারেন, তাহা হইলেই ঠিক হয়।"

আমি শুনিয়াই ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিলাম, ইহা আমার পক্ষে তাঁহার ব্যবস্থা। এই উপলক্ষে তিনি আমাকে কোন নূতন আশীর্ব্বাদ পাঠাইবেন। আমি যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ১৯শে বৈশাখ এই কথা হয়।

২০শে বৈশাখ শুক্রবার বৌ-মা কিছু পাথেয় পাঠাইয়াছেন, যাহাতে আমি আজই যাত্রা করিতে পারি। বিলম্ব না করিয়া আমি তাঁহারই প্রদত্ত পাথেয় লইয়াই রাত্রি ৯টার ট্রেণে যাত্রা করিলাম। গোবরডাঙ্গা হইতে বনগাঁ হইয়া রাণাঘাট গিয়া জানিলাম রেজীনগর ষ্টেশনে নামিয়া পাটুকেবাড়ী যাইতে হইবে। সমস্তরাত্রি ট্রেণেই কাটিয়া গেল, ভোরে রেজীনগর পৌঁছিলাম। গোরুরগাড়ীর সুবিধা না হওয়ায় চলিয়াই ১১টা ১১৷৹ টার সময় সর্ব্বাঙ্গপুর আসিলাম। সেখানে পাটুকেবাড়ীর ঐ জমিদার বাবুদিগেরই তহশীলদার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় থাকেন। তাঁহার বাসায় স্নান-আহার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামকরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। মাট-পথে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের সন্ধান লইয়া সন্ধ্যার সময় পাটুকেবাড়ী পৌঁছিলাম। সমস্তদিনে ৮।৯ ক্রোশের বেশী পথ চলিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জমিদার বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাদল তখন অনুপস্থিত। গ্রামান্তরে বাবুর কার্য্যেই গিয়াছে। যাহাহউক সে-যে এখানেই আছে ইহাতেই পরম আশ্বস্ত হইলাম।

কিছুক্ষণ পরে জল চাহিয়া মুখ হাত-পা ধুইয়া বসিয়া রহিলাম। জল খাবার সামান্য কি আসিয়াছিল তাহা স্মরণ নাই। রাত্রি প্রায় ১০টা কি ১০৷৹টার সময় সাধারণ রকম অন্নব্যঞ্জন আসিল। তাহা কোন রকমে গলাধঃকরণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসার সময় উহাই যথেষ্ট মনে হইল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনুকূল বাবু বাহিরে আসিয়া একবার আমার সহিত আলাপ—কিম্বা আমার তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক মনে করিলেন না। ইহাতে অন্য বিষয় যাহা হউক, বাদলের জন্য একটু ভাবনা হইল।

তারপর শয়নের ব্যবস্থা আরও চমৎকার রকমের হইল। অন্ন দূরে এক দপ্তরখানার আটচালার বারেন্দায় একখানি ছোট সতরঞ্চ আর একটা বালিস দিয়া একজন ভৃত্য, স্থান ও শয্যা দেখাইয়া দিল। শুনিলাম তাহাও বাদলেরই শয্যা। কিন্তু তদুপরি আমার সঙ্গের চাদর বিছাইয়া শয্যা উত্তমই বোধ হইল। অধিকন্তু জায়গাটি যে খোলা মুক্ত বাতাসের মধ্যে পাইলাম—বৈশাখ মাস গরমের দিন, খোলা বাতাস পাইয়া তৃপ্ত হইলাম।

দপ্তরখানার প্রধান গমস্তা শ্রীযুক্ত অটলবিহারী বিশ্বাসের সহিত আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ইনি সহৃদয় ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি। ইহার কথা আজও আমার স্মরণ আছে।

পর দিন বাদল আসিল। আমার জন্য বাগান বাড়ীতে সে নিজে রান্না করিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, অনুকূল বাবুর বাড়ী আমার যাওয়া সুবিধা হইবে না। বাদল যে রন্ধন করিতে বেশ পটু তাহার পরিচয় ২।১ দিনের মধ্যেই পাইলাম।

কিন্তু তাহার মন্তব্য শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম—অবশ্য আমি যে তাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছি—আমাকে দেখিয়াই সে একেবারে চমকিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে বাড়ী যাইবার কথায় যখন বলিল যে, "আপনি ২।১ দিন বিশ্রামকরিয়া বাড়ী যান, আমি শীঘ্রই যাইব।"

তাহার কথা শুনিয়া প্রথমে কি বলিব, যেন আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না,কিন্তু যখন অত্যন্ত তেজের সহিত বলিলাম,"বাদল, তুমি কি বলিতেছ, তুমি কি মানুষ—না অন্য কোন রকম জীব? তোমার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই! তুমি একবৎসরের মধ্যে বাড়ী যাও নাই—একটি পয়সা পাঠাও নাই, তোমার বালিকা পত্নী, শিশু পুত্র না খাইয়া মরিল কি না খবর লও না—এখনও তুমি বলিতেছ, আমি পরে বাড়ী যাইব? এ কথার অর্থ কি বলতো?" তাহাতে বাদল বলিল,—

"আমি এক বৎসর মাহিয়ানা পাই নাই,আমার হাতে কিছুই নাই; ।০ ॥০ আনা খোরাকী পাই মাত্র তাও অনেক দেনা আছে। আমি মাহিয়ানা না পাইলে কিরূপে বাড়ী যাই।"

"তুমি যে মনীবের নিকট মাহিয়ানা না পাও,সে মনীবের কায কর কেন? এমন তো কেহ কখনও শোনে নাই যে, সামান্য কর্ম্মচারীর একবৎসর পর্য্যন্ত বেতন দেন না এবং এ অবস্থায় যে লোক তাহার কায করে সেই বা কিরূপ কর্ম্মচারী! তার কি আর কোনও চাকরী মেলে না? এর মধ্যে আর কিছু কারণ-কথা আছে কিনা তুমি আমাকে খুলিয়া বল।"

এইরূপ নানা তিরস্কার ও প্রবোধবাক্য বলার পর বাদল বলিল,—

"২ মাস ৪ মাস দেখিতে দেখিতে ক্রমে একবৎসর মাহিয়ানা বাকী পড়িয়া গিয়াছে, আশায় আশায় থাকিয়া এইরূপ হইয়াছে,এখন আশা ত্যাগ করিয়াই বা যাই কিরূপে।"

"গ্রামে আরো তো ভদ্রলোক আছেন, কিম্বা অনুকূল বাবুর আত্মীয় স্বজন আছেন,তাঁহাদের বল না কেন যে তুমি এই অবস্থায় বিপদাপন্ন হইয়াছ, তাঁহারা বাবুকে বলিয়া তোমাকে বাড়ী যাইবার উপায় করিয়া দিন্।"

"অনুকূল বাবু কাহারো কথা শুনেন না, গ্রামের কোনও লোক তাহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন না।"

শুনিলাম বাবুটি কেবল বন্যশূকর মারিয়া বন্দুক লইয়া বেড়ান, কোন ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে বড় মেশেন না।

এইরূপ সঙ্কটের মধ্যে অনেক বাদ প্রতিবাদের পর বাদলের মনে একটু উত্তেজনার ভাব আসিল। তারপর কথা হইল মাহিয়ানা পাওয়া না গেলেও আর এ চাকরীতে আবদ্ধ থাকা হইবে না। অতএব বাড়ী যাইবার কথা—বিশেষ তাহাকে লইতে আমি আসিয়াছি বাবুকে বলা হউক।

এইকথা বলার পর অনুকূল বাবু বাদলকে বলিলেন, তোমার হিসাব পত্র দিয়া তুমি যাইতে পার। বাদল হিসাব পত্র বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

হিসাব দেখিয়াই তো আমি আশ্চর্য্য হইলাম। কোন দিন বাবু ২৲ টাকা দিয়াছেন, তাহাতে ঘোড়ার দানা বা সহিসের খোরাকী দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ সামান্য ২৲ ৪৲ টাকার জমা খরচ যাহা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়া গিয়াছে—স্থায়ী তহবিল বাদলের হাতে কোনদিন ছিল না, কিন্তু এখন তাহারই একটা হিসাব দিতে হইবে।

আচ্ছা, তাহাই হউক। যদি এই হিসাব দিলেই অব্যাহতি মিলে সেই ভাল। কিন্তু শুনিলাম সেই হিসাব ২।১ দিনে শেষ হইবে না—আজ একটু কা'ল একটু হিসাব লইতেছেন। বাবুর বেশী সময় নাই। তখন আর কি করিব কাজেই অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। কবে বাদলের ছুটী মেলে।

পাট্‌কেবাড়ী গ্রামখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। অনেক ভদ্রলোকের বাস। ক্রমে আমার সঙ্গে অনেকের আলাপ হইল। পোষ্টাফিস, স্কুল, বাজার গ্রামে আছে। জমিদারদিগের সরীকান বিষয়—একজন ম্যানেজার আছেন, তিনি শিষ্ট শান্ত ব্যক্তি। জমিদার অন্য সরীক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, গ্রামে ভদ্র মণ্ডলী আমার উদ্দেশ্যের প্রতি খুবই সহানুভূতি করিতে লাগিলেন, আমি বাদলকে ছাড়িয়া যেন না যাই সকলেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

ভগবানের কৃপায় আর একদিকে আমার দিন খুব ভালই কাটীতে

লাগিল। এখানে খড়ে নদী—যাহাকে লোকে গঙ্গা বলিয়াই মনে করে। কেবল বালুকাময় এজন্য সেই নদীর জল অতি উত্তম নির্ম্মল। আমি প্রত্যহ প্রাতে নদী-প্রান্তে গিয়া প্রাতঃক্রিয়া-স্নানাদি শেষ করিয়া, অটল বিশ্বাস প্রদত্ত একটু নির্জ্জনস্থানে কিছুক্ষণ বসিয়া, তারপর কিছু জলপান করিয়া (তখন চায়ের অভ্যাস এরূপ হয় নাই) বেড়াইতে বাহির হইতাম। প্রায়ই কোন না কোন ভদ্র-গৃহে সৎপ্রসঙ্গ সঙ্গীতাদি পর্য্যন্ত হইত। এই সূত্রে সাধারণের আগ্রহে একদিন স্কুল-গৃহে একটি বক্তৃতা, এক প্রাতঃকালে ছাত্রদিগকে নীতি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন একদিন জগাইপুর, একদিন চাঁদপুর গ্রামে এক একটি বক্তৃতা দেওয়া হয়। বক্তৃতার বিষয় সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার সংক্রান্তই ছিল।

পাটুকেবাড়ী গ্রামে ম্যানেজার বাবু ও পরেশ বাবু ও অটল বিশ্বাস মহাশয়গণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইয়াছিলেন।

২২শে বৈশাখ হইতে ৫ ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত পাটুকেবাড়ী থাকিয়া অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের পর বাদলকে উদ্ধার করিতে পারিয়া একটি বিশেষ আত্ম-প্রসাদ লাভ হইয়াছিল। বাদল এক পয়সা মাহিয়ানা পাইল না, তাহার মনীবের ব্যবহারের কথা আর লিখিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু সমস্ত ঘটনার মধ্যে ভগবানের করুণা উজ্জলরূপে দৃষ্ট হওয়ায় আমার মনে কোন ক্লেশেরই কথা স্থান পাইল না। বাদলের সামান্য জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া ট্রেণভাড়া দিয়া আমরা বাড়ী পৌছিলাম। বাদল যে প্রকার লুব্ধ আশায় মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে এত বাধা অতিক্রম করিয়া যে তাহাকে ফিরাইয়া আনা যাইবে কত সময় আমি তাহাতে সন্দিহান হইয়াছিলাম কিন্তু ভগবৎ কৃপাতেই যখন তাহার মনের সকল জড়তা মোহ কাটিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগ্রত হইল,তখনই উহার বাড়ী ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হইল। কিন্তু আমি এই ঘটনায় বিলক্ষণ বুঝিলাম টাকার মোহে মানুষের কি ভয়ানক বুদ্ধি বিভ্রম ঘটিয়া থাকে।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার বেলা ৩টার সময় পাটুকেবাড়ী হইতে বাহির হইয়া ৭ ক্রোশ পথ চলিয়া রাত্রি ১১॥ টার সময় পলাসী ষ্টেশনে আসিয়া আমরা ট্রেণ পাইলাম। রাত্রি ২॥০ টার সময় রাণাঘাট পৌছিয়া ভোর ৪॥০ টায় রাণাঘাট হইতে ৬টার সময় বনগাঁয় এবং ৭টার মধ্যে গোবরডাঙ্গায় পৌছিলাম।

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

—o—
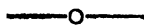
যুদ্ধ কবে শেষ হইবে?—যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, সকলেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ক্লেশ আর সহ্য হইতেছে না, ভরণ পোষণের ক্লেশ অসহনীয় হইয়াছে, পৃথিবীর লোকক্ষয় হইতেছে, সুন্দরদেশ সকল শ্মশান হইতেছে, তাই সকলেই ইহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, কবে যুদ্ধ শেষ হইবে। যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না, তবু শীঘ্র শেষ হইবে, ইহা শুনিলেও আনন্দ হয়, তাই কতিপয় প্রধান লোক যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইংলণ্ডের সমর মন্ত্রিসভার সভ্য লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন,—সম্ভবতঃ ১৯২০ সালের ডিসেম্বরের পূর্ব্বে যুদ্ধ শেষ হইবে না।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এই, শীঘ্রই চরম যুদ্ধ হইবে কিন্তু যুদ্ধের জের মিটিতে দুই বৎসর লাগিবে। তিনি বলিয়াছেন, জর্ম্মণ সম্রাট আগামী আশ্বিনমাসের পূর্ব্বেই এমন যুদ্ধ করিবেন, যাহাতে জয় পরাজয় নির্দ্দিষ্ট হইবে।

লর্ড লেভার হুলসে বলিয়াছেন,—যুদ্ধ আরও ৩ হইতে ৫ বৎৎরের মধ্যে শেষ হইবে। ইহার অগ্রে কখনও শেষ হইবে না।

ক্যানন ডরলি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। তিনি বলিয়াছেন,—রুষিয়ার পতনে যুদ্ধ যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

লর্ড লোরবরণ ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব লর্ড চেন্সেলার। ইনি বলিয়াছেন,—যুদ্ধ অনেক দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে, এখন ইহা শেষ হইবে।

আরলণ্ডের হোমরুলের পরমবৈরী সার এডওয়ার্ড কারসন বলিয়াছেন,—যত দিন জর্ম্মণেরা আপনাদের অপরাধ স্বীকার না করিবে, তা এক বৎসর হউক, কি তিন বৎসর হউক, ততদিন যুদ্ধের নিবৃত্তি হইবে না।

অক্সফোর্ডের গ্রীক্‌ভাষার অধ্যাপক মরে বলিয়াছেন,—ভবিষ্যদ্বাণী করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কখন কি বিপদ ঘটে, কে বলিতে পারে? কিন্তু যদি আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি, যদি ফ্রান্সের উত্তর অঞ্চলের এত স্থান আমাদের হাতে থাকে, যেখানে মার্কিন সৈন্য জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। তবে নিশ্চয়ই জর্ম্মণেরা যুদ্ধে পরাস্ত হইবে।

নৌ-সেনাপতি মার্কার বলিয়াছেন,—লর্ড কিচেনার মনে করিতেন ৩ বৎসরে যুদ্ধ শেষ হইবে। তাঁহার গণনা নিষ্ফল হইয়াছে। যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, কেহই বলিতে পারে না। (সঞ্জীবনী।)

আমরা ভারতবাসী কি চাই?—শিক্ষিত মানব সমাজেও সকলের একমত একভাব হওয়া আজো সম্ভবপর ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। কখনও যে তাহা সম্ভবপর হইবে এমন আশাও বোধ হয় কেহ করেন না। কিন্তু যে সময় এমন গুরুতর বিষয় সমাজসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাতে বিভিন্ন মত—বিভিন্ন ভাবের সমাধান করিয়া সকলেরই একভাব অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে—অর্থাৎ একতা হইলেও চলে, না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই এমন অবস্থা তখন আর থাকে না। ঐ বিষয়ের মধ্যে বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থাকে ধরা যাইতে পারে। যে যে প্রবল শক্তিগুলি যুদ্ধে লিপ্ত, তাঁহাদের প্রত্যেকেই জয় আশায় জীবন পণ করিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। একজনেরও উদাসীন বা বিরোধী হইবার যো নাই, হইলেও মঙ্গল নাই। এখন প্রত্যেকের কি ভীষণ অবস্থা! কিন্তু সে হিসাবে ভারতবর্ষ এখনও মায়ের পক্ষপুটে নিরাপদে নিদ্রিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ৪ বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছে এখন ভারতবর্ষের সম্মুখেও অতি গুরুতর কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি বঙ্গের প্রেস সেন্সার শ্রীযুক্ত জে, এন, রায় মহাশয় "সঞ্চিত ধন কিরূপে জর্ম্মাণদের সাহায্য করে" এই মর্ম্মে একখানি ইংরাজী বর্ণনাপত্র সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা স্থানাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে না পারিলেও উহার ভাবার্থের সহিত একান্ত সহানুভূতি করি। 'যুদ্ধে জয় লাভের জন্য আমি কি প্রকারে সাহায্য করিতে পারি', এই প্রশ্ন আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর চিন্তা করা উচিত। প্রত্যেকেই যে যুদ্ধ করিতে পারিবেন এমন নয়, কিন্তু কোন না কোনও প্রকারে সাহায্য করিতে সকলেই পারেন।

যদি আমরা ইংরাজরাজত্ব অক্ষুণ্ণ দেখিতে চাই, তবে আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদগত একান্ত কামনা ঐ সাহায্যের অনুকূলে না হইয়া পারে না, যদি ঐ ইচ্ছার মধ্যে কোনও রকমে অসরলতা—কপটতা থাকে তবে

আমরা বিপ্লববাদীর দলস্থ, এবং প্রকারান্তরে জার্ম্মণীর সাহায্যকারী। কোনও শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি বিপ্লববাদী হইতে পারেন না। বিপ্লববাদীর মত যাহাই হউক, তাহা স্থিরবুদ্ধির ও ধর্ম্মানুমোদিত ভাব কখনই আমরা বলিতে পারি না। জর্ম্মণ বা অন্যের অধীনে ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে ইহা যদি কেহ মনে করেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক—অযৌক্তিক এবং ভ্রমপূর্ণ ধারণা মাত্র।

আজ আমরা ইংরাজশাসনের বিচার করিতে শিখিয়াছি—আমাদের অভাব বুঝিতেছি, তাহা প্রাপ্তির জন্য 'দলবদ্ধভাবে' দাবী করিতেছি। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা কি এ দেশ ভুলিয়া গিয়াছেন? কোথায় ছিল আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা? আমরা যে সকল রকমেই জড়বৎ হইয়া গিয়াছিলাম। তাহা ভুলিলে তো চলিবে না। আকাঙ্খা জাগিল কোন্ জাতির সংসর্গে? যে জাতির শাসন-পক্ষপুটে থাকিয়া শতছিদ্র—সহস্রখণ্ডে বিভক্ত ভারতে এতটুকু একপ্রাণতা জাগিয়াছে তাহাতে ইংরাজজাতির মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না কি? যে পথে ভারতের এতটুকুও উন্নতি হইয়াছে সেই পথেই ভারতের কল্যাণ আশা, বুদ্ধিমান শিক্ষিত চিন্তাশীল ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই করিয়া থাকেন। সুতরাং ইংরাজরাজত্বের স্থায়ীত্ব কামী প্রত্যেক ভারতবাসীর হওয়া উচিত। এজন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে। যাঁহারা এই অবসরে অর্থ সৈন্য ও অন্যান্য রকমে যুদ্ধের সাহায্য করিয়াছেন—করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারত হিতৈষী, ভারতমাতার সুসন্তান।

ভারতের এ কলঙ্ক কি দূর হইবে না?—শাসন সংস্কার প্রস্তাব ব্যর্থ করিবার জন্য যাঁহারা বলিতেছেন,—"ভারতের ৩৩ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ৩২ কোটী ৮০ লক্ষ লোক শাসন সংস্কারের নামও শোনে নাই।" "অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অন্য কাহারও লোকমত বলিয়া যে পদার্থ তাহার জ্ঞান নাই।" "ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম্মগত, জাতিগত, আচারগত যে দ্বন্দ্ব আছে তাহা কখনও মিটিবে না।" "যাহারা শাসন প্রণালীর সংস্কার করিতে চায় তাহারা অস্ত্রধারণ করিতে জানে না।" আজ যদি ব্রিটিশ বন্দুক ভারতবর্ষকে রক্ষা না করে তবে বাংলার নারীদের সতীত্ব রক্ষা করিবে কে?" মুখের কথায় কিম্বা সভা-সমিতির বক্তৃতায়ও নয়—চরিত্রের দ্বারায় ভারত-বাসীকে এ কলঙ্ক দূর করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধির কার্য্য।—মহাত্মা গান্ধির মত একনিষ্ঠ-কর্ম্মী ও স্বদেশ-ভক্ত একান্ত দুর্লভ। তিনি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন তাহাতেই মনোপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া সেই কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। এখন তিনি সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। মন হইতে আর সকল প্রকার চিন্তা দূর করিয়া তিনি তাঁহার অদম্য শক্তি এককার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। সুরাটের এক সভায় বক্তৃতা কালে তিনি বলিয়াছেন;—"আপনারা যদি হোমরুলকে অত্যাবশ্যক বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সঙ্কটকালে সাম্রাজ্যকে আপনাদের সাহায্য করিতে হইবেই। এই সময় সাম্রাজ্যের আহ্বানে যদি আপনারা সাড়া প্রদান না করেন, তাহা হইলে আপনারা হোমরুল লাভের একান্ত অযোগ্য।"

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গোবরডাঙ্গার জমিদারপরিবারে একটি শোকাবেগ প্রশমিত হইতে না হইতে আর একটি শোকের আঘাত আসিয়া পতিত হইল। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর দেহত্যাগের ঠিক্ ২৬ দিন পরে গত ৫ই শ্রাবণ রবিবার সায়ংকালে তাঁহার স্নেহের তৃতীয় সহোদর বাবু জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁহার এল্গিন রোডস্থ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবু শারীরিক বলে একজন বিখ্যাত পালোয়ান এবং শীকারি পুরুষ ছিলেন। কিন্তু হায়! কালের দণ্ডাঘাতের নিকট সবল দুর্ব্বলের ভেদ নাই। ইতিপূর্ব্বে নাকি তাঁহার বহুমূত্র রোগের সূচনা হইয়াছিল, তারপর প্রায় দুই বৎসর কাল হইতে বিশেষ ভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। মধ্যে মধ্যে পীড়ার প্রকোপে ভীতরে ভীতরে শরীর ক্ষয় করিতেছিল, তারপর সহসা সঙ্কটাবস্থা হয়। তন্মধ্যে আবার কিছুদিন ভালও ছিলেন। কিন্তু ৪।৫ মাস পূর্ব্ব হইতে আবার রোগের নূতন নূতন লক্ষণসহ পুনরাক্রমে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। তখন চিকিৎসকের পরামর্শে দার্জ্জিলিং (খারসিয়াং) শৈলে গিয়া অবস্থিতি করেন, এবং চিকিৎসাও চলিতে থাকে। কিন্তু সেখানে আর সুবিধা বোধ হইল না দেখিয়া গত ২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার তাঁহাকে কলিকাতায়

ফিরাইয়া আনা হয়। তখন আর কোন রূপেই জীবনাশা ছিল না। অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, তিনি অকালেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। আরও মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা যে, বালিকা বিধবা রাখিয়া গেলেন। ৩ বার দ্বার পরিগ্রহ করিয়াও তাঁহার পুত্রসন্তান হয় নাই। একমাত্র কন্যা এবং জামাতাই তাঁহার প্রধান শোককারী এবং সর্ব্ববিষয়ে উত্তরাধিকারী রহিলেন। আমরা আর কি বলিয়া শোকার্ত্তের শান্তনা দিতে পারি? কিন্তু সেই শোকাপহারী বিধাতার চরণতলে কামনা করি, তিনি পরলোকস্থ আত্মার সদ্গতি এবং সকলের প্রাণে শান্তনা দান করুন।

জ্ঞানদাবাবু একজন বিখ্যাত শীকারি ছিলেন, হয়তো এই কথাই সকলে জানেন, কিন্তু তিনি উচ্চঅঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন; তাহা যাঁহারা নিজে সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুসন্ধান রাখিতেন তাঁহারাই তাঁহাকে সে জন্য বুঝিতেন। এমন কি তাঁহার এই অভিজ্ঞতার কথা আমাদের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী মণ্টেগু প্রমুখ প্রধান ব্যক্তিগণও অবগত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহা কুশদহের পক্ষে একটি গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

জীবিতকালে মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্তের বিষয় লোকচক্ষে তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে না, কিন্তু দেহান্তে অল্পাধিক পরিমানে তাহা যেন স্বভাবতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার দোষ দুর্ব্বলতার কথাও যেন মানুষের মনে ক্ষীণ হইয়া যায়। পরমাত্মার কৃপায় আমরাও যেন আমাদের প্রিয় জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে সেই দৃষ্টি লাভ করিতে পারি। তাঁহার মধ্যে যাহা সদ্ভাব ছিল, তাহা যেন আমাদের প্রাণে দিন দিন ফুটিয়া উঠে।

গত ১৮ই শ্রাবণ শনিবার 'কুশদহ-সমিতির' সাধারণ সভার মাসিক অধিবেশনে জ্ঞানদা বাবুর জন্য শোকপ্রকাশ করা হয়, এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, ম্যানেজার সুশীল বাবুর যোগে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবী ও জামাতা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমগ্র পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপক-পত্র প্রেরণ করা হউক।

কুশদহ-সমিতি

গত ১৮ই শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় স্কটীসচার্চ্চ কলেজগৃহে 'কুশদহ সমিতি'র মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অধিকাংশসভ্যের সমর্থনে শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ দিনকার সভাপতির কার্য্য করেন।

সর্ব্বপ্রথমে গোবরডাঙ্গার অন্যতম জমিদার পরলোকগত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশ করা হয়, এবং তাঁহার কন্যা, জামাতা ও পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপক-পত্র প্রেরণ করা ধার্য্য হয়।

তৎপরে গত এক মাসের মধ্যে কুশদহ-সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪টি অধিবেশনে যে কার্য্যকরী বিষয়গুলি আলোচিত ও স্থিরিকৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণ সভার সমক্ষে উপস্থিত করাই এ দিনকার আর একটি প্রধান কার্য্য ছিল। বিষয়গুলি যথাক্রমে এইরূপে উল্লিখিত হইতে পারে।

১। কুশদহর সীমানির্দ্ধারণ জন্য গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যালয়াদি হইতে (সার্ভে জেনারল অফিষ, সেন্সাস রিপোর্ট, রেভিনিউ রেকর্ড, এবং গাইঘাটা, বাদুড়ে, হাবড়া, চাকদহ ও বনগ্রাম থানার ম্যাপ সংগ্রহ করিয়া) কুশদহর সীমা নির্দ্ধারিত যাহা হইয়াছে তাহা (উক্ত ম্যাপ) প্রদর্শন করা হয়।

২। কুশদহ পল্লীর কোথাও একান্ত জলাভাব—বা পানীয় জলের অবস্থা কিরূপ তাহার একটি তদন্ত-ফল সমিতির নিকট উপস্থিত করিবার ভার শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হয়। তাঁহারা ১২ খানি গ্রাম তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম জ্ঞাপন করা হয়। এবং গ্রামে গ্রামে কতকগুলি ভদ্রলোককে এই তথ্য জানিবার জন্য যে সকল পত্র লেখা হয়, তাহার যতগুলি উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহাও পঠিত হয়। রিপোর্ট এবং পত্র গুলির সার মর্ম্ম এই যে, একান্ত জলাভাব কুশদহর প্রায় কোন গ্রামে নাই—তবে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব সর্ব্বত্র।

৩। চোয়্দা হইতে লোকপুল পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তাটি ম্যারামত করিবার জন্য ২৪ পরগণা জেলা বোর্ড, গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে ব্রহ্মমন্দিরের উত্তর দিয়া টৈগপুর ফকিরপাড়া ঘাট এবং তথা হইতে ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামের নীচে

দিয়া গাইঘাটা পর্য্যন্ত রাস্তাটি ম্যারামত করিবার জন্য যশোহর ডিষ্ট্রীকবোর্ড ও গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীকে, এবং মছলন্দপুর ষ্টেশন হইতে লোক্পুল কুঁচলে ও বেলিনী হইয়া মল্লিকপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহা ম্যারামত করিবার জন্য ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রীকবোর্ডে পত্র লেখা হউক। ইছাপুর ও মাটীকোমরা গ্রামে জঙ্গল কাটার ব্যবস্থা করিবার জন্য যশোহর ডিষ্ট্রীকবোর্ডের ও বনগ্রামের সাবডিভিসনাল অফিসারের নিকট যথা ক্রমে পত্র লেখা হউক। এই পত্র গুলির খসড়া প্রস্তুত করিবার ভার শ্রীযুক্ত নিশিবাবুর উপর অর্পিত হইয়াছে।

৪। বারাশাত ও বনগ্রাম মহকুমার সাবডিভিসন্যাল অফিসার দ্বয়ের নিকট সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলাচল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল সমিতির পক্ষ হইতে একটি ডেপুটেসন লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে বারাশত ও বনগ্রাম যাইবেন, দিন স্থির করার ভার সম্পাদকের উপর অর্পিত হইয়াছে।

৫। যশোহর ও ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীকবোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশয় দ্বয়ের নিকট শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলাচল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয়গণ যাইবেন স্থির হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন সমিতির জন্মকাল হইতে ছয় মাসের একটি কার্য্যবিবরণী সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রীতি সম্মিলন

গত ২৬শে শ্রাবণ রবিবার, রাত্রি ৭ ঘটিকার সময়, সৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয় তাঁহার ৪নং বৃন্দাবন মল্লিকের ১ম লেনস্থ নব নির্ম্মিত আবাস "নগেন্দ্রকুটীরে" "কুশদহ-সমিতি"কে সাদর-নিমন্ত্রণ করেন। তদুপলক্ষে তথায় সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। কুশদহ-সমিতির জন্মকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে, বাস্তবপক্ষে এমন আর একটিও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যদিও সভ্য সংখ্যা খুব অধিক হয় নাই কিন্তু ব্রজকিশোর বাবু ও তাঁহার পুত্রগণের আত্মীয় বন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া সভাটি বেশ জমকালই হইয়াছিল। প্রদীপ্ত আলোকোজ্জ্বলে মর্ম্মর-মণ্ডিত পরিচ্ছন্ন কুটীরাবাসখানি যেন নবসাজে সজ্জিত হইয়া সত্যই তখন এক

অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল—আর সর্ব্বোপরি ব্রজবাবুর প্রাণঢালা আদর, অভ্যর্থনা!

সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ দিনকার এই সভার উপযুক্ত সভাপতিই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন! এই প্রীতি-আনন্দ সম্মিলনের এক প্রধান অঙ্গ ছিল, "দেশ—মাতৃকার" বন্দনা-গাথা—স্বদেশী সঙ্গীত। স্বর্গীয় দ্বীজেন্দ্রলাল "বঙ্গ আমার" "জননী আমার" কি সুরই ছড়াইয়া গেলেন। প্রাথমিক ২।৩টি সঙ্গীতের ভাবে সভ্যগণের প্রাণ যখন ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে, তখন সভার কার্য্যারম্ভ হইল। সমিতির সম্পাদক, গৃহ-স্বামীর সাদর আহ্বান সূচক সূচনা জ্ঞাপন এবং সভাপতি মহাশয় ব্রজবাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলে ব্রজবাবু তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার অন্তরের কথাগুলি যাহা লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সুহৃদ বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিশ্বাস পাঠ করেন। ব্রজবাবুর প্রাণস্পর্শী প্রেমাপ্লুত অন্তরের কয়েকটি কথা শুনিয়া প্রত্যেক সভ্যের প্রাণ তখন স্বদেশপ্রেমে মগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই "বঙ্গ আমার" কথাগুলি উচ্চারণ করিতে গিয়া সভাপতি মহাশয় অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাই বলিতে ছিলাম 'অদ্যকার উপযুক্ত সভাপতি' নিজে কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইলেন। যথার্থই আজ মাতৃপূজা হইল—সমিতির অধিবেশন আজ ধন্য হইল!

তারপর শ্রীযুক্ত পতিরাম দে, শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত নীলাচল মুখোপাধ্যায় বি-এল, এবং কুশদহ সম্পাদক বক্তৃতা দ্বারা কেবল স্বদেশপ্রীতি—জন্মভূমির সেবা, একপ্রাণতার কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া যেন বাস্তবিক জ্বলন্ত অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা স্থানাভাবে ঐ সকল বক্তৃতার কিছুই প্রদান করিতে পারিলাম না। কেবল এ দিনকার উপস্থিত সভ্যগণের প্রাণে এক প্রাণপ্রদ স্মৃতি জাগরূক রহিল। কিন্তু যাঁহারা অদ্যকার সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট এই প্রসাদী-ফুল কিরূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে? আশায় বুক বাঁধিয়া প্রার্থনা করি বিধাতা সে বিধান করুন।

শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর বাবুর সম্ভাষণটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

অবশেষে কুশদহ-সমিতির হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এবং ব্রজকিশোর বাবুর প্রতিবাসিনী একটি মহিলা সঙ্গীত করিয়া সকলের প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

ব্রজকিশোর বাবুর অভিভাষণ

আজ এই প্রাবৃট সন্ধ্যায়, যাঁহার অপার করুণায়, যাঁহার অসীম মঙ্গল বিধানে,আমার পরম স্নেহ ও ভক্তির পাত্র 'কুশদহ-সমিতি'র সভ্যগণকে এখানে প্রাপ্ত হইয়াছি, সর্ব্বাগ্রে সেই বিশ্বপতির চরণে বার বার প্রণিপাত করি।

কুশদহ-সমিতির সভ্যগণ যাঁহারা আবশ্যকীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কত অসুবিধা লঙ্ঘন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে ধন্যবাদ দিতে চাহি না, কারণ ধন্যবাদ দূরত্ব জ্ঞাপক। ভাইয়ের সমীপে ভাইয়ের, আত্মীয়জন সমীপে আত্মীয়ের, বন্ধুর সমীপে বন্ধুর আগমনে, বন্ধুর মিলনে ধন্যবাদের ভাব মনে আসে না, সেখানে এক অনাবিল স্নেহরসে হৃদয় আপ্লুত হয়, প্রেমানন্দে মন ভরিয়া উঠে। যাঁহারা আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাঁহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি, আর যাহারা আমার বয়ঃকনিষ্ঠ তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দেশ-কল্যাণে তাঁহাদের মতি থাকুক। আজ আমার এ কুটীর পবিত্রীকৃত, আজ আমি সগোষ্ঠী ধন্য—আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাসে আজিকার এ মিলন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

সুদূর পল্লিগ্রামের কথা যখন মনে পড়ে, তখন হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে ভরিয়া উঠে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের অস্থি যাহার মাটিতে মাটি হইয়া আছে—আমার স্বর্গগত স্বগণ গণের নিশ্বাস প্রশ্বাস যাহার বায়ুতে মিশিয়া রহিয়াছে, আমার পিতামহগণ যাহার জলে অবগাহন করিয়াছেন, যাহার বটতলে বিশ্রাম করিয়াছেন, সে দেশ বড় পবিত্র, বড় আদরের, বড় গৌরবের। তথায় কাক-কণ্ঠের কর্কশধ্বনি, খাঁচার পোষা সহর-কোকিলকণ্ঠের পঞ্চম রাগ হইতে অনেক মিষ্ট। তথায় কূলে কূলে ভরা পুকুরের জল নগরীর শোধিত জল হইতে যেন আরামের। কেমনে বুঝাইব শত-স্মৃতি বিজড়িত সেই গ্রাম্য পথ,ঘাট,মাঠ, আমার কত আনন্দের—কত শ্রদ্ধার, কত গৌরবের!

যখন জ্যোৎস্না-মুখরিত শারদ-সন্ধ্যায় শেফালি তলে প্রকৃতির মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠে, যখন গভীর নিশীথে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের দূরাগত ধ্বনি সুষুপ্তি ভাঙিয়া দেয়, তখন মনে হয় জগতে এমন কোনও আমোদ প্রমোদ নাই, যাহাতে এমন নির্ম্মল আনন্দ দিতে পারে।

কিন্তু হায়! সেই চির আদরের পল্লির আজ কি অবস্থা!

বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, আজ যেখানে দুরন্ত ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী তাহার বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—আর দিনের পর দিন শিশু, যুবা, প্রৌঢ় অকালে তাহার কবলে গমন করিতেছে—সোণার দেশ ছারখারে যাইতে বসিয়াছে। পুত্রহীনের করুণ ক্রন্দনে—বাল-বিধবার নীরব অশ্রুপাতে, দরিদ্রের উষ্ণশ্বাসে, দেশের শান্তি সুখ, দূরে পলায়ন করিয়াছে, দেশ বিরাট শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—আর সেই শ্মশানের উপরে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে।

কিন্তু ইহার উপায় কি?

এক নূতন যুগ আসিয়াছে; পৃথিবীময় এক নবীন জীবনের স্পন্দন—এক নব অভ্যুদয়ের সূচনা,এক নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক মানব আজ নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি—নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে তৎপর হইতেছে। আমার মনে হয়, এই 'কুশদহ-সমিতি' সেই নব জাগরণেরই ফল। বিশ্বব্যাপী মহাসমর চারি বৎসর ধরিয়া শোণিত স্রোতে মেদিনী ভাসাইতেছে, তাহারই ফলে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক দেশ বুঝিয়াছে, আত্মরক্ষা করা কি বিষম ব্যাপার, প্রত্যেক সমাজকে প্রত্যেক দেশকে প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

'কুশদহ-সমিতি' মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। বড়ই আনন্দের বিষয় এই শিশু-সমিতি ইতিমধ্যে অনেকগুলি সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। কবে দেখিব এই সমিতি দেশের দলাদলি দূর করিয়া, হিংসাদ্বেষ দূরে তাড়াইয়া এক 'মহা-মিলন-মন্দিরের' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেশের স্বাস্থ্য, দেশের কৃষি-বাণিজ্য, দেশের ধন দেশে ফিরাইয়া আনিবে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর দুঃখে কাঁদিবে—হর্ষে হর্ষ-প্রকাশ করিবে। আর থাকিবে গোলা ভরা ধান,মাছ ভরা পুকুর,গাই ভরা গোয়াল,আর সকলের চেয়ে বড় ঘর ভরা মানুষ।

কিন্তু সে শক্তি কোথায়?

ক্ষুদ্রবীজ যখন অঙ্কুরিত হয়,তখন কে জানে তাহার মধ্যে কি শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে বীজ যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে রোপিত হয় এবং তাহাতে নিয়মিত জল সিঞ্চিত হয়, তবে তাহাতে একদিন অঙ্কুর উদ্গত হইবেই, একদিন সে বাড়িবেই, একদিন সে ডালপালায় সুশোভিত হইবেই। তখন তাহার

শাখায় শাখায় পাখীরা গান গাহিবে, তাহার শ্যামল-ছায়ায় রৌদ্র-তপ্ত কত শ্রান্ত-পথিক বিশ্রাম লাভ করিবে। তেমনই উপযুক্ত যত্ন করিলে এই শিশু সমিতি অশেষ কল্যাণকর হইতে পারে এবং ইহারই পন্থা অনুসরণ করিয়া কত নব নব সমিতি নব নব উদ্দেশ্য লইয়া সংস্থাপিত হইতে পারে।

উপসংহারে এই সমিতির উদ্যোগী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলাচল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রভৃতি মহাশয়গণকে ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের প্রতি আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি, এবং সমিতির অন্যান্য উদ্যোগীগণকেও আমার শুভাকাঙ্খা জানাইতেছি।

সমিতির উদ্দেশ্য সফল হউক, দেশের ম্যালেরিয়া, জনশূন্যতা নিবারণ করিয়া একতাবন্ধনে দেশকে এক সুখময় পরিবারে পরিণত করুক। দেশের শোকের হাহাকার দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ দূরে অন্তর্হিত হউক, ঘরে ঘরে হাসির রোলে— আনন্দের কোলাহলে, উৎসবের ঝঙ্কারে দেশ মুখরিত হউক, ভগবানের কৃপায় আমাদের সেইদিন আসুক।

বিনীত শ্রী ব্রজকিশোর মিত্র।

কুশদহ-পঞ্জী

ভ্রম সংশোধন। বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর বিবাহ গৈপুর বেচারাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা" নহে। প্রকৃত পরিচয় অপ্রাপ্ত।

আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত ৺সারদাপ্রসন্ন বাবুর ৪র্থ পুত্র ৺প্রমদাপ্রসন্ন, ৫ম পুত্র ৺কুলদাপ্রসন্নর স্থলে, ৪র্থ ৺কুলদাপ্রসন্ন ও ৫ম পুত্র ৺প্রমদাপ্রসন্ন হইবে।

৺গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর ৬ষ্ঠ কন্যা পদ্মিনীর স্বামী বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থলে ৺ হইবে, অর্থাৎ পদ্মিনী দেবী বিধবা।

৺সারদাপ্রসন্ন বাবুর কন্যা ৩য়া (অবর্ত্তমান) নিশামণি দেবীর স্বামী ৺অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্থলে, শ্রীযুক্ত হইবে। অর্থাৎ অন্নদাবাবু সুস্থ শরীরে কাশীতে বাস করিতেছেন।

৺শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

৺খোলারাম মুখোপাধ্যায়ের কন্যা উমামণী, ধর্ম্মদহের ৺রামকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। রামকিশোরের কন্যা "রাখী ঠাকুরাণী" শান্তিপুরের বাইগাছির ৺শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের পত্নী। শ্রীধর মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর দুই পুত্র, ৺সারদাচরণ ও ৺বসন্তকুমার।

৺সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়ের—শ্বশুরালয় হুগলি জেলার ত্রিবেণী। সারদা বাবুর দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের—স্ত্রী শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী, মেদিনীপুর জেলার জাড়া গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের কন্যা।

চারু বাবুর ৩ পুত্র—৺আশুতোষ, শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র। কন্যা—সরসীবালা, সরযুবালা, আর একটির নাম অপ্রাপ্ত (বুড়ী ডাক নাম)

৺আশুতোষের শ্বশুর কলিকাতা সারপেনটাইন লেনস্থ বিষ্ণুধন চট্টোপাধ্যায়।

সুশীলচন্দ্রের শ্বশুর সাতক্ষীরার শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবোধচন্দ্রের শ্বশুর শিবপুরের শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী সরসীবালার স্বামী, রিসড়ার ক্ষিতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরযুবালার স্বামী, চারঘাটের কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুড়ীর স্বামী বর্দ্ধমান জেলার—পুরের শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের—স্ত্রী শ্রীমতী জয়াবতী দেবী, হুগলী জেলার বেলে শিকুরের বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

পঞ্চানন বাবুর কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর স্বামী মল্লিকপুরের শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্বশুর চারঘাটের ৺রামতারণ চৌধুরী।

বসন্ত বাবুর পুত্র পটলের (নাম পাওয়া যায় নাই) শ্বশুরালয় রিষড়ায়।

বসন্ত বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীর স্বামী ইছাপুরের শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কনিষ্ঠা কন্যা (বিধবা) ভানুমতী দেবীর স্বামী ইছাপুরের ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"তোমার জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব"

দশম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩২৫ | পঞ্চম সংখ্যা

আত্ম-নিবেদন

দয়াল প্রভু! আজ কি ব'লে কোন্ সুরে তোমার চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব! তুমি সত্য! তুমি প্রত্যেক কাতর প্রার্থনা শোনো। দয়াল, তোমার সিংহাসন-তলে দাসের ডাক পৌঁছিয়াছে। তুমিই ডাকিবার প্রবৃত্তি দাও আবার তুমিই তাহা পূরণ করো--তোমার এ-কি খেলা! দেশের জন্য বেদনা-বোধ তুমিই দিয়াছিলে, আজ ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত সে সুর তুমিই রক্ষা করিয়াছ। আজ সমগ্র দেশবাসীর মিলনের জন্য "সমিতি" যোগে তাহার একটু পূর্ব্বাভাস দেখাইলে। কৃতার্থ করিলে। তবে সেই প্রকৃত মিলন--যাহা তোমার চরণতলেই সম্ভব, তাহারই আয়োজন করো। বাহিরের মিলন তো প্রকৃত মিলন নয়--সেতো ক্ষণিক, তাহাতে প্রাণ তো শুদ্ধ হয় না। তোমার প্রেমে ভাইয়ে ভাইয়ে স্বার্থ ত্যাগের যে মিলন, সেই তো বিশুদ্ধ মিলন। প্রভু এখন তাহার আয়োজন ক'রে দাও। তোমার চরণ-তলে সেই পবিত্র মিলন আশা করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। দাস--

কুশদহের ইতিহাস

বারুই—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে বারুই সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত। বারুজী বা বারুই নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে বারুজীর পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা শূদ্রা। কোনও মতে পিতা ক্ষত্রিয়, মাতা শূদ্রা। জাতিমালা বা অন্যান্য মত আমরা উল্লেখ করিতে চাহি না। বারুজীর উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণগণ পানের চাষ করিতেন। তখন তাঁহাদের এতদ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষ ব্যাঘাত হইত, কাজেই তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার শরণাপন্ন হইয়া এ ব্যবসায় হইতে অব্যাহতি লাভের প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রহ্মা বারুজীর সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণকে অব্যাহতি দিলেন। তদবধি পানের চাষ বারুজীর জাতীয় ব্যবসায় হইল।

যাহা হউক, বারুজীর জন্য বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। সরকার সদয় হইয়া বাঙালীকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকার দিলে, বারুজী শ্রেণীর উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রথমেই, এই শ্রেণীভুক্ত হন। বিশেষ লাভ জনক আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বারুজী যুবকগণ এগার টাকা বেতনের সৈন্য হইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। বাংলার আদর্শ স্থানীয় হইয়া স্বদেশের কলঙ্ক দূর করিয়াছেন। তাঁহাদের ধমণীতে যে যথার্থ ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহা দেখাইয়াছেন। শিক্ষা, সভ্যতা, ধন সম্পত্তিতে বারুজী আজ বিশেষ উন্নত। উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ, বৈদ্য হইতে তাঁহারা এখন বেশী দূরে নহেন।

হিন্দু সমাজের অন্যান্য শ্রেণী হইতে বারুজী শুদ্ধাচারী। প্রত্যুষে স্নান না করিয়া বারুজী বরোজে প্রবেশ করেন না। বরোজ তাঁহাদের নিকট দেবায়তন বিশেষ। পান রোপণের সময় মৃত্তিকা কর্ষণ আবশ্যক। এজন্য নিম্ন শ্রেণীর মজুর নিযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু বরোজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া তবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। অশুচি স্ত্রী কখনও বরোজে প্রবেশ করে না। করিলেই বিপদ ঘটে। ব্রাহ্মণকেও কখনও বরোজে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। বৃদ্ধকেও নহে। অনাচারের শাস্তি বন্য জন্তুর উপদ্রব—বরোজে বাঘের উৎপাত বলিয়া বোধ হয়, তাই এত পবিত্রতা রক্ষার কড়াকড়ি।

পানের ব্যবসায়ের উন্নতি ও লাভ দেখিয়া অপর শ্রেণীর অনেক লোক

এ ব্যবসায় ধরিয়াছে। চাষাধোপা, চাঁড়াল, কৈবর্ত্ত, শুঁড়ী প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর লোক এ ব্যবসা করিতেছে। তাহাদের বরোজে সম্যক্ পবিত্রতা রক্ষিত হয় না। চাষও ভাল হয় না। যে সকল পর্ণকার পূর্ব্বকালে সন্দীপে বা সাগরদ্বীপে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা এখনও সেখানে ঐ ব্যবসা করে। তাহারা বরোজ পবিত্র রাখে না। কিন্তু আউলিয়া বা পীরের মানসিক করিয়া বরোজ প্রবেশ করে এবং বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করে।

এই শ্রেণীর মধ্যে জমিদার,তালুকদার, পত্তনিদার অনেক আইনজ্ঞ ও অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসায়ের লোক অনেক। এই শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন এবং কাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কেহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তি রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত বাচস্পতির চেষ্টায় যশোহরে নবম সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছিল। সমাগত সাহিত্যিকগণ যদু বাবুর অমায়িক ব্যবহারে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

বারুজী সম্প্রদায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—রাঢ়, বারেন্দ্র, নাদাস ও কোটা। এই শ্রেণীর মধ্যে স্বগোত্রেও বিবাহ হয়। তবে সমানোদক হইলে হয় না। ইহাতে মনে হয় উচ্চ বর্ণের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় পূর্ব্ব ব্যবসায়ে রহিয়া গিয়াছেন।

বারুজীর বিবাহে কন্যা পণ গৃহীত হইয়া থাকে। তবে উচ্চ শিক্ষিতগণের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন কমিতেছে। গোপ জাতির মধ্যেও কন্যা-পণ গ্রহণ প্রথা আছে কিন্তু শিক্ষিতেরা তাহা রহিত করার চেষ্টা করিতেছেন। বারুজীর বিবাহে কুশণ্ডিকা নাই। তবে সম্প্রদানের পর সপ্তপদী গমন ও অগ্নিতে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ ও অগ্নি-প্রণাম আছে। বর বধূর গৃহে আগমন সময়ে কোন কোনও স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে, তবে সাধারণতঃ প্রচলিত নিয়মে তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না।

বারুই সাধারণতঃ সকলেই শাক্ত—অনেক বৈষ্ণবও আছেন। নবশায়ক-যাজি ব্রাহ্মণগণ বারুজীর পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। তবে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে যে উষা পূজা হইয়া থাকে তাহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বরোজের মধ্যে এই দেবীর পূজা হয়। কোন মূর্ত্তি গঠিত হয় না। কেবল নৈবেদ্য প্রদত্ত হয়, এবং এই নৈবেদ্য পল্লীর বালকদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। বিক্রমপুরে উষাকে সংগাই নামে পূজা করা হয়। সংগাই ভগবতীর

নামান্তর। এই উষা পূজা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বৈদিককালের আচার বারুই মধ্যে কতকটা রক্ষিত হইতেছে। এক সময়ে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সকলেই পর্ণকার ছিলেন এবং এখনও কেহ কেহ সেই বৈদিক আচার আংশিক ভাবে রক্ষা করিতেছেন, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

খুলনা, যশোহর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে বারুজীর সংখ্যা যত অধিক, নদীয়া, ২৪ পরগণায় তত নহে। কুশদহে বারুজী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে গাঁতিদার এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীও আছেন। ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল। ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাঁহারা বারুজী সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষিত বারুজীর সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান্ ব্যক্তির সংখ্যা এই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়।

কেহ কেহ বলেন তাম্বুলী ও পর্ণকার মূলে একই শ্রেণীর—দুইটি শাখা মাত্র। যাঁহারা পাণের চাষ করেন তাঁহারা বারুজী আর যাঁহারা পাণ বিক্রয় করিতেন তাঁহারাই তাম্বুলী নামে পরিচিত। আমরা তাম্বুলী প্রবন্ধে এ বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

বেহারাঞ্চলে যে সকল বারুই দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাও পাণের ব্যবসা করে। কিন্তু বাংলার বারুয়ের মত তাহারা শিক্ষিত, উন্নত ও সদাচারী নহে। বেহারে বারুইদিগের উপাধি রাউত এবং মঘাইয়া, চৌরাশিয়া, সেমেরিয়া প্রভৃতি পাঁচ শাখায় বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বাংলার বারুই মধ্যে তাহা নাই। বেহারের বারুয়ের গোত্র কাশ্যপ ও নাগ।

বাংলার বারুইদের গোত্র ভারদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ ও বাৎস্য, গৌতম, আলম্যাল, মৌদ্গল্য, জৈমিনী, চন্দ্র, ব্যাস, বিষ্ণু প্রভৃতি। কায়স্থের ন্যায় বারুয়েরও উপাধি যথা— মিত্র, দত্ত, গুহ, নাগ, দে, দাস, ধর, কর, সেন, রুদ্র, ভদ্র, চন্দ, কুণ্ডু, হোড় প্রভৃতি এবং আধুনিক উপাধি মজুমদার, সরকার, হালদার, বড়াল, মল্লিক, খাস, বিশ্বাস, ভৌমিক প্রভৃতিও দেখা যায়। তবে গোষ্ঠীপতি বারুয়ের উপাধি চৌধুরী।

বারুজী শ্রেণীর মধ্যে যেরূপ দীর্ঘজীবী লোক দেখা যায় অন্যান্য শ্রেণীতে তত্তো দেখা যায় না। তাহার কারণ আলস্য কাহাকে বলে বারুই জানে না। নিজের কাজ, শ্রমসাধ্য কাজ লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে হয়, এজন্য কপটতা শিখিবার অবসর হয় না। এরূপ সরল ও নিরীহ শ্রেণীর যে উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী

(ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে গৃহীত)

ইংরাজি ১৮৯৮ সালে কলিকাতা গিরীশবিদ্যারত্ন লেনে প্রকাশচন্দ্রের জন্ম হয়। জন্মের সময় সরকারি কার্য্যোপলক্ষে আমি অন্যত্র ছিলাম। অভিভাবক স্বরূপ বালকের দাদা শ্রীমান্ জগন্মোহন ছিলেন। এই বালকের জন্মের পূর্ব্বে, আমাদের প্রথম পুত্রের মৃত্যু হয়। এই পুত্রের জন্মে এই পরিবারের প্রতি বিধাতার বিশেষ দয়া প্রকাশ মনে হওয়ায় ইহার নাম প্রকাশচন্দ্র রাখা হইয়াছিল। যখন বালকের বয়স দু' বৎসর তখন সে কঠিন যকৃতের রোগে (Infantile liver) আক্রান্ত হয়। প্রায় ৬ মাসকাল বালক রাত্রি ১২টা হইতে প্রায় ৫টা পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিত, ক্রমে সে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিল। চিকিৎসকগণ তাহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। কিন্তু ভগবানের কৃপায়, এ যাত্রা বালকের জীবন রক্ষা পায়।

এই কঠিন রোগ হইতে আরোগ্য লাভের পর ক্রমে তাহার শরীর সুস্থ হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তিরও বিকাশ পায়। তাহার বয়স যখন ৪ বৎসর, তখন প্রায় প্রচলিত সমস্ত ইংরাজি কথা সে আয়ত্ত করিয়াছিল। চুয়াডাঙ্গার অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তাহার এই শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন, এবং তাহাকে লইয়া খুব আমোদও করিতেন। তাহার স্মৃতিশক্তি এত প্রবল ছিল যে, কোনও একটি বিষয় একবার মাত্র পাঠ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিত। ময়মনসিং স্কুলে অধ্যয়নকালে তাহার একজন শিক্ষক তাহার দাদাকে বলেন,আমি প্রকাশের পরীক্ষার কাগজে নম্বর কাটার কিছুই পাই নাই, তবুও ১ নম্বর কাটিয়া ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৯ দিয়াছি।

তাহার জ্ঞানপিপাসা এত প্রবল ছিল যে, তাহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াও কোন প্রকারের খেলাতে সম্মত করান যাইত না। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিবৎসর উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। একবার ময়মনসিং জিলাস্কুলে একলব্যের অভিনয় হয়, বালক প্রকাশ একলব্য সাজিয়া এমন সুন্দর অভিনয় করে যে, স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ১০৲ টাকার বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন। ম্যাট্রিকুলেসান ক্লাসে উঠিয়া সমস্ত বৎসর কঠিন জ্বররোগে অসুস্থ

থাকে। সে বৎসর তাহার পরীক্ষা দেওয়া কাহারও তেমন অভিপ্রেত ছিল না। নির্ব্বাচনা পরীক্ষার অতি অল্পদিন পূর্ব্বে গিরিধি স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে বালক বিশেষ অনুরোধ করে যে, তিনি যেন দয়া করিয়া তাহাকে নির্ব্বাচনা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অনুমতি প্রদান করেন। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করেন। মোটে ১৫ কি ২০ দিন পাঠ করিয়া সে নির্ব্বাচন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে। পরে কয় সপ্তাহ মাত্র পাঠ করিয়া সে ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষার পরে তাহার শরীর বিশেষ অসুস্থ হয়। অসুস্থ শরীরেই সে একাকী সুদূর ব্রহ্মদেশের মিথিলা সহরে তাহার দাদা শ্রীমান্ জগন্মোহনের নিকটে গমন করে। মিথিলা সহরে তাহার গলদেশে কঠিন রোগ হয় এবং তাহার দাদা স্বয়ং অস্ত্র করিয়া আরোগ্য করে। মিথিলার স্বাস্থ্যকর বায়ু ও হ্রদের জলে তাহার শরীর অনেক সবল হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইবার পূর্ব্বে সে আবার একাকী ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া হাজারিবাগ কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করে। তাহার জ্ঞানপিপাসা এত প্রবল ছিল যে, কেহ তাহাকে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে নিষেধ করিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইত। হাজারিবাগে অবস্থানকালে তাহার শরীর বার বার অসুস্থ হয়। যদিও I.A. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সে অতি সামান্য মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল, তবুও পরীক্ষাতে সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহার দাদার কর্ম্মস্থান নেপাল ও ব্রহ্মদেশে অতি অল্প সময় থাকিয়া সে পার্ব্বতীয়া, নেওয়ারি ও ব্রহ্মদেশের ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে অভ্যাস করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সাঁওতালি, গুরুমুখী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষাতেও সে সহজে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিত। কোনও ভাষার যে কোনও শব্দ সে একবার শুনিয়াই মনে রাখিতে পারিত।

বন্ধুতা স্থাপন করিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যে কোনও অপরিচিত লোকের সহিত সে আলাপ করিয়া বন্ধুতা স্থাপন করিতে পারিত। তাহার জীবনের অতি অল্প বয়সে সে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই সে নানাশ্রেণীর লোকের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছিল। তাহার বন্ধুগণ তাহাকে সময় সময় উপহার পাঠাইয়াছেন।

দরিদ্রদিগকে সে বড় ভাল বাসিত। দরিদ্র ভৃত্য, মেথর প্রভৃতিকে সে অনেক সময় তাহার শক্তির অতিরিক্ত পুরস্কার দিত। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, বড়লোকদের তো সকলে ভালবাসে, কিন্তু দরিদ্রদিগের দুঃখের কথা কে ভাবে? ধরমপুর হইতে আসার সময় তাহার আরাম চেয়ার প্রভৃতি দরিদ্রদিগকে দান করিয়া আসিয়াছিল। অনেক সময় তাহার দানের জন্য আমাদিগকে একটু অসুবিধায়ও পড়িতে হইয়াছে।

তর্ক করিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কলেজের পুস্তক ভিন্ন সে অনেক অতিরিক্ত পুস্তক পাঠ করিত। তাহার দাদার বিজ্ঞানের অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া সে অনেক বিষয় আয়ত্ত করিয়াছিল। I. A. পাশ করিয়া শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু গৃহে বসিয়া সে বিভিন্ন ভাষার বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতেছিল। যে কোনও বিষয় সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিত। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে সে একজন টেলিগ্রাফ মাষ্টারের সহিত আলাপ করিয়া টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। শরীর যখন নিতান্ত অসুস্থ হইল, তখন সে ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিয়া সময় অতিবাহিত করিত।

তাহার অসাধারণ মানসিক বল ছিল। তাহার বয়স যখন মাত্র ৪ বৎসর, আমি তখন চুয়াডাঙ্গায়। একদিন তাহাকে লইয়া নদীতে স্নান করিতে যাই। তাহাকে জলের নিকটে রাখিয়া আমি যেই জলে ডুব দেই, বালকও আমার অনুকরণ করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া যায়. অল্পক্ষণ সন্ধানের পর তাহাকে জল হইতে তুলিয়া নানা প্রক্রিয়াতে তাহার জ্ঞান সঞ্চার করি। জ্ঞান প্রাপ্তি মাত্রই সে হাসিয়া ফেলে।

একবার তাহাকে একটি খুব বড় ঘোড়াতে চড়াইয়া ভৃত্যগণ খেলিতেছিল, হঠাৎ অশ্বটি ক্ষিপ্ত হইয়া অতি বেগে দৌড়াতে থাকে। উপস্থিত সকলে ভাবিল যে, বালকের বিপদ অনিবার্য্য। বালক ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাইবার সময় ঘোড়ার গলদেশ ধরিয়া ঝুলিতে থাকে। অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়া ঘোড়াটি ক্লান্ত হইয়া যায়, এবং অন্যান্য লোক আসিয়া ধরিয়া ফেলে। বালক কিছুতেই ঘোড়ার গলদেশ পরিত্যাগ করে নাই। কোনও প্রকারের বিপদে তাহাকে ভীত হইতে দেখা যাইত না।

তাহার বয়স যখন ১৪ বৎসর, সে সময়ে সে নেপালে গমন করে। নেপাল

হইতে আসিবার সময়, চন্দ্রগিরি অতিক্রম করিলে,তাহার তাঞ্জানের বেহারাদের একজনের ওলাউঠার মতন হওয়াতে, বেহারারা তাহাকে সেই অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তাহার সঙ্গে মাত্র একজন ভৃত্য ছিল। এই স্থানে আর বেহারাও পাওয়া গেল না। বালক তখন নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া, সেই ভৃত্যটিকে সঙ্গে লইয়া, সেই ভয়াবহ দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া ৪।৫ দিন পরে ইংরাজ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রহ্মদেশেরও নানা স্থান সে একাকী ভ্রমণ করিয়াছিল।

যে কার্য্যকে সে নিজের কর্ত্তব্য মনে করিত, শত প্রকারের বাধা হইলেও সে তাহা সমাধা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। অনেক সময় তাহার এই অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেখিয়া আমরা বিরক্তও হইয়াছি। গিরিধিতে যখন রোগশয্যায় সে নিতান্ত দুর্ব্বল হয়—এমন কি তাহার চলিবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না, এরূপ অবস্থায় একদিন আমি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া যাই। বালক আমার অবস্থা দেখিয়া, জানি না কোথা হইতে বল সংগ্রহ করিয়া সাইকেল চড়িয়া দুই মাইল পথ যাইয়া ডাক্তার লইয়া আসে।

বিগত খৃষ্টমাসের সময় একদিকে তাহার রোগ, আর এক দিকে আমার চক্ষু দুটি অন্ধ হয়। তাহার দাদা শ্রীমান্ জগন্মোহনের চিকিৎসায় সে অনেক আরোগ্যলাভ করে। কিন্তু দুর্ব্বল দেহেই সে আমার চক্ষুর চিকিৎসার জন্য আমাকে লইয়া কলিকাতায় আসে এবং চক্ষুর অস্ত্র চিকিৎসা পর্য্যন্ত, আমার সেবা শুশ্রূষা করে। আমি অন্ধ হইয়াছিলাম, তাহার অসাধারণ যত্নে ও ভগবানের বিশেষ কৃপায় দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি।

তাহার রোগ যখন ক্রমে কঠিন হইতে লাগিল এবং চিকিৎসকগণ তাহার জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইলেন, তখনও সে একটুও ভীত বা চঞ্চল না হইয়া ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত সমস্ত কষ্ট বহন করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তাহার দাদা কর্ম্মস্থান হইতে তাহাকে দেখিতে আসেন। দাদাকে দেখিয়া তাহার অপার আনন্দ। মৃত্যুর দিন তাহার দাদা স্বয়ং তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া নানাবিধ প্রক্রিয়াতে ও ঔষধ প্রয়োগে তাহার শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বালক প্রকাশ বুঝিতে পারিয়াছিল, যে তাহার সময় নিকট, সে দাদাকে নিকটে ডাকিয়া দাদার বুকে হাত রাখিল। তাহার দাদা তাহাকে বলিলেন, ভাই, ঈশ্বর অনন্ত, তাঁহার দয়া প্রেম অনন্ত, আমাদের জীবনও অনন্ত

উন্নতিশীল, এই শরীর বহন করিয়াও আমরা ঈশ্বরের বুকেই আছি, এবং এই শরীর বিনষ্ট হইলেও আমরা ঈশ্বরের বুকেই থাকিব। কোনও ভয় করিওনা ভাই, দয়াময় বলো।

তখন বালক "দয়াময়, দয়াময়" বলিতে লাগিল। সে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহার দাদা জগন্মোহনের বুকে হাত রাখিয়া কেবল "দয়াময়, দয়াময়", উচ্চারণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার গলার স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, ক্রমে সে চক্ষু বুজিল, যতক্ষণ তাহার গলার অস্পষ্ট স্বরও শুনা গিয়াছে, ততক্ষণ তাহার মুখ হইতে কেবল 'দয়াময়' নাম উচ্চারণ হইতে শুনা গিয়াছে। এইরূপ ভাবে সে অনন্ত লোকে যাত্রা করিল। পৃথিবীর দেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল।

তাহার বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাহার মাতা এই বালকের সমস্ত ভার আমার উপরে দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি এই বালকের অসাধারণ মানসিকশক্তি দেখিয়া, সংসারের কত কি আশা মনে পোষণ করিতেছিলাম ; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাঁহার বিধান মঙ্গল বিধান। তাই এই পুত্রের পরলোক গমনেও তাঁহার দয়াময়, মঙ্গলময়, আনন্দময় রূপ দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করি। এই সংসারে যাহা ফুটিতেছিল, তাঁহার অনন্তবক্ষে তাহা ফুটিবে—আরও সুন্দর হইবে, এই মহাসত্যে বিশ্বাস করি*।

---

* বালক প্রকাশচন্দ্রের পিতা শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আমার ধর্ম্মবন্ধু। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি যখন বনগ্রামে কোর্ট সাব্ইনেস্পেক্টর ছিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় পাই। আজ পুত্র-বিয়োগে তিনি কেমন অটল—স্থির! তাহা দেখিয়া প্রাণে যে আনন্দ হইতেছে তাহা প্রকাশ না করিয়া এবং এমন সুন্দর দেবকুমার প্রকাশচন্দ্রের জীবন কুশদহ-বাসীর বিশেষতঃ যুবকগণের জন্যও উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিশেষত্ব পূর্ণ জীবনগুলি মানব সাধারণের সম্পত্তি—যাঁহার অনুরাগ আছে তিনিই এমন জীবন কুসুমের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। দয়াল নাম ধন্য হউক, তাঁহার মহিমা যেমন স্বর্গে, তেমন পৃথিবীতে পূর্ণ হউক। (কুঃ সম্পাদক)

প্রায়শ্চিত্ত

—•—

ত্রয়োদশ

প্রাতঃকালে মহেশ বাবু টেবিলের কাছে বসিয়া পাইওনিয়ার পড়িতেছিলেন, মাঘ মাসের দারুণ শীতে, এতগুলা ওয়েষ্টকোট, কোট ও ওভারকোটেও তাঁহার হাড়ের ভিতর শীতে যেন কন্ কন্ করিতেছিল। ঘরের মেজেতে মাটীর গামলায়, কাঠ্ কয়লার আগুন গন্ গন্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সিরকীর কুটীরের ফাঁকে ফাঁকে রাতের হিম-শীতল বাতাস অবাধে প্রবেশ করিয়া ঘরখানিকে বরফের মতো ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিল, অত্যধিক শীতে এবারে কয়দিন হইতে তুষার-পাত আরম্ভ হইয়াছে। বাংলা দেশে আজন্ম কাল লালিত পালিত মেয়েরা খুব আমোদের সহিতই ভোরের এ দৃশ্যটি উপভোগ করিতে চাহিত, কিন্তু এ সময়ে সহরে প্লেগের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল। সেই জন্য মহেশ বাবুকে সহর ছাড়িয়া কুটীরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিয়া এই বিদেশ বিভুঁয়ে পাছে মেয়েরা আবার এক বিপদ ঘটাইয়া বসে, এজন্য জ্যাঠাইমা বড় বেশী টিক্ টিক্ করিতেন, সুতরাং ভোরের বেলা ঘুম ভাঙিলেও লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকা ভিন্ন মেয়েদের আর কোনো উপায় ছিল না। সেই অবস্থাতেই যা গল্প স্বল্প ও দু' একটা গান চলিত। তবে অমিতাকে সব দিন আঁটিতে পারা যাইত না।

আজ অমিতা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া, গায়ে র‍্যাপার খানা জড়াইয়া, কুটীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। উন্মুক্ত প্রান্তরে, একদিকে পেয়ারা-বাগান, আর একদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে বিস্তীর্ণ অড়হর ক্ষেত্র। সবারি উপর তুষার-পাত হইয়া শ্বেতাভ দেখাইতেছে, বিস্ময়ে পুলকিত নেত্রে, চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক, ওদিকে চাহিবা মাত্র, পূর্ব্বাকাশে তাহার দৃষ্টি পড়িল। আকাশে উষার রক্তিম-রাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্ব তোরণদ্বার খুলিয়া ভগবান মরীচি-মালীর সপ্তাশ্ব রথ বাহির হইবার আর বিলম্ব নাই। দেখিতে দেখিতে কুঙ্কুম আভায় চারিদিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া পৃথিবীর বক্ষে শতধারে কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া অরুণোদয় হইল। সেই সোনালী আলোকদীপ্তিতে শুভ্রোজ্জ্বল তুষার রাশি একবার ঝিক্ মিক্ করিয়াই গলিতে আরম্ভ হইল।

অমিতা পরমানন্দে এ সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল, মহেশ বাবু হঠাৎ কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া, অমিতাকে এত সকালে, দারুণ শীতের সময়ে, চটি পায়ে ভিজা ঘাসের উপর দাঁড়াইতে দেখিয়া, শশব্যস্তে ডাকিলেন, খুকি, তুই তো বড় দুষ্টু, শীগ্‌গীর ঘরে আয়, ঠাণ্ডা লেগে এখুনি অসুখ কোরবে। অমিতা সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। পীতম চাকর চায়ের জল তৈয়ার করিয়া টেবিলের উপর আনিয়া রাখিল। মহেশ বাবু কহিলেন, এক পেয়ালা চা ঢেলে খেয়ে নে খুকি, যে ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস্ এই ভোরে। না, না, আমায় দিতে হবে না, তুই আগে এক পেয়ালা খেয়ে নে।

অমিতা হাসিয়া কহিল, আমার অসুখ হবে না কাকামণি, আপনি ঠাণ্ডাকে যত ভয় করেন, সে ততটা ভয়ের জিনিষ নয়, এই বলিয়াই অমিতা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগিল, নচেৎ সকাল বেলায় কাকামণির নিকট যে তিরস্কার বাক্যগুলি শুনিতে হইত, তাহা আদৌ শ্রুতিসুখকর হইত না।

মহেশ বাবুর জন্য চা ঢালিয়া হাতের কাছে দিয়া, অমিতা কহিল, রতিবাবুকে চা খাবার জন্যে বোলে দিয়েছিলুম, সাড়ে সাতটায় আস্‌বেন বোলেছেন, তা সাতটা তো বাজে।

মহেশ বাবু কাগজ ফেলিয়া দিয়া পেয়ালা হাতে লইয়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন, তা খুকি রতিকে আবার আসতে বোলে এলি কেন? ললিতার সঙ্গে তো—যাক্ সে সব কথা।

অমিতা কহিল, কাকামণি, রতিবাবুর সঙ্গে কি শুধু সেই সম্পর্কেই যাওয়া আসা ছিল? তিনি তো আমাদের ঘরের লোকের মতো আপনার হোয়ে গেছ্‌লেন। এতদিনের পর হঠাৎ দেখা, কাল আবার এক সঙ্গেই এলাহাবাদে এলুম, তাঁর দিদিরা প্রয়াগে মাঘ-মেলা দেখতে এসেছেন, কি বোলে তাঁকে আমাদের কুটীরে আসতে না বলি? সেটা কি ভাল দেখাত?

মহেশ বাবুর চা পান শেষ হইল। তাঁহার উদ্বিগ্ন ভাব মুখে বেশ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তিনি কহিলেন, খুকি, তুই ছেলে মানুষ, না বুঝে শুঝে কাজ কোরে বসিস্, আমরা সরকারের চাকর, যাকে তাকে——

অমিতা বাধা দিয়া, ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, যাকে তাকে কি বোল্‌ছেন কাকামণি? রতি বাবু কি এখন নিতান্তই বাজে লোক হোয়ে গেলেন?

মহেশ বাবু এই এক রোখা মেয়েটিকে খুবই চিনিতেন, তিনি বিরক্ত ভাবে

কহিলেন, এই সব রাজদ্রোহী যুবকগুলো, এরা আমাদের জাতির কলঙ্ক, এদের কোনও সংস্রব রাখা আমাদের উচিত নয়, এই-টেই বলা আমার উদ্দেশ্য।

মহেশ বাবুর একথা শুনিবার বহুপূর্ব্বেই অমিতা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং এই কথার একটা মীমাংসা করাই তাহার অভিপ্রায়। সে ধীরকণ্ঠে কহিল, কিন্তু মানুষ কি ভুল করে না? একবার যদি কেউ একটা অন্যায় করে, সে অন্যায়ের কি ক্ষমা নেই কাকামণি? আপনিই একটু বিবেচনা কোরে বলুন দেখি। আমরা যাকে যতটা দোষী বলে মনে করি হয় তো ততটা দোষ তার না হতেও পারে।

কথাগুলি মহেশ বাবুর বিবেককে যেন জাগাইয়া তুলিল, মহেশ বাবু মুখে যাহাই বলুন না কেন, অমিতা তাহার কাকামণির সরল, স্নেহপূর্ণ হৃদয়খানি ভাল করিয়াই চিনিত, এবং কেমন করিয়া, কোন্ সময়ে, কোন্ ভাবে কথা কহিয়া, তাঁহার চিত্তকে আয়ত্ত করিতে হয় উহা সে বেশ বুঝিত।

অমিতার কথায়, মহেশ বাবু বিরক্ত ভাবে—অথচ বেশ স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু মা, আমরা রাজকর্ম্মচারী, রাজার শুভাশুভের জন্য আমাদের দায়িত্ব বড় বেশী, আর সে দায়িত্ব খুবই বিশ্বস্তভাবে পালন করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, কাজেই বেশ হিসেবী হোয়েই আমাদের চোলতে হয়।

অমিতা সুযোগ বুঝিয়া উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল, কাকামণি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা যিনি, তিনি যদি আমাদের শত শত দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা কোরতে পারেন, তা হোলে মানুষ কেন মানুষের দোষ, ত্রুটি, ভুল মাপ কোরবে না? আপনিই তো আমাদের 'লা মিজারেবল' পড়িয়েছেন, জীন ভল্‌জীনের চুরির অপরাধ, সেই সাধু পাদ্‌রীটি প্রাণের সহিত ক্ষমা কোরে ছিলেন বোলেই তো এক দিনের ঘটনায় সে অত খানি মহৎ হোতে পেরে ছিল। সে দিন যদি সে আবার চুরীর অপরাধে জেলে যেতো তা হোলো তার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পৃথিবীতে কেউ জানতে পারতো না, মানুষের আদালতের বিচারে সে একজন পলাতক আসামী হোলেও ঈশ্বরের চোখে সে একজন বিশ্বাসী ও কর্ম্মী পুরুষ বোলেই প্রতিভাত হোয়েছিল। আপনিই বিশেষ কোরে আমাদের এ বিষয়টি বুঝিয়ে দেন নি কি কাকামণি?

মহেশবাবু ইহার উত্তরে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিলেন না, অমিতার মাতা গৃহের মধ্যে আসিয়া কহিলেন,—

সকাল বেলাই লেক্‌চার আরম্ভ করেছিস্ খুকি, আচ্ছা মেয়ে যা হোক্। ঠাকুরপোও যেমন আস্ত পাগল, তাই ওর সঙ্গে আবার তর্ক করেন। রতি আর বিশু যে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ও মেয়েদের তো এখনও ঘুম ভাঙার নামটি নেই।

মহেশবাবু শশব্যস্তে কহিলেন, খুকি, তুই চেয়ার দু'খানা এই দিকে টেনে দে, বৌ, তুমি শুচিতাকে তুলে দাও গে, নবেন্দুরও* কি আজ এখনও ঘুম ভাঙে নি?

অমিতার সহিত খুঁটি নাটি বিষয়ে তর্ক করা মহেশ বাবুর নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস, হার জিতের সাক্ষী শুচিতা ও ললিতা। অমিতা বড় সাক্ষীর ধার ধারে না, হার মানিবার উপক্রম হইলে, তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইবামাত্র, মহেশ বাবুর সকল তর্ক ও যুক্তি নিষ্ফল হইয়া যায়।

চতুর্দ্দশ

দুপুর বেলায় চিন্তামণি কাজ কর্ম্মের অবসরে রতির চিঠিখানি পড়িতেছিলেন। চিঠি কাল আসিয়াছে, রতিকান্ত এলাহাবাদে গিয়াছে, সেখানে মহেশবাবুদের সহিত সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে শ্রীকান্ত বাবুর চিঠির উত্তরে মহেশবাবু জানাইয়াছেন যে, ললিতার বিবাহ ঘটনা-ক্রমে নবেন্দু নামে একটি ব্যারিষ্টারের সহিত ঠিক হইয়াছে, তবে তিনি আশা করেন, রতিকান্তের ন্যায় পাত্রের জন্য সৎ পাত্রীর অভাব হইবে না. শ্রীকান্ত বাবুর, কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা নয় যে,এমন সময়ে রতিকান্তর বিবাহ দেন, কেবল গৃহিণীর পীড়াপীড়িতেই তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন। মহেশবাবুর প্রত্যাখান তাঁহার অপমান বলিয়াই মনে হইয়াছিল। যে পুত্রগণের গৌরবে তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ পিতা বলিয়া মনে করিতেন, অদৃষ্ট-চক্রে আজ বৃদ্ধ বয়সে সেই পুত্রের জন্য তাঁহার ন্যায় মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লোকের নিকটে অপমানিত হইতে হইতেছে, এই সকল নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার চির-শান্ত-স্বভাব কিছু চঞ্চল ও নীরস হইয়া উঠিয়াছিল, আর সে নীরসতার সংস্পর্শে চিন্তামণির চিন্তাদগ্ধ হৃদয় দিনে দিনে নিতান্তই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

---

* পূর্ব্বে ভ্রম-ক্রমে নরেন্দু হইয়াছে, প্রকৃত নাম নবেন্দু।

চিন্তামণি, এই চিঠিখানি পড়িয়া যখন স্বামীকে বলিলেন, ওগো রতি কমলাকে নিয়ে এলাহাবাদে গেছে, সেখানে মহেশ বাবুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। রতির খুব ইচ্ছে ছিল যে, ললিতার সঙ্গেই বিয়ে হয়, আর সে মেয়েও তো ছেলে মানুষ নয়, সেও তো রাজী হয়েছিল, তবে বোধ হয় বাপের হুকুমে নবেন্দুকে বিয়ে কোরতে চেয়েছিল, রতির সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে তখন হয় তো মহেশবাবু সে সম্বন্ধ ভেঙে দিতেও পারেন।

শ্রীকান্ত বাবু অদূরদর্শী স্ত্রী-বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, এ ছেলে খেলা কি না, তাই ব্যাপারটাকে তোমার মনগড়া মতো গড়ে নিচ্ছ, আমি কিন্তু আজ স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, ছেলের বিয়ের আর এখন নাম কোরো না, অন্ততঃ আমার আছে ধন্না দিও না। নিজে কোনো জোগাড় কোরতে পারো, বিয়ে দিয়ো। আর ছেলেকে চিঠি লেখো, সে যেন পত্র পাঠ এখানে চোলে আসে। তাকে পাঠানো হোলো কমলাকে দেখতে, সে আবার সেখান থেকে তীর্থ ভ্রমণে রওনা হোলো। একবার আমাকে একখানি চিঠি লিখেও জানাতে পারলে না, লেখা পড়া শিখে চিনির বলদ হয়েছে।

মোট কথা রতিকান্ত কারামুক্তির পর, হঠাৎ বাড়ী ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাওয়ায়, শ্রীকান্ত বাবুকে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য পুলিশ হইতে তলব হইয়াছিল, অবশ্য ইহা কিছু অন্যায় হয় নাই, এবং শ্রীকান্ত বাবুর উত্তরে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু জনরবে সে কথা গুলা ডাল পালায় বিস্তৃতি লাভ করিয়া লোকের দিবা অবসরে—সান্ধ্য-সভায় আলোচনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, উহার আঘাতে শ্রীকান্তবাবুর মস্তিষ্ককে যেন বিকৃত করিয়া তুলিতেছিল।

চিন্তামণি আজ চিঠিখানি লইয়া, স্বামীর তিরস্কার সত্ত্বেও ভাবিতেছিলেন, রতির সহিত ললিতার বিয়েটি হোলে বেশ হয়। ললিতার বাপের সাহেবী চাল চলন সত্ত্বেও, ললিতার লাজ-নম্র, শান্ত স্বভাব ও কথাবার্ত্তায় এবং দিব্য শ্রীখানিতে চিন্তামণির মন খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। ললিতা পিতার একমাত্র কন্যা,—চিন্তামণি পুত্রের বিবাহ দিয়া টাকার আকাঙ্ক্ষা না করিলেও, এ ক্ষেত্রে আপনা হইতে যখন টাকার আগমন সম্ভাবনা আছে, তখন তাহা উপেক্ষা করাই বা চলে কি প্রকারে? চিন্তামণি ভাবিয়া চিন্তিয়া পুত্রকে বাড়ী ফিরিবার জন্য পিতার আদেশ জানাইলেন, এবং সেই সঙ্গে ললিতার কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, রতিকান্তর উত্তরে আসল কথাটা তিনি জানিতে পারিবেন। পুত্র-স্নেহান্ধ

জননী বুঝি ভাবিতেছিলেন, তাঁহার পুত্রের ন্যায় পাত্রকে হাতের কাছে পাইয়া মহেশ বাবু কখনই অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না।

এমন সময় পাড়ার নেত্য নাপ্তিনী, তাহার বেঁটে খাট খর্ব্ব বিপুলায়তন দেহখানি লইয়া হেলিতে দুলিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, কি হচ্ছে মা, রতিদাদার চিঠিপত্তর এলো কিছু ?

চিন্তামণি কহিলেন, হ্যাঁ মা, তাকে শীগ্‌গীর কোরে আসতেও লিখলুম। তুমি একটি ভাল দেখে কোনে খোঁজ করো, মহেশ বাবুর মেয়ের সঙ্গে বোধ হয় বিয়ে হবে না।

নেত্য উৎসাহের সহিত কহিল, তা না হোক, ও সব ম্লেচ্ছ ঘরের মেয়ে আমাদের হিঁদুর ঘরে না আসুক; আপনার ভয় কি মা, সোণার চাঁদ ভাইটির জন্যে পরীর মতো মেয়ে আনবো, তোমার বড় বৌ, ছোট বৌ, সবাইকে টেক্কা দেবে এমন মেয়ে আনবো, তবে আমি ছাড়বো।

বড় বৌ সেই সময়ে শাশুড়ীকে পান দিতে আসিয়াছিল, নেত্যর কথায় হাসিয়া কহিল, কি নেত্য ঠাকুরঝি, কিসের টেক্কা আনবে—চিড়িতনের না ইস্কাবনের ? আমরা কিন্তু হরতনের বিবি না হোলে নেবোই না।

পঞ্চদশ

অমিতা, হরদাদাকে এক পেয়ালা চা আনাইয়া দিবামাত্র, হরদাদা কহিলেন, ওটি হবে না দিদি, আমি গরমের মোটে পক্ষপাতী নই, কিন্তু নরমের ভক্ত। আমায় এক গ্লাস্ চিনির পানা এনে দাও খুসী হোয়ে খাবো। আর এ সব কেক্ বিস্কুটও আমার পেটে সইবে না, দেশী বিস্কুট মুড়ি বরং হোলে আর সন্দেশ দু' একটা পেলেও মন্দ হবে না।

বিশু কহিল, দুটো সন্দেশে তোমার কি হবে দাদা ? তুমি যে বলো দুগণ্ডা না খেলে আর জল খাবার কি ?

হরদাদা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, তা আমার দিদিরা আমায় দু গণ্ডাই খাওয়াবে—কি বলো অমিতে দিদি ?

শুচিতা কহিল, মা কাল ঘরে সন্দেশ তৈরি করেছেন, আপনি যত ই'চ্ছ খান্ না কেন ? কিন্তু সরবৎ এই শীতের সময়ে আপনার খাওয়া ঠিক হবে না।

মহেশ বাবু কহিলেন, তোরাও যে ক্ষেপেছিস্ ? এখন সরবৎ খেলে সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি হবে। আপনি এক পেয়ালা গরম চা খান্ মশাই, কাল সন্ধ্যের সময় যে জল ঘেঁটেছেন।

রতিকান্ত হাসিয়া কহিল, দাদা আমাদের চাতে বড় নারাজ। হত্তুকীর জল, আর সরবৎই ওঁর প্রধান পানীয়।

মহেশ বাবু কহিলেন, মিষ্টি খাবারগুলো বড় খারাপ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার গোড়াই হচ্ছে ওরা——

বাধা দিয়া হরদাদা কহিলেন, আমি তো মশাই তা স্বীকার করতে পারি না, বরং আপনার চাতে ও কথা বোলতে পারেন। উপস্থিত সকলেরই অতি প্রিয় জিনিষটির এত বড় অপবাদ কেহই সহিতে পারিলেন না, কিন্তু কেহ কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই খাকমণি আসিয়া বলিল, ঝমুয়ার বাবা একবার দাদাঠাকুরকে যেতে বোলে গেল।

অমিতা কহিল, আচ্ছা, জল খেয়ে যাবেন এখন। গত কল্য একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল, হরদাদা সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে আসিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটি বছর পাঁচেকের ছেলে কূয়ার ধারে দাঁড়াইয়া বালতি নামাইয়া জল তুলিতে যাইতেছে, বালতি জলে পড়িবামাত্র উহার হেঁচ্‌কানীর ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া বালক কূয়ায় পড়িয়া গেল, হরদাদার সঙ্গে বিশুও আসিতেছিল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং হরদাদা মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের জামা জুতা টান দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া কূয়ায় নামিয়া পড়িলেন, কূয়াটি খুব গভীর, যাহা হউক, হরদাদা অবিলম্বে উঠিতে পারিলেন। ততক্ষণে কূয়ার পাড়ে মহাজনতা জমিয়া গিয়াছিল, এবং বালকের পিতা মাতা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ বালক জল খায় নাই, কিন্তু তাহার মাথায় চোট লাগিয়াছিল। হরদাদার সাহস ও কৃতিত্বে সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল, এবং সকলে দুই হাত তুলিয়া হরদাদার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। ছেলেটির কোনও ভয় নাই, কিন্তু মাথার আঘাতের দরুণ একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছে, হরদাদা সকালে আসিয়া খোঁজ লইবেন বলিয়াছিলেন, সেই জন্যই ছেলেটির পিতা হরদাদাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।

হরদাদার সহিত মহেশ বাবুর পূর্ব্বে আরও অনেকবার দেখা শোনা হইয়াছে, তবে মেয়েদের সহিত আলাপের সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু বিন্ধ্যাচলে কয়দিনেই আলাপ বেশ জমিয়া গিয়াছে এবং হরদাদার স্বভাবের গুণে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। মহেশ বাবু কল্যকার ঘটনা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, আপনার সাহসও খুব এবং শরীরে শক্তিও আছে, নইলে কূয়ায় নামা বড় কঠিন, বিশেষ এখানকার কূয়া ভয়ানক গভীর।

হরদাদা কহিলেন, রতির সাহস কিছু কম নয়। আপনারা সেবারে নদী থেকে সেই একটি স্ত্রীলোককে ওর উদ্ধার করার কথা শোনেন নি বোধ হয়, একটি স্ত্রীলোক স্নান করছিল, এমন সময়ে 'কুমীর কুমীর' কোরে সকলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, স্ত্রীলোকটি ভয় পেয়ে উঠ্‌তে যাবে কি ডুব জলে পড়ে গেল, কুমীরটা এসে পোড়লো আর কি ? আমি আর রতি স্নান কোরে উঠে ঘাটে দাঁড়িয়ে মাথা মুছ্‌ছি, রতি ঝপ্‌ কোরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, সকলে হায় হায় কোরে উঠ্‌লো, কেন না কুমীর একটাকে তো নেবেই, তা একটা বুড়ী, শাকওয়ালীর প্রাণের চাইতে, একজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান যুবার জীবনের মূল্য ঢের বেশী, কিন্তু রতি চক্ষের নিমেষে, এক হাতে বুড়ীকে ধোরে নিয়ে এক হাতে জল ঠেলে কিনারার দিকে আস্‌তে লাগলো, আমিও জলে পড়েছিলুম, ওদিকে লোকেরা বড় বড় ইঁট পাথর ছুঁড়ে কুমীরের গায়ে মারতে লাগলো, আর সে বোধ হয় থতো মতো খেয়ে আর এগুতে সাহস করলে না, কিন্তু দেখে শুনে, সেই কালান্তক যমের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে আনা কি কম সাহসের কথা ?

নিজের প্রশংসায় রতিকান্ত যেন সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু মেয়েদের সপ্রশংস দৃষ্টি তাহাকে যে অন্তঃকরণের সহিত অভিনন্দন করিতেছে ইহাতে তাহার আনন্দও হইল, তবে মহেশ বাবুর মুখের ভাবে মনে হইতেছিল তিনি যেন ভাবিতেছেন, এতো যদি বুদ্ধি ও সৎ সাহস তা হোলে এতো বড় অন্যায় কাজটা করে বস্‌লে কেন বাপু ?

নবেন্দু এ সকল কথাবার্ত্তার দিকে আদৌ মন না দিয়া নিবিষ্টচিত্তে বুঝি খবরের কাগজ দেখিতেছিল, কিন্তু তাহার ঘন ঘন দৃষ্টি পড়িতেছিল সেই দিকে, যেখানে শুচিতা ও অমিতার মাঝখানে ললিতা বসিয়া শুচিতার হাতের চুড়ি কয়গাছি বারবার নাড়াচাড়া করিতেছিল। হরদাদার কথায় যখন তাহারও প্রশংসমান দৃষ্টি রতিকান্তের উপর পতিত হইল, উহা নবেন্দুর দৃষ্টি এড়াইল না, এবং তাহার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। মোট কথা কয়দিন হইতে নবেন্দুরও মন ভাল ছিলনা। তাহার বেশ ধারণা হইয়াছে, রতিকান্তকেই ললিতা ভালবাসে। সে মনে করিয়াছিল, অমিতা বা শুচিতাকে দু' এক কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু পাছে মহেশবাবু বাঁকিয়া বসেন, সেজন্য সাহস করে নাই, যেহেতু অমিতার কানে কোনো কথা গেলেই সে গোলমাল করিয়া বসিবে, এবং মহেশবাবুরও অগোচর থাকিবে না। চতুর নবেন্দুরও স্বভাবতঃ বিষয়-বুদ্ধির অভাব ছিল না। সে এটা বেশ জানিত, খামকা এতো

টাকা হাত ছাড়া করা বুদ্ধিমানের কায নয়, আর স্ত্রীলোককে একবার স্বামীর অধিকারে পাইলে, পরে তখন তার নভেলিয়ানা প্রণয়-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া কিছু কঠিন হইবে না, তবে মিছামিছি একটা গোলমাল সৃষ্টি না করিয়া বরং বিবাহের চেষ্টা শীঘ্র শীঘ্র করাই ভাল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

করুণা

—:*:—

যে দিন জননি, বিশ্বের কোলে আপন করুণা ছড়ায়ে দিলে,
আপনার হাতে বিশ্ববাসীর স্বেদ অশ্রু-জল মুছায়ে নিলে।
সে দিন তোমার করুণা-কণা বিশ্ব-ভবনে ভাতিয়া উঠিল,
বিশ্বের মাঝে তৃপ্তির শ্বাস নীরবে যেন গো বহিয়া গেল।

সে দিন যেন গো তরুণ তপন কণক কিরণে আবরি' দেহ,
উষার ললাটে ভাতিয়া উঠিল, উজলি' এই বিশ্ব গেহ !
সে দিন যেন গো মলয় সমীর শীতলি' দেহ বিশ্ববাসীর,
পুষ্প-পরাগ মাখিয়া গায় বহিয়া গেল নীরব ধীর।

সে দিন যেন গো পূর্ণ চাঁদিমা রৌপ্য আভা মাখিয়া দেহে,
বিশ্বের মাঝে আপন গরবে উঠিল ফুটিয়া কি এক মোহে।
সে দিন যেন গো এ মর ভুবন জোছনা তরঙ্গে গেল গো ভাসি',
মৃদুল মধুর কাহার পরশে ফুটিল গো সব কুসুম রাশি !

সে দিন যেন গো কল কল নাদে ছুটিল তটিনী সাগর আশে,
গভীর-মন্দ্রে গরজি' উঠিল জীমূতরাজি দিগন্ত পাশে.
সে দিন যেন গো প্রকৃতির মাঝে মিলনের সুরে গেল সব মিশি,'
সারাটি বিশ্বে আপনা হারায়ে ভেদ গেল মিশি অভেদে আসি'।

শ্রীহাজারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

বস্ত্র-সমস্যা—সম্প্রতি বস্ত্র-সমস্যা সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধে লেখক দেশের অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থানে বলিয়াছেন, "একটা ধুয়া উঠিলেই সমগ্র দেশ সেই হুজুগে মাতিয়া উঠিবে, ঘোরতর বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রাদিতে আলোচনা হইবে, কিন্তু একজনও আদর্শ দেখাইতে অগ্রসর হইবে না, এই হইল দেশের মামুলী চাল।"

সংবাদ পত্রে আন্দোলন করা সকল সভ্যদেশের রীতি। আমাদের দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা যে অস্বাভাবিক কিংবা অনাবশ্যকীয় তাহা আমরা বলি না। কাজে আদর্শ দেখান শক্তির কাজ, শক্তির অভাবে আদর্শ দেখাইতে না পারিলেও অভাব-জনিত পীড়ন-ক্লেশে চীৎকার করিতে কেহ বিরত হয় না। শক্তির অভাব যেমন হঠাৎ হয় না, শক্তি সঞ্চয়ও তেমন হঠাৎ হয় না।

বস্ত্র-ক্লেশ চরমে উঠিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন চারিদিকে "চরকা বসাও" "তুলার চাষ কর" রব উঠিয়াছে—উঠিবেই তো। এর মধ্যে আমাদের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের একটি বন্ধুর আসন্নকালে যখন তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন আর ১০।১৫ মিনিট পরেই তাঁহার শেষ নিশ্বাসটুকু পড়িবে, এমন সময় তাঁহার পত্নী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "ওগো, তোমরা একটু আগুন করে ওঁর বুকে সেক্ দাও।"

বর্ত্তমান বস্ত্র-সমস্যায় আমাদের যাহা মনে হইয়াছে তাহা এতদিন আমরা কাগজে কলমে প্রকাশ করি নাই। অবশ্য অনুমান যদি সত্য হয়, সময় তাহা নির্দ্দেশ করিবেই। তখন সে কথার অর্থ হয় তো কেহ কেহ বুঝিতে আরম্ভ করিবেন।

সম্প্রতি একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের একটি প্রবন্ধ মধ্যে আমাদের ধারণার অনুকূলে একটু আভাস দেখিতে পাইলাম। তা ছাড়া আমাদের মন্তব্য প্রকাশের আর একটি প্রয়োজন সম্মুখে অনুভব করিতেছি, তাই আমাদের "বস্ত্র সমস্যার" মন্তব্যটুকু প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের বিশ্বাস এ দেশের দ্বারা এদেশের বস্ত্রাভাব দূর করা কখনই

সম্ভবপর হইবে না। বস্ত্রের জন্য বিদেশের প্রতি নির্ভর করিতেই হইবে তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। প্রয়োজন হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহা বলা হইবে।—এখন উপস্থিত বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি যদি আরও হইতে থাকে, তবে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত তাহার প্রতিকার হইবে না। দেশী চরকার প্রচলন হউক - তুলার বীজ বপনের চেষ্টা হউক, আমরা তাহার প্রতিবাদী নহি। তবে ইহাতে আমাদের ঐ বন্ধুর আসন্ন মৃত্যুকালে বক্ষে অগ্নি-তাপ দেওয়ার কথাই মনে পড়ে। ফলে যত দিন যুদ্ধ না মিটিবে—যত দিন জাহাজ চলাচল নিরাপদ না হইবে, তত দিন বস্ত্রের মূল্য কমিবে না। বয়োবৃদ্ধ লোকে যেমন বলেন, "যতকাল বেঁচেছি আর ততো দিন বাঁচিব না" সেইরূপ যুদ্ধ যত দিন চলিয়াছে, আর ততো দিন কখনই চলিবে না। ইতিমধ্যে দেশের গরীব লোকদিগের বস্ত্র-ক্লেশ নিবারণের দায়িত্ব স্বভাবতঃ দেশের ধনী, দয়াবান্, সমাজ-হিতৈষীগণের উপর পতিত হইতেছে। বস্ত্র-ক্লেশ আরো চরমে উঠিলে গভর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসীর দ্বারা তাহার প্রতিকার চেষ্টা না হইলে দেশে অশান্তির সম্ভাবনা।*

শেষে একটি অপ্রিয় সত্য বলিব। ৬৲ টাকা জোড়া কাপড়, তথাপি দেশের বহু লোকে দামী মিহি কাপড় পরা ছাড়িতেছেন না কেন? মোটা কাপড় পরিতে কষ্ট হয়? গরীবের দুঃখে তদপেক্ষা কষ্ট বোধ হয় না? বাড়ীর ১০ জোড়া কাপড়ে ১০৲ টাকাও দাম কমাইয়া ছিন্ন বস্ত্র—নিঃবস্ত্র প্রতিবাসীর অভাব পূরণের ইচ্ছা হয় না? দেশের চিন্তাহীন আচরণ দেখিলে মনে হয় না কি যে, কষ্ট যাহাদের হইয়াছে, তাহাদেরই হইয়াছে, কিন্তু দেশের বহু লোকের বুঝি এখনও তেমন কষ্ট হয় নাই। হাহাকারটা মুখেই বেশী ; চাপ পড়িলে মানুষ কতদূর বহন করিতে পারে সে নিজেই তাহা জানে না।

স্বাস্থ্য—"কুশদহতে" আমরা বরাবরই কিছু কিছু স্বাস্থ্য-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আসিতেছি—আমরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাহা বলি, তাহা কেবল পুস্তকে পড়া জ্ঞানের কথা নহে, উহার সঙ্গে কিছু কিছু পরীক্ষিত সত্যও থাকে। আমাদের বিশ্বাস, শরীর সুস্থ রাখা বহু পরিমাণে মানুষের আয়ত্তাধীন। অর্থাৎ আয়ুর্বর্দ্ধন বা আয়ুক্ষয় মানুষ নিজেই করিতে পারে। এই মহাসত্যে বিশ্বাসও স্বাস্থ্য সাধনের পরম সহায়। কেবল স্বাস্থ্য-তত্ত্ব পাঠ করিয়াই

* কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে এই প্যারাগ্রাফটি লিখিত হয়। (সম্পাদক)

কেহ সুস্থ শরীর লাভ করিতে পারেন না। সুস্থ শরীর লাভ করিতে হইলে এক প্রকার সাধক ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। জ্ঞান এবং মানসিক সদ্ভাবনিচয়ের সহিত স্বাস্থ্যের অক্ষুণ্ণ যোগ। অবস্থাকে অনুকূল করিয়া লইতে হয়। নতুবা কোন সাধনাই হইতে পারে না। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে জ্ঞানের সঙ্গে মানসিক বলের আবশ্যক। দৃঢ়তা ভিন্ন কোন সাধনেই সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে সকল দেশের সকল জ্ঞানী, সাধক, এবং চিকিৎসকগণ বহু উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, তাহার মধ্যে মূল সূত্রের ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। যাঁহারা সাধক তাঁহারা অবান্তর কথা ছাড়িয়া ঐ মূল সত্যেই উপনীত হইয়া থাকেন। স্বাস্থ্যের প্রধান সহায়, মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল জল,ব্যায়াম এবং সর্ব্বোপরি প্রসন্ন চিত্ততা। এইকথা সকলেই বলিয়াছেন. এখনও ভারতের শত সহস্র সাধক, যোগীগণ ঔষধ এবং চিকিৎসকের সম্বন্ধ বিরহিত হইয়া কি উপায়ে সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু সম্ভোগ করিতেছেন, সে কথা এখানে বলিতেছি না। কতকগুলি পাশ্চাত্য জ্ঞানী ও চিকিৎসকের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক পাঠিকাগণ ইহা হইতেও কিছু সাহায্য গ্রহণ করিবেন কি?

"স্যার এডওয়ার্ড রিচার্ডসন্, এম্-ডি, বলিয়াছেন--"মানুষের স্বাভাবিক পরমায়ু ১১০ বৎসর। যদি কেহ সাত্ত্বিকভাবে উপদ্রব শূন্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ততদিন বাঁচিতে সক্ষম হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন—"পীড়ার (গতিরোধ) জন্য ধর্ম্ম এবং মিতাচারই প্রকৃষ্ট গণ্ডী। অধর্ম্ম এবং অমিতাচার করিবামাত্র রোগ সেই গণ্ডী পার হইয়া আক্রমণ করে।"

প্রফেসার জোসেফ এস্মাইল, এম্-ডি, বলিয়াছেন—"ঔষধে (প্রকৃত পক্ষে) রোগ আরোগ্য হয় না, রোগ আরোগ্য হয় (Nature's) প্রকৃতির আরোগ্যকারী ক্ষমতায়।"

মেডিকেল কাউন্সেলের ডাক্তার পল নিমেষার বলিয়াছেন—"মানুষের যখন পীড়া হয়, তখন ঔষধ যে দিন হইতে বন্ধ হয়, সেই দিন হইতেই প্রকৃত আরোগ্যের সূত্রপাত হয়।"

বেকন বলেন,—“যাহারা পান ভোজনে মিতাচারী, ঔষধ তাহাদের অনাবশ্যক বস্তু।”

রিচার্ড বলিয়াছেন,—“আমি বলি, তুমি তোমার অর্দ্ধেক ডাক্তারকে বিদায় দিয়া কেবল বায়ু, আকাশ, এবং জল, এই তিন চিকিৎসকের চিকিৎসায় থাকো, আরোগ্য হইবে।”

কবি লংফেলো বলিয়াছেন,—“মিতাচারী হও, এবং ডাক্তারের নাকের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া থাকো।”

ডাক্তার এস্‌লি কুপার বলিয়াছেন,—“অনুমান হইতে ভেষজ সমূহের উৎপত্তি, এবং নরহত্যা দ্বারা তাহার উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে।”

নেপোলিয়ন যখন সেণ্ট হেলেনায় পীড়িত, তখন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার চিকিৎসকগণকে বলিয়াছিলেন, “এই ঔষধপত্র গুলা ফেলিয়া দাও, ইহা না ব্যবহার করাই মানবের পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ মানব জীবন একটা দুর্গবৎ, সেই দুর্গের তুমিও কিছু জানো না, আমিও কিছু জানি না, তবে কেন তাহার আত্ম-রক্ষার পথে বাধা দাও, আত্ম-রক্ষার্থে তাহারই মধ্যে যে শক্তি, বল, উপায় আছে, তাহা তোমাদের সমুদয় অস্ত্র, শস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

এইবার একখানি সাময়িক পত্রের একটি প্যারা উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত বক্তব্য শেষ করিব।

“বন্য ইতর প্রাণীদের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায়, স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা সুন্দরভাবে আত্ম-রক্ষা করিয়া থাকে। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের নরনারীর স্বাস্থ্য দেখিলে কি মনে হয়? যত চিকিৎসা হইতে দূরে থাকা যায়, ততই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পরমেশ্বর এই দেহেই এমন সকল দ্রব্য দিয়াছেন যে, তাহা দ্বারায় স্বভাবের নিয়মে চলিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে।” (কাজের লোক)

যুদ্ধের অবস্থা—যুদ্ধের অবস্থা বেশ ভাল বলিয়াই বোধ হয়। মিত্র-সৈন্য সর্ব্বত্রই অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজ সৈন্য, ফরাসী সৈন্য, মার্কিন সৈন্য সকলেই পূর্ণবেগে অগ্রসর হইতেছে। গত সপ্তাহেও অগ্রগমনের বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, এবার শীতের পূর্ব্বেই যুদ্ধের শেষ হইবে। তুরস্কের কর্ত্তারাও যেন সেই মতে মত দিতেছেন। তাঁহারাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই।—বলা বাহুল্য এখনও যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা অসম্ভব। তবে এ কথা বলা

যাইতে পারে যে, আগামী দুই মাসের কার্য্যের উপর যুদ্ধ শেষ হওয়া না হওয়া অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। (বাঙ্গালী)

বস্ত্র-ক্লেশ-নিবারণী-সভা—বরিশালে কয়েকটি বস্ত্র-ক্লেশ-নিবারণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সভার সভ্যগণ পটুয়াখালী ও বরিশালের পল্লীগ্রামে ঘুরিয়া দীন দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে বস্ত্র দান করিতেছেন। (এডুঃ গেজেট)

মাতৃ-নিকেতন—অসহায় বালকবালিকা ও নিরাশ্রয়া, বিপন্না অবলাদিগকে আশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে একবিংশ বর্ষ অতীত হইল এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া-চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত শতাধিক বালিকা ও বয়স্কা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ২৬টি বিবাহিতা হইয়াছে। কেহ কেহ ভাল হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে এবং কেহ কেহ ধাত্রী ও চিকিৎসা শিক্ষাদি লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছে। অধুনা আশ্রমের সেবকসেবিকাদিসহ সর্ব্বসমেত ১১ জন নিকেতনে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে।

মাতৃ-নিকেতনের সংশ্লিষ্ট ও পল্লীবাসী বালিকাগণের শিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। উহাতে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুলের ৭ম শ্রেণীর অর্থাৎ মধ্যবাঙ্গালা ও ইংরাজী উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। বোর্ডিং ও শিক্ষার ব্যয় বালিকা প্রতি মাসিক ৬ টাকা মাত্র। বালিকাদিগকে ধর্ম্মনীতি ও গৃহস্থালী সমুদয় কার্য্যকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

দীনজনাশ্রয় পরম পিতামাতা পরমেশ্বর এই নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ও একমাত্র প্রতিপালক ও সহায় সম্বল। তাঁহার প্রেরণায় ইহার সাহায্যার্থে দয়া করিয়া যিনি যাহা প্রদান করিবেন, তাহা সাদরে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে গৃহীত হইবে।

মাতৃ-নিকেতন,
খিলগ্রাম,
পোঃ রমনা, ঢাকা

বিনীত নিবেদক
দাস শশিভূষণ মল্লিক
সেবক।

প্রাপ্তি-স্বীকার

সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "দেবালয়ের" নাম ও তাহার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা আজ জগতময় প্রচারিত। এই দেবালয়ের মুখপত্র স্বরূপ "দেবালয়" নামে একখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রথমাবস্থায় কিছুদিন প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ইংরাজী বাংলা পুস্তকাদি দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধন হওয়ায় বোধ হয় মাসিক পত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি জুলাই মাস হইতে ইংরাজী ভাষায় "দেবালয় রিভিউ" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র আবার প্রকাশিত হইতেছে। কোনো স্বতন্ত্র মত গঠনের জন্য দেবালয়ের জন্ম নয়, কিন্তু জগতে যত ধর্ম্ম-মত বা মণ্ডলী আছে, অবিরোধে সকলের সারতত্ত্ব আলোচিত, সমাদৃত এবং সাদরে গৃহীত হইবার উদ্দেশ্যে এবং সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে সহানুভূতি দানার্থই দেবালয়ের প্রতিষ্ঠান। এই সার্ব্বভৌমিকতা প্রচারই আবার দেবালয়ের বিশেষত্ব। জগতবাসীর নিকট এই মহান্ ভাব প্রচারের জন্য বাংলা মাসিক পত্রের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান সময়োপযোগী ইংরাজী ভাষার পত্রিকাই উপযুক্ত। এই জন্যই আমরা "দেবালয় রিভিউ"য়ের জন্মে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। তবে রিভিউয়ের কলেবর আরো কিছু পুষ্ট হইলে যেন ভাল হয়। দেবালয় ২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা আর একখানি সুন্দর উপাদেয় গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি 'মাইকেল চরিত' ও 'পৃথ্বীরাজ কাব্য' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ প্রণীত ভক্ত "তুকারাম চরিত।" দুঃখের বিষয় সময়াভাবে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে পারি নাই। তবে যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, ভক্ত তুকারামের জীবনী একেই তো মিষ্ট-মধুর—তাহাতে ভাবুক ভক্ত-কবি সুলেখক যোগীন্দ্র বাবুর লেখনী স্পর্শে কোনরূপ ত্রুটি না ঘটিয়া বরং সংযত ও সরস ভাষার সমাবেশে সুন্দরই হইয়াছে। ভক্ত জন মাত্রেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহে তৃপ্ত হইবেন। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, চরিত্র অঙ্কণটি সম্পূর্ণ অসম্প্রদায়িক ভাবের হইয়া সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে।

"সতুর মা'। এখানি গল্প পুস্তক। শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। মূল্য ১। ০ এক টাকা চারি আনা। বাঁধাই, ছাপা, ও ভাল কাগজ। সতুর মা গল্পটি ১৩২০ সালের 'কুশদহতে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বার বার ইহার প্রুফ দেখিবার সময় আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ যিনিই উহা পাঠ করিবেন, তিনিই আমাদের এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ইহাতে সর্ব্বসমেত সাতটি গল্প আছে। তাহার মধ্যে পাঁচটি 'কুশদহে প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

—:o:—

আমরা এবার উপর্য্যুপরি কয়েকটি মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। গত ২রা ভাদ্র সোমবার খাঁটুরা দত্ত-বাটীর স্বর্গীয় বসন্তকুমার দত্ত মহাশয়ের ধর্ম্মশীলা পত্নী—পরম শ্রদ্ধেয়া পতিতপাবনী দেবী, সপ্ততিবর্ষাধিক বয়সে, তাঁহার কলিকাতা আহিরীটোলা শঙ্কর হালদার লেনস্থ নিজ ভবনে পরলোকগতা হইয়াছেন। কুশদহ-খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গার তাম্বুলী সমাজের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা, অথবা উন্নতমনা উচ্চ সংস্কারাপন্না মহিলার সংখ্যা একান্ত অভাব বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন যে, আজ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রেণীর মধ্যে খাঁটুরা দত্ত-পরিবারে একটি নবোঢ়াবধূর হৃদয়ে কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম বিশ্বাসের বল এবং স্বদেশ-হিতৈষণা প্রকাশ পাইয়াছিল। যাঁহারা "কুমুদিনী-চরিত" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা জানেন। ৫০ বৎসর পরে ভগবৎ প্রসাদে আজ কুশদহর এতটুকুও অবস্থার পরিবর্ত্তন আসিয়াছে যে, যাঁহার জীবনী বন-কুসুম সদৃশ, বনে ফুটিয়া বনেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল,—যে বিশ্বাসের মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া সমাজ তদুপরি কত নিন্দা-নির্য্যাতন-কালিমা দিয়া নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ সেই স্বর্গীয়া দেবী কুমুদিনীর নাম আমরা পরম গৌরবের সহিত উচ্চারণ করিতেছি। আজ যাঁহার নশ্বর-দেহের অবসান-বার্ত্তা পত্রস্থ করিতেছি, ইনি সেই দেবী কুমুদিনীর সহোদরা। ইনি নীরবে দীর্ঘকাল ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন, ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ এক প্রকার অগ্রজার অনুবর্ত্তনেই হয়। কিছুকাল পরে ইনি

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা হইয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত অটল বিশ্বাসে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া ভক্তি-সাধন করিয়াছিলেন। নিজের পুত্র কন্যা ইঁহার কিছুই ছিল না, কিন্তু জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিধবা পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী, নিজ ভাগিনেয় প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ লইয়া যেন তাঁহার একটি বড় সংসার ছিল। আমরা এই গরীয়সী মহিলার জীবনী সম্বন্ধে এখন আর অধিক কিছু বলিতে পারিলাম না, তবে মনে হয় ইঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থে ইঁহার আত্মীয়বর্গ যদি কোনো চেষ্টা করেন,যাহাতে অন্তত কুশদহ তাম্বুলীশ্রেণীর বালিকা-শিক্ষা কল্পেও কিছু ব্যবস্থা হইতে পারে। তাঁহারা তাহা করিতে ইচ্ছুক হইবেন কি?

দ্বিতীয়টি অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক—বেড়গুম নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৩৯ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র রাজেন্দ্রনাথ সহসা নিমোনিয়া রোগে গত ৯ই ভাদ্র সোমবার দেহত্যাগ করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুদিন বিপত্নীক। পুত্রবধূ এবং একটি মাত্র শিশু পৌত্রী লইয়া তাঁহার বেড়গুমের বাস এবং সংসার। রাজেন্দ্র বাবু খিদিরপুরে কর্ম্ম করিতেন। মুমূর্ষু অবস্থায় সেখান হইতে তাঁহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৩৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটের বাসায় আসেন, এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন। যখন বেড়গুমে এই সংবাদ পৌঁছায় তখনকার অবস্থার কথা ভাবিয়া বাস্তবিক আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে শুনিলাম, বৃদ্ধ আশুবাবু অন্ততঃ বাহ্যত ততো অধীর হন নাই। কিন্তু বধূমাতাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন? সাধুভক্তগণ বলেন, "যিনি রণজয় করেন, তিনি প্রকৃত বীর নহেন, যিনি শোক-মোহ-বেগ সম্বরণ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বীর।" মাতঃ বিশ্ব-জননী পরলোকস্থ আত্মাকে স্নেহ-ক্রোড়ে এবং ইহলোকস্থ শোকার্ত্ত নরনারীর প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

এতদ্ভিন্ন আর দুইটি মৃত্যু-সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি—একটি বালিয়ানীর জমিদার শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু। অপরটি গোবরডাঙ্গার কানাই নাটশাল পাড়ার শ্রীযুক্ত হাজারীলাল মুখোপাধ্যায়। হরিদাস বাবু সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কথা কিছুই পাওয়া যায় নাই। তবে হাজারীলাল বাবু শান্ত ভাব, ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার বড় তরফে

বর্ত্তমানে তহশীলদারী কার্য্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, সহসা তাঁহার অভাবে তাহার পরিবারবর্গ সত্যই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ভগবান্ সকলের প্রাণে বল ও বিশ্বাস দান করুন।

থাঁটুরা বালিকা-বিদ্যালয়টি সম্পাদকের ঐকান্তিক যত্নে ধীরে ধীরে যেন একটু উন্নতির আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই সুখী। তবে বালিকা-শিক্ষা কার্য্যে শিক্ষয়িত্রী যেমন উপযোগী, পুরুষ শিক্ষক দ্বারা সে কার্য্য কখনই তেমন হইতে পারে না। অবশ্য পল্লীগ্রামে অল্পে স্বল্পে শিক্ষয়িত্রী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যতটুকু স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে একটি গরীব হিন্দুমহিলা অথবা শিক্ষা প্রচারে যত্নশীলা কোনও মহিলা পাওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এজন্য গ্রামবাসীর সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

কুশদহের মধ্যে তাম্বুলী সমাজ প্রসিদ্ধ। এই সমাজের প্রসার বৃদ্ধি ও সংস্কার উদ্দেশ্যে থাঁটুরার স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল, বি-এ, মহাশয় একটি সম্মিলনী সভা স্থাপন করেন, এবং তাহার মুখপত্র "তাম্বুলী-সমাজ" নামে মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। তাহার সম্পাদন ভার স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ পালের উপর দীর্ঘকাল ন্যস্ত ছিল। রাজকৃষ্ণ বাবুর পরলোক গমনে "তাম্বুলী-সমাজ" পত্রিকাখানি বন্ধ ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ঐ সম্মিলনী সমাজের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় আর একখানি "তাম্বুলী পত্রিকা" নামে মাসিকপত্র প্রচার হইতে থাকে। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে,তাম্বুলী সমাজের পরমহিতৈষী কর্ম্মী, উৎসাহী বাবু সুরেশচন্দ্র পাল গত বর্ষ হইতে পুনরায় "তাম্বুলী-সমাজ" প্রকাশ করিতেছেন। তবে পত্রিকাখানি নিয়মিত বাহির হইতেছে না। দুইমাস তিনমাস পর্য্যন্ত একত্রে বাহির হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই পত্রিকাখানি যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে উহা দ্বারা উক্ত সমাজের বিশেষ হিত সাধন হইবার সম্ভাবনা। যদি একান্ত পক্ষে নিয়মিতরূপে মাসে মাসে বাহির না হয়, তবে উহা ত্রৈমাসিক করিয়া যাহাতে উপযুক্ত প্রবন্ধ বাহির হয় তাহা করিলে মন্দ হয় না।

কুশদহ-সমিতি

—:০:—

১। গত ২২এ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় খাঁটুরা স্কুল-গৃহে 'কুশদহ-সমিতি'র এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য খাঁটুরাগ্রামে সমিতির একটি "শাখা-কার্য্যালয়" স্থাপন করা। ঈশ্বর-কৃপায় এই দিনের কার্য্য অতীব সন্তোষজনক হইয়াছিল। আজ কাল বাদ্‌লা বৃষ্টির দিনে এরূপ পল্লীগ্রামে শতাধিক লোকের সমাগম কম কথা নয়। সভার কার্য্যে আদ্যোপান্ত সকলেই স্থির ভাবে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইল। কুশদহ-সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য খাঁটুরা-নিবাসী (কলিকাতা প্রবাসী) শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র পাল পূর্ব্ব হইতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই অধিবেশনের আয়োজন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাবু প্রমথনাথ দত্ত এ দিবস সভাপতির কার্য্য করেন। কলিকাতা হইতে সমিতির ৬ জন সভ্য ও বনগ্রাম হইতে ২ জন সভ্য আসিয়া এই অধিবেশনে যোগ দেওয়ায় সভার কার্য্য খুবই জমাট হইয়াছিল।

প্রথমে সুরেশবাবু সমিতির উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে, তাহার সমর্থন ও পোষকতা কল্পে কুশদহ-সম্পাদক, নীলাচল বাবু, নিশি বাবু, দুর্গাদাস বাবু প্রভৃতি যথাক্রমে অত্যন্ত সরলভাবে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন। তৎপরে গ্রামবাসীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে "শাখা কার্য্যালয়" স্থাপনে অনুমোদন করিলে প্রস্তাব ধার্য্য হয়। এবং সভার নির্ব্বাচন অনুসারে বাবু প্রমথনাথ দত্ত সম্পাদক, ও শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হন। তৎপরে বনগ্রাম স্কুলের হেডমাষ্টার এবং খাঁটুরা স্কুল-কমিটীর সভাপতি, গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, দু' এক কথা বলেন। অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

'কুশদহ-সমিতি'র শাখাকার্য্যালয় যোগে উক্ত গ্রামে কি প্রণালীতে কার্য্যাদি হইবে, তাহা প্রথমে কার্য্যনির্ব্বাহকসভা স্থির করিয়া সাধারণসভা সমক্ষে যথাসময়ে উপস্থিত করিবেন।

অবশেষে আমরা আর একটি কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম

না। দত্তবাটীর শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ দত্ত এই অধিবেশন কার্য্যের আয়োজন সম্বন্ধে অসুস্থ শরীরেও আগাগোড়া উৎসাহপূর্ব্বক যে প্রকার পরিশ্রম এবং কলিকাতা, বনগ্রাম হইতে আগত সভ্যগণকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই এবং সুগায়ক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চৌধুরী, এই সভার নিতান্ত সময়োপযোগীভাবে আদি ও অন্তে দুইটি সঙ্গীত করিয়া সভাকে অত্যন্ত সরস করিয়া ছিলেন।

২। এতদ্ভিন্ন ৫ই ও ১০এ ভাদ্র কার্য্যানির্ব্বাহকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল বিষয় আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা চলিয়া শেষ দিন উক্ত প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। বিষয়টি বস্ত্র সমস্যা—অর্থাৎ কুশদহ-সম্পাদক দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রভৃতি ৪ জন সভ্য প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে কুশদহবাসী দুঃস্থদিগের বিশেষত দরিদ্রা স্ত্রী-জাতির বস্ত্রাভাব দেখিয়া কুশদহ সমিতির নীরব থাকা কখনোই সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে। এ বিষয়ে কি সমিতির কোনও কর্ত্তব্য নাই? এই প্রশ্নের আলোচনার ফলে ধার্য্য হয়, বস্ত্র-ক্লেশ নিবারণ জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য বা অপর উৎসাহী সভ্য যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থসংগ্রহে প্রস্তুত হইবেন, এরূপ সভ্য দ্বারা একটি সাব-কমিটী গঠিত হউক।

তারপর দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাচল মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র পাল, নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সহায়নারায়ণ পাল ও খগেন্দ্রনাথ পাল প্রভৃতি উক্ত সাব-কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হইলেন—অর্থাৎ ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলেন। প্রয়োজনমতে এই কমিটির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

আমরা বলি যাঁহারা ভগবানের মুখের দিকে তাকাইয়া, তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া জন সেবার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ সঞ্চিত আছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আসুন দয়াবান্, হৃদয়বান্, সমাজহিতৈষী, কুশদহবাসী, বা অপর যিনিই হউন সহায়তা করুন—উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। "কুশদহ সমিতি" এ আহ্বান অবহেলা করিতে পারেন না। এইবার আসুন, কথায় নয়—কাজে, স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। এ যে ভগবানের ইঙ্গিত।

৩। গত ৭ই ভাদ্র শনিবার প্রাতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিরাম বাবু, নীলাচল বাবু, সুরেশ বাবু ও সম্পাদক, ইঁহারা পাঁচজনে একটি ডেপুটেসন লইয়া বারাশত সাবডিভিসান্তাল অফিসারের সহিত গোবরডাঙ্গায় সাক্ষাৎ করেন এবং গত ২২এ ভাদ্র রবিবার প্রাতে নিশি বাবু, সুরেশবাবু ও সম্পাদক, এবং বনগ্রাম হইতে সমিতির সাধারণ সভ্য শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এল্ কে লইয়া তাঁহারা ৪ জনে বনগ্রামের সাবডিভিসান্তাল অফিসার মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কুশদহ-সমিতির প্রতি তাঁহাদের অনুকুল-দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তাঁহারা কুশদহ সমিতির উদ্দেশ্যের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে আনুকুল্য দান করিবেন। তবে বারাশাত-অফিসার মহোদয় নাকি একথাও বলিয়াছেন যে, সমিতির সমবেত শক্তির সাহায্যে যতদিন গ্রামবাসীদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও আত্ম চেষ্টার ভাব জাগাইয়া তুলিতে না পারিবেন, ততদিন বিশেষ সুফলের আশা করা যায় না।

৪। গত ৫ই ভাদ্রের কার্য্যনির্ব্বাহকসভার নির্দ্ধারণ অনুসারে কুশদহের বর্ত্তমান সংগৃহীত ম্যাপ ২৫০ কপি প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবত ৪০৲ টাকার অধিক তাহাতে ব্যয় হইবে। কুশদহ-সমিতির সভ্য মাত্রেই উহা সুলভ মূল্যে পাইবেন।

মাসিক অধিবেশনাদির সংবাদ স্থানাভাবে এবারে প্রকাশিত হইল না।

কুশদহ-পঞ্জী

——o——

গত শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত ৺সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বংশ বিবরণে কয়েকটি নাম অজ্ঞাত এবং অসম্পূর্ণতা দোষ রহিয়া গিয়াছে। তাহা সংশোধিত আকারে নিম্নলিখিতানুরূপ হইবে। প্রথমে ৺সারদা বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু হইতে প্রাপ্ত বিবরণ, সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় যেরূপ পাঠাইয়াছিলেন, তদ্রূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, তৎপরে ৺সারদা বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত চারুবাবু নিম্নলিখিতানুরূপ সংশোধিত কাপী পাঠাইলেন অবশ্য ইহার মধ্যে মারাত্মক ভুল কিছু নাই। অতঃপর আমাদের সানুনয় নিবেদন যে, নিজ নিজ বিবরণ প্রদান কালে যাহাতে কোনও নাম বাদ না

যায় এবং সংগ্রহকারক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যেন সতর্কতা সহকারে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান, নচেৎ প্রত্যেকবার ভ্রম সংশোধন করিতে হইলে অত্যন্ত লিপি বাহুল্য হইয়া পড়িতেছে। (সম্পাদক)

সংশোধন। ৺সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী সিদ্ধেশ্বরী দেবী, হুগলি জেলার জয়পুর গ্রাম নিবাসী ৺রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা। ৺সারদা বাবুর চারিটি পুত্র। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ও অপর দুইটি বাল্যকালে মৃত্যুমুখে পতিত। ৺সারদা বাবুর কন্যাও চারিটি।

প্রথমা, উপেন্দ্রমোহিনীর স্বামী, যশোহর-সারসা গ্রাম নিবাসী ৺শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়া, মহেন্দ্রমোহিনীর স্বামী, ফরিদপুর—বাটিকামারি গ্রাম নিবাসী ৺বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপর দুইটি কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগতা।

চারুবাবুর তিন পুত্র ব্যতীত আর একটি সুধীনচন্দ্র বাল্যকালে পরলোকগত। কন্যাও পাঁচটি—অপ্রাপ্ত (বুড়ী) নামা ব্রজবালার স্বামী বর্দ্ধমান জেলার সিলামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকেশ্বর বন্দোপাধ্যায় আর দুইটি অবিবাহিতা, নাম সুরবালা ও দেববালা।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবুর দুই পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ও বিশ্বনাথ। তিন কন্যা অর্থাৎ রাধারাণী ব্যতীত আর দুইটি—রাণী ও শিবি।

৺বসন্ত বাবুর প্রথম পুত্র ললিতকুমার বাল্যকালে পরলোকগত। দ্বিতীয় পুত্র (যাহার নাম বলা হইয়াছিল পটল) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৺খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের জামাতা, ধর্ম্মদহের ৺রামকিশোর চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার এক কন্যা উজ্জ্বলা দেবী শান্তিপুরের ঘুরপেকে পাড়ার ৺রুক্মিণীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পত্নী। রুক্মিণীকান্ত গোবরডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন।

ইঁহার দুই পুত্র,এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ শ্রীপতিরাম মুখোপাধ্যায় নিরুদ্দেশ। অপর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহার পত্নী, হুগলী জেলার পূর্ব্ব নপাড়া নিবাসী ৺ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ভুজঙ্গিনী দেবী।

৺রুক্মিণীকান্তের একমাত্র কন্যা ৺নৃত্যকালী দেবী, এড়েদহের ৺হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

গোপাল বাবুর দুই পুত্র। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ ও এক কন্যা। শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর স্বামী, বসিরহাট মহকুমার কাঁকড়া কচুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রবাবু ডেপুটী একাউনটেন্ট্ জেনারেল টেলিগ্রাফ আফিসের একজন কর্ম্মচারী। ইঁহার স্ত্রী (পরলোকগতা) মিহিরবালা দেবী, ২৪ পঃ এড়েদহর

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা। সুরেন্দ্র বাবুর দুই পুত্র, শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ ও শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ, এককন্যা শ্রীমতী তপবালা।

শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথের শ্বশুর শ্রীযুক্ত নীলরতন গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস ২৪ পঃ বারাসাতের অন্তর্গত শ্বেতপুর। মণীন্দ্রনাথ অবিবাহিত।

শ্রীমতী তপবালার স্বামী বেহালা নিবাসী (পূর্ব্ব নিবাস বেলুড়) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, শ্রীমতী অর্দ্ধরাণী দেবী গোবরডাঙ্গার স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্রী, স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। ইঁহার তিন পুত্র, শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ, মৃগেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও তিন কন্যা—শ্রীমতী ননীবালা, শৈলবালা, আর একটি অপ্রাপ্ত নামা শিশু।

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌
৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৺কালীপ্রসন্নবাবুর জামাতা ৺বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়। ধর্ম্মদহের ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহার ভগিনীপতি। ইঁহার দুই পুত্র, ৺রজনীকান্ত ও ৺গোপালচন্দ্র। বেণীবাবুর ভাগিনেয় ৺গোপালবাবু বাল্যে মাতুলালয় আসিয়া গোবরডাঙ্গায় বাস করেন এবং গোবরডাঙ্গার জমিদার সরকারে কিছুকাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ইঁহার পত্নী শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী, ইছাপুরের ৺প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর পৌত্রী।

৺গোপালবাবুর সাত পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, শ্রীমতী নিকুঞ্জবালা দেবী, হুগলী জেলার মাহেশ বল্লভপুরের ৺পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা। ইঁহার দুই পুত্র, শ্রীমান্ দীনেশ ও শৈলেশ, (অবিবাহিত)। এক কন্যা শ্রীমতী শেফালিকাও বালিকা। ৺গোপাল বাবুর তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র—অবর্ত্তমান।

চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, শ্রীমতী সরযূবালা, চুঁচড়ার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।

পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, শ্রীমতী নন্দরাণী, সাতক্ষীরার ৺রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

ষষ্ঠ, শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র, ও সপ্তম শ্রীমান্ ফণীন্দ্রচন্দ্র বালক—অবিবাহিত।

৺গোপাল বাবুর একমাত্র কন্যা (বিধবা) কিরণবালার স্বামী কোন্নগরের ৺পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ৺সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইল্‌কিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৺

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"তোমার জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব"

দশম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩২৫ | ষষ্ঠ সংখ্যা

সঙ্গীত

—:o:—

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর,
সে জানে সকলে, কেহ নাহি জানে তাঁকে।
"তমীশ্বরাণং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যং।"

রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন-স্মৃতি

——:০:——

ভারতে ইংরাজরাজত্ব এবং মহাত্মা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব বিধাতার বিধান। রাষ্ট্রবিপ্লব ও মহাপুরুষের আবির্ভাবে দেশে যুগান্তর উপস্থিত করে। উহা তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ মাত্র। প্রয়োজনানুসারে সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই তাহা দৃষ্ট হয়। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। নব্যভারতের পক্ষে রাম মোহনের ন্যায় মহাপুরুষের আগমন প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি বর্ত্তমান সকল উন্নতির মূল মন্ত্রদাতা। ইহা বিধাতৃত্ব শক্তিরই বিকাশ। বিধাতার বিধানেই মহাপুরুষের আগমন, মূলে এই সত্যে বিশ্বাস না করিতে পারিলে, ঐ সকল মহজ্জীবনী বুঝিবার পক্ষে সহজ হয় না।

২৭ শে সেপ্টেম্বরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বৃষ্টলনগরে দেহত্যাগ করেন। প্রতিবৎসর এই দিনে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানেও রাজার স্মৃতি-সভা হয়। তাহাতে সাধারণতঃ রাজার বিবিধ কার্য্যের কথা আলোচিত হয়, কিন্তু শক্তিশালী মহাপুরুষদিগের জীবনে অনেক কার্য্য থাকিলেও একটি মূল ভাব হইতেই সকল কার্য্য গুলির সূত্রপাত হয়। সেই মূল ভাবটি আশু সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন না। সেটী গভীর ও গূঢ় ভাবাত্মক। সাধারণতঃ মানুষ সহজ বিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান ভারতের সামাজিকরীতিনীতি, নৈতিকচরিত্র, ইংরাজীশিক্ষার দ্বারোদ্ঘাটন, বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার, রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় বিহিত বিধি এবং স্ত্রীজাতির দুর্গতি দূর প্রভৃতি সকল হীনতার দিকেই রাজার দৃষ্টি পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি পড়িয়া ছিল ধর্ম্মের দিকে। তিনি এক ধর্ম্ম বিশ্বাসের বলে সকল সংস্কারের সূচনা করিয়া ছিলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিয়া ছিলেন, ভারতের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলেই গলদ দাঁড়াইয়াছে। এত ধর্ম্মভেদ লইয়া কোনও দেশ কোনও জাতি উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, ধর্ম্মের মূলভাব ছাড়িয়া শাখা প্রশাখায় এতদূর পরিণতি হইয়াছে যে, এ অবস্থায় সকল ধর্ম্মের মূল এক—সকল মানুষ একঈশ্বরের সন্তান, একথা কেবল একটা কথার কথা মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ জাতিতে জাতিতে—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘোর বিদ্বেষ বিবাদ ঘটিয়াছে। এই বিচ্ছিন্নতা

হইতে একতা সাধন করিতে হইলে মূলে সেই এক-ঈশ্বর-জ্ঞান—"ব্রহ্মজ্ঞান" তাহার একমাত্র পথ। এই পথের সমাধান জন্য তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন এবং জগদ্বাসীকে দেখাইলেন যে, সকল ধর্ম্মের মূল এক। একটি গভীর মৌলিকতা সকল ধর্ম্মের মূলে বিদ্যমান। সুতরাং ঐ একতা সাধন,অসম্ভব নহে, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ ও পরম কল্যাণপ্রদ।

এই মহাসত্যে রাজার মন-প্রাণ যে শুভমুহূর্ত্তে ভরিয়া গেল, তখন হইতেই তিনি তাহা প্রচারে সমস্ত জীবন ঢালিয়া দিলেন। রাজা রামমোহন আমাদের ভারতবাসী বলিয়া আমরা গৌরব করিতেছি সত্য, কিন্তু তিনি যে বাণীপ্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক কেবল ভারতের জন্য নহে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মসমন্বয়ের মূলমন্ত্র। যথাসময়ে জগতের ধর্ম্মভেদ তিরোহিত হইয়া রাজা জগন্মান্য হইবেন. ইহা স্বপ্নের কথা নহে। বরং সম্মুখে সে আশার আলোক দিন দিন উজ্জ্বলই হইতেছে। সকল প্রকার ভেদ নীতি দূরীকরণ করিয়া সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠানে জগতে বিধাতৃত্ব শক্তির কাজ যেন মহা দ্রুতবেগে চলিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী মহা সমরানলে যেন মানুষের ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বাভিমান, স্বার্থ, অহঙ্কার, যত কিছু ভেদবুদ্ধি দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ জগদ্বাসী এক মহাসাম্যের দিকেই চলিয়াছে।

ভারতে ইংরাজাধিকারের সহিত রামমোহনের আবির্ভাব অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতে ইংরাজরাজত্ব বিধাতার বিধান, একথা কেবল বিশ্বাসমূলক কিংবা যুক্তিসঙ্গত। আমরা বলিব, যাহা সত্য তাহা কেবল বিশ্বাসমূলক নহে, তাহা যুক্তিসঙ্গত। তবে সত্য, যুক্তিসঙ্গত হইলেও বিশ্বাস ব্যতীত তাহার ধারণা হয় না। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ থাকিলেও চক্ষুহীন ব্যক্তি তাহা দেখিতে পায় না।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জগতে কি ঘোর বিরোধ ছিল এবং তজ্জন্য কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু যে দিন হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং মন্ত্র ও সমন্বয়বার্ত্তা ভারতে ঘোষিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে সাম্প্রদায়িকধর্ম্মের মূলে কি কঠিন কুঠারাঘাত না পড়িয়াছে। অবশ্য রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিরোধ আজও জগতে চলিতেছে বটে কিন্তু তাহার যে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন এবং মীমাংসা সম্মুখে আসিতেছে তাহা কল্পনা বলিয়া মনে হয় না। এই মহামিলন বৃটীশ পতাকাতলেই সম্ভবপর হইয়াছে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে চিরবিরোধ থাকিতেই পারে না, তাহা

মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে; তাহা হইলে মানবজাতি ধ্বংস মুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা হইত। অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত সত্য যে, জগদ্বাসীর কল্যাণার্থে ধর্ম্মবিরোধ তিরোহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তাই যথাসময়ে ধর্ম্মসমন্বয় না হইয়া পারে না। সমন্বয়সাধনের পরমসহায় উদারইংলণ্ডীয় জাতির প্রতিই তাহা নির্ভর করিতেছিল। তাই তাঁহারা বিধাতৃত্ব শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অস্ত্রধারণ করিয়া ইংরাজ ভারতে আসেন নাই। যে দিন অবসন্ন—পীড়িত ভারত, ইংরাজজাতিকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে দুর্দ্দিনের কথা কি নব্যভারত ভুলিয়া গেলেন? না, সে কথা তো ভারতইতিহাস হইতে আজও মুছিয়া যায় নাই।

আজ ভারতবাসী আপন পায়ে দাঁড়াইতে চাহিতেছেন, ভারতবাসীর আত্ম সম্মানবোধ—আত্ম-নির্ভরের ভাব জাগিতেছে, ইহার মূলে কি ইংরাজজাতির কোন শক্তির পরিচয় নাই? কে একথা অস্বীকার করিবেন? আমরা ভারতের সকল আন্দোলনের মূলে ঐ বিধাতৃত্ব শক্তির দিকেই অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিব, "ভারতে ইংরাজরাজত্ব এবং রাজা রামমোহনের আগমন বিধাতার বিধান।"

কেহ কেহ বলেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "বিরাট-পুরুষ," বিরাট-পুরুষের লক্ষণ, বহু বিষয়ে কর্ম্ম করিয়াও তিনি নিজে নিঃশেষ হন না। দ্বিতীয় লক্ষণ, যাঁহার অনুষ্ঠিত বিষয় বা হৃদয়ের ভাব, ভবিষ্যৎবংশ একাকী ধারণ করিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন দলে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। আজ নব্যভারতে যত রকমের উন্নতির চেষ্টা, ইহার মূলে রাজার হস্ত-চিহ্ন দেখা যায়। অথচ তাঁহার মূলভাব এখনও অতি অল্পই গৃহীত হইয়াছে। তিনি যে এক ঈশ্বরঅনুরাগে সকল হিতানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সে-ভাব সাধনের এখনও অনেক বাকী।

আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসী অগ্রসর, ইহাও আশা ও আনন্দের কথা, কিন্তু মূলে ধর্ম্ম বিশ্বাসের অভাবেই এত বিরোধ—মতভেদ হইতেছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। রাজার ন্যায় একহাতে ঈশ্বরপ্রীতি, অপর হস্তে জনসেবা ইহা যতদিন ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে গৃহীত না হইবে, তত দিন সম্যক্ উন্নতির পথ সহজ হইবে না। ভারতবাসীকে এক দিন রাজার পদানুসরণ করিতেই হইবে। ভারতের পক্ষে ইহা বিধাতার বিধান।"

রামমোহন-স্মৃতি

—:o:—

(দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণে)

ভারত আমার, ভারত আমার, জাগিয়া উঠেছে মেলিয়া নির্মীল নেত্র,
আপনার ভাল বুঝেছে সে আজি চিনেছে আপন কর্ম্মক্ষেত্র।
দিয়াছে জানায়ে জগত মাঝারে সে নহেতো কভু তুচ্ছ,
আপন গরিমা-স্মৃতির মাঝারে তার শির কত উচ্চ।

(কোরাস)

রামমোহনের জন্মভূমি সে তাঁহারই কর্ম্ম ক্ষেত্র,
ভারত আজি গো জাগিয়া উঠেছে মেলিয়া নির্মীল-নেত্র।

রবীন্দ্র যেথা বিতরি' আলোক আজি গো জগত বন্দ্য,
দ্বিজেন্দ্র সেথা বরিল সুতান জলদ-গম্ভীর মন্দ্র।
জগদীশ যেথা দেখাল জগতে জগত-জোড়া একই প্রাণ,
তুচ্ছ ভারত নহে কভু আর খর্ব্ব নহে গো তাহার মান
রামমোহনের জন্মভূমি সে তাঁহারই কর্ম্ম ক্ষেত্র,
ভারত আজি গো জাগিয়া উঠেছে মেলিয়া নির্মীল-নেত্র।

পূজিছে যে জাতি রাজার চরণ বুকের রক্ত করিয়া দান,
যে জাতি আজি গো ঢালিছে অর্থ রক্ষা করিতে রাজার মান।
যাঁহার মঙ্গল অঙ্গুলি হেলনে জেগেছে ভারতে জাতীয় প্রাণ,
মোরা সবে আজ মিলেছি হেথায় করিতে তাঁহায় সম্মান দান।
রামমোহনের জন্মভূমি সে তাঁহারই কর্ম্ম ক্ষেত্র,
ভারত আজি গো জাগিয়া উঠেছে মেলিয়া নির্মীল-নেত্র।

সতীর চিতায় একদা যে জন ঢালিলা আপন সর্ব্ব-শক্তি,
বৈদিক-ধর্ম্ম নূতন করিয়া জাগাল ভারতে দিতে গো মুক্তি।
ভারতে যে জন লভিল জনম বৃটন যাঁহার সমাধি ক্ষেত্র,
যাঁহার জ্ঞানের পুণ্য আলোকে ভারত আজি গো মেলেছে নেত্র।

রামমোহনের জন্মভূমি সে তাঁহারই কর্ম্ম ক্ষেত্র,
ভারত আজি গো জাগিয়া উঠেছে মেলিয়া নির্মীল-নেত্র।

—— শ্রীহাজারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায়শ্চিত্ত

ষোড়শ

ঝমুয়াকে দেখিয়া হরদাদা যখন ফিরিলেন, তখন রতিকান্ত চলিয়া গিয়াছে। বিশু, নবেন্দুর কুকুরটির সঙ্গে আনন্দের সহিত গুলি খেলিতেছে; হরদাদার সহিত যাইবে বলিয়া মামার সহিত ফিরিয়া যায় নাই।

নবেন্দু বেড়াইতে গিয়াছে, মেয়েরা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। মহেশ বাবু হরদাদাকে দেখিয়া কহিলেন, কেমন আছে ছেলেটা? হরদাদা কহিলেন, জ্বর হয়েছে বটে কিন্তু কোনো ভয় নেই, ওদের ভারী ভয় পাছে পিলেগ্ হয়। আজ কাল ঐটের ভারী উপদ্রব হয়েছে দেখছি।

মহেশ বাবু কহিলেন, সেই ভয়েই তো বাঙ্গলো ছেড়ে এখানে এসেছি। এসেছিলুম ছুটিতে হাওয়া খেতে, তা দু'মাস বেশ ছিলুম, শেষ কালে এই উপদ্রবে পড়লুম, আমি তো সহর থেকেই চাকরী স্থানে যেতে চাইছিলুম, তা অমিতার ঝোঁককে তো পারবার যো নেই, আবার লট বহর ঘাড়ে নিয়ে এখানে আসতে হোলো। ছুটিও শেষ হোয়ে এসেছে, এ ক'টা দিন বাদে চাকরীতে join করতে হবে।

"তা আছেন বেশ, কুঁড়ে তো বড় কম বাঁধা হয় নি, রীতিমত একখানি গ্রাম বসানো হয়েছে, ফাঁকা জায়গায় আছেন ভাল"।

অমিতা কহিল, দেখলেন কাকামণি, সে দিন আপনার বন্ধুও বেড়াতে এসে ঐ কথা বল্লেন, আমার তো বড্ড ভাল লাগে।

হরদাদা ললিতার দিকে চাহিয়া কহিলেন, ললিতেদির মাথা ধরা কেমন আছে? ক'দিনে চেহারাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে দেখ্‌ছি।

মহেশবাবু কহিলেন, মেয়েটার শরীর আর সারুল না। দু'দিন ভাল থাকে, আবার কি রকম কি হয়। ওর জন্যে আমার বড় ভাবনা। খুকি, তুই তবে আবার ওকে স্যানাটোজেন খেতে দে, ও তো ওষুধপত্র নিয়মিত খাবে না, স্বাস্থ্যের দিকে মন না দিলে নিজেকেই যে কষ্ট পেতে হয়, এ আর তোদের কত বোঝাবো। অমিতা মনে মনে কি বলিল জানি না, প্রকাশ্যে কহিল, ওর ওষুধ খেয়ে কিছু হবে না কাকামণি, যে গুলো খেয়েছে সেই গুলোই হজম হোক্।

'অই তো তোদের বোকামী ওষুধকে তোরা অগ্রাহ্য করিস, না খেতে খেতেই কি ফল হবে ? তুই যা তো খুকি একটা বোতল নিয়ে আয়, আমি খুলে দিচ্ছি, এখুনি দুধের সঙ্গে এক চামচে গুলে খাইয়ে দে।

ললিতা কহিল, আজ থাক না বাবা, পাঁচ বোতল স্যানাটোজেন খাওয়া তো হোলো, আমার কিছু অসুখ হয় নি, ক'দিন থেকে শুধু মাথাটা ধরেছে।

মহেশবাবু ব্যস্তভাবে কহিলেন, পাঁচ বোতল খেয়েছ বোলে কি আর খেতে হবে না ? এখনও আরও কিছু দিন continue কোরে যাও।

অমিতা কহিল. কাকামণি, হরদাদার কাছে একটা খুব ভাল পেটেণ্ট ওষুধ আছে। ললিতাকে সেইটে দিন কতক খাওয়ালে হয় না ? হরদাদার মনে সম্ভবত সেই কথার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু বলি বলি করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই।

মহেশবাবু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার ওসব দিকেও বিদ্যে আছে না কি ? তা বেশ তো, ললিতার স্বাস্থ্যটা যাতে বেশ সেরে যায়, তা যদি কোরে দ্যান বড় উপকৃত হই—মেয়েটার যে delicate health, আগে এ রকম ছিল না, আপনি কি প্রেস্‌ক্রপসন্ দেবেন. না ওষুধ আপনার কাছে আছে ?

হরদাদা কহিলেন, ওষুধই দেবো, কিন্তু ললিতেদি যদি শ্রদ্ধা কোরে নিয়মিত খায়, তা হোলে দু'মাসে ওর শরীর একেবারে ব্যাধি শূন্য হবে, এ আমি জোর কোরে বল্‌তে পারি। অমিতে দি, তুমি হাস্‌ছ, তা হাসো আর যাই করো আমার এ ওষুধ অব্যর্থ।

মহেশবাবু কহিলেন, আপনি তা হোলে আজ বিকেলেই দেবেন, স্যানা-টোজেন এখন দিন কতক বন্ধ থাক, কি বল্ খুকি। খুকি সম্মতি জানাইয়া কহিল. হরদাদার আর একটি বিদ্যে আছে কাকামণি, উনি বেশ গান গাইতে পারেন।

মহেশবাবু কহিলেন তাই না কি ? তা আমি গান শুন্‌তে খুব ভালবাসি খুকী তোদের গান ওঁরে শুনিয়ে দিস ?

অমিতা ধরাইয়া দিতে গিয়া নিজে ধরা পড়িল। হরদাদা কহিলেন, অমিতেদি, তোমরা তো আমায় খুব ফাঁকীতে ফেলেছিলে, তা হোলে নাও এখন তিন জনে আমায় গান শোনাও। আমিও গানের একজন পক্ষপাতী।

অমিতা কহিল, আচ্ছা, আপনিই আগে এক আধটা শোনান, তারপর না হয় আমরাও গাইব। আপনার গলা কি মিষ্টি।

হরদাদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, আসল কথা তো জানো না দিদি, আমার পুঁজি পাটার খবর তোমাদের দিয়ে আমি নিজেকে খেলো করতে রাজি নই।

ললিতা কহিল, সেই যে গানটি আপনি সে দিন বিন্ধ্যাচলের ঘরে বোসে গাইছিলেন,—

"বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু
দেখাও তব চির আলোক লোক,
ও পারে সবি-ভালো কেবল সুখ আলো
এ পারে সবি ব্যথা আঁধার শোক।"

সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল আপনি সেই গানটা গান।

হরদাদা কহিলেন, সর্ব্বনাশ! ললিতে দি, ও আমার ঐ টুকুই মাত্র জানা আছে, তোমরা হাটের মাঝে হাঁড়ী ভেঙে আমাকে অপদস্থ কোরতে চাও যে?

অমিতা ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে কহিল, ভয় নেই দাদা, আমার গোটা গানটা জানা আছে, দাঁড়ান খাতা খানা আনি।

হরদাদা ফাঁপরে পড়িলেন, মহেশবাবু হাসিয়া কহিলেন, ওদের আপনি পারবেন না, আজ কালকার যত ভাল গান সব ওদের মুখস্থ! এই বলিয়া একটু গর্ব্ব মিশ্রিতভাবে মেয়েদের মুখের দিকে চাহিলেন। শুচিতা কহিল, কাকামণি, আপনি মনে করেন, আপনার মেয়েরা খুব ভাল গাইতে পারে, কিন্তু হরদাদা শুনলে কখনো আপনার সঙ্গে একমত হোতে পারবেন না, তালের জায়গায় কত সময় আমাদের কেটে যায়, দয়া কোরে শ্রোতারা মাপ করেন তাই।

অমিতা খাতা আনিয়া হরদাদার সামনে গানটি বাহির করিয়া ধরিল। হরদাদা নিরুপায় হইয়া ধূমপানে গলাটা সরল করিয়া লইলেন, তারপর কহিলেন,—

তোমরা আমার সঙ্গে ধরো অমিতে দি। নইলে গানটা যদি মনে রাখতে না পারি, খারাপ হয়ে যাবে। শুচিতা, ললিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, অমিতা হার্ম্মোনিয়াম লইয়া বাজাইতে বসিয়া কহিল, আপনি ধরুন, আমি গাইব।

হরদাদা গান ধরিলেন, অমিতাও যোগ দিল। সকাল বেলার শান্ত সময়টিকে মাধুর্য্য রসে পরিপূর্ণ করিয়া হরদাদার উচ্চ মধুর কণ্ঠস্বর গৃহকে কাঁপাইয়া বাতায়ন পথে ছুটিয়া চলিল, অমিতা থামিয়া গেল। সকলকার চিত্তকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করিয়া সংসার ভারাক্রান্ত ভক্তের প্রার্থনা-গীতি অতি করুণভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
তোমারি কাছে আছে, শান্তি সুখ সুধা,
পাবে অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
হউক তব সনে অমৃত যোগ।

সপ্তদশ

বেলা অপরাহ্ন, যমুনারতীরে দিনের অসংখ্য জনতা ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে। রতিকান্ত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, বিশু হরদাদার সঙ্গেই ছিল, বিন্দু ও কমলা কল্পবাস যাত্রীদের কুটীরে, নানারূপ কথা-বার্ত্তায় নিযুক্ত। বিশুর এদিক ওদিক বেড়ানো চাইতে অমিতাদের কুটীরে যাওয়াটাই খুব ভাল লাগে। নরেন্দুর নেপালী কুকুরটার সহিত তাহার এক রকম বন্ধুত্বের বন্ধন হইয়াছিল, সেও তার এই ছোট খাট নূতন বন্ধুটিকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, সুতরাং বিশু হরদাদাকে কহিল, চলুন হরদা, অমিতাদিদের ওখানে বেড়াইতে যাই। হরদাদা আজ সকালে সেখানে যান নাই, সুতরাং এখন যাইতে অনিচ্ছা হইল না, সেখানে গান, গল্প জমিবেও ভাল, আর তামাকটাও বারে বারে নূতন টেলে সাজা পাওয়া যাইবে। রতিকান্ত কিন্তু যাইতে চাহিল না, সে যমুনার ধারেই একটু বেড়াইবে, অগত্যা হরদাদা বিশুকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

রতিকান্ত অবুঝ নয়, মহেশবাবুদের বাড়ীতে আগে তাহার যাওয়া আসায় যে একটা হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল, তাহার বন্ধন যে একেবারেই ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। ললিতার আশা ত্যাগ করিয়াও, সে বন্ধুত্ব সূত্রে, পুনরায় এ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হইবার ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু এক অমিতা ছাড়া কেহই তাহাকে হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহা সে শীঘ্রই বুঝিতে পারিল। মহেশবাবু তাহার যাওয়া

আসায় অস্বস্তি বোধ করেন, ললিতা তো কথাই কহে না। নবেন্দুর চোখে মুখে যেন একটা অপ্রীতির ছায়া ঘনাইয়া উঠে, রতিকান্ত ইহাতে অত্যন্ত ব্যথা পাইল। তাহার আত্ম-সম্ভ্রমে আঘাত লাগিল, মহেশবাবুর মৌখিক শিষ্টাচার পূর্ব্বেরন্যায় থাকিলেও উহাতে আর প্রাণের আভাস নাই। বাহিরে সৌজন্যতা দেখাইবার জন্য আর কতক্ষণ ভাল লাগিতে পারে? সে তো এতো নীচ নয় যে. ললিতা, নবেন্দুর বাগ্দত্তা জানিয়াও মনে মনে তাহাকে কামনা করিবে?

ললিতা নবেন্দুর স্ত্রী হউক, সে পতিপ্রেমে সৌভাগ্যবতী হউক, আয়ুষ্মতী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুক, এখন হইতে ইহাই তাহার প্রাণের কামনা, অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন এ কথা অপরে কি জানিবে? কিন্তু কি ভয়ানক কথাই অমিতা সে দিন উত্থাপন করিয়াছিল, স্মরণ করিলেও দেহ কণ্টকিত হয়, সে কি মিথ্যা পরিহাস? না, না, এমন প্রাণঘাতী কথা লইয়া কেহ কি কখনো পরিহাস করিতে পারে? অন্তত অমিতার সে স্বভাব নয়, ইহা রতিকান্তর ভালরূপ জানা ছিল। তাহা হইলে ইহার পরিণাম কি হইবে? রতিকান্তর হৃদয়ে এ প্রশ্নে অনেক সমস্যা রচনা করিতেছিল, এবং সেই সকল দুরূহ সমস্যার জটিলতায় তাহার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

অনেকক্ষণ নতমস্তকে পাদচারণা করিতে করিতে শ্রান্তভাবে রতিকান্ত যমুনার ঘাটে বসিয়া পড়িল, কত কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের কত কাহিনী স্মৃতির সাগর মথিত করিয়া তাহার হৃদয় তটে আঘাত করিল, শৈশবের সেই নির্ম্মলক্রীড়া কৌতুক, কৈশোরের জ্ঞান স্পৃহা ও পাঠানুরাগ, যৌবনের কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও গভীর অধ্যবসায়, চার চারিটি পরীক্ষায় সে সম্মান ও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের গৌরব ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে, সে কিছু তো স্বপ্নের কথা নয়, জীবনের দু'দিনের ত্রুটীতে কি সে সকল লোপ পাইবার কথা? কখনই নয়। সে ধনীর সন্তান, অনন্য দুর্লভ পিতা মাতার নয়নের মণি, ভ্রাতাদের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, অক্ষুণ্ণ তাহার দৈহিক স্বাস্থ্য, এ সংসারে কিসের অভাব, কিসের দুঃখ তার, তবে কেন তার বুক জুড়িয়া একটা বিরাট হা-হাকার, তার তপ্ত-নিশ্বাসে. অন্তরের সকল প্রকার সুখ শান্তি ভস্ম করিয়া ফেলিতে চায়? কে সে ললিতা, এত দিন কোথায় ছিল?

যৌবনের স্বর্ণ-মন্দিরে একদিন তাহার জন্ম আরতির প্রদীপ জ্বালিয়াছিল, সত্য, তারপর, কোথায় সে প্রদীপের জ্যোতিঃ? আর কোথায় সে বরণীয়া প্রতিমা? যে প্রদীপ জীবনে হঠাৎ কোন্ এক মাহেন্দ্রক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার নির্ব্বাণে এমন কি বিশ্বব্যাপী অন্ধকারে তাহার জীবন ভরিয়া উঠিল যে, সে এতো অস্বস্তি বোধ করিতেছে? ছি, ছি, এতো দুর্ব্বলতা কি পুরুষের জীবনে কলঙ্কের ও অগৌরবের কথা নয়?

কিন্তু মহেশবাবু সে দিন কথা প্রসঙ্গে যে কয়েকটা চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন, সে কি তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া নয়? সে কথা গুলার অর্থ কি? যে সকল নির্ব্বোধ যুবক, ভ্রমেও একবার রাজদ্রোহিতা-পরাধে অভিযুক্ত হয়, তাহারা নিতান্ত হতভাগ্য, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তাহারা যেন তাহাদের অভিশপ্ত জীবন লইয়া একটু দূরে দূরেই থাকে, সাধারণের শান্তির সংসারে ধূমকেতুর মতো প্রবেশ করিয়া, অশান্তির আগুন ছড়াইয়া বেড়ায় না।

কি কঠোর সাবধান বাণী! সত্যই কি তাহার জীবন এমনি অভিশপ্ত হইয়াছে যে, তাহার সংস্পর্শে যে আসিবে তাহাকেই বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে? মিথ্যাইবা কেমন করিয়া বলা যায়, দেশে ক্লাবের সকল রকম খেলার ছাত্রেরা তাহাকে captain পাইতে কি রকম উৎসুক ছিল, দুই দলের মধ্যে রতিকান্তকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, অথচ সে কারাগৃহ হইতে বাহির হইবার পর, ছেলেদের মধ্যে আর সে উৎসাহ দেখা যায় নাই, বরং অভিভাবকগণের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি ছেলেদের সর্ব্বদা অনুসরণ করিত যেন তাহারা রতিকান্তর সংস্রবে কোনো রকমে না আসিতে পায়। হায় হায়, সে এখন এমনি ঘৃণিত, ভয়ানক জীব হইয়াছে যে তাহার সঙ্গ বিভীষিকার ন্যায় সকলেই পরিহার করিতে সচেষ্ট। এমন কি, ভাই, বন্ধু, পিতা, মাতা কেহই আর তাহার জন্য নিরাপদ নহেন। ছি, ছি, এই অভিশপ্ত, লজ্জিত জীবন সে বোকার ন্যায় কত আর বহিয়া বেড়াইবে, এ বোঝা—এ দুর্ব্বিসহ ভার, পৃথিবী হইতে নামিয়া গেলে কার কতটুকু ক্ষতি? কিন্তু তাই বা কেন, সে পুরুষ, সে বিদ্বান, চরিত্রবান্, সুস্থকায় যুবা, সে কেন কাপুরুষের ন্যায় জীবনসংগ্রামে ভঙ্গ দিয়া পলাইবে? আপনার লুপ্ত গৌরব ও প্রতিষ্ঠাকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবার জন্য কেন সে প্রাণপণ চেষ্টা না করিবে? আর সে ফিরিয়া পাওয়াই কি একেবারে অসম্ভব? কখনই

নয়। পিতা মাতার বড় আদরের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান, সে কিসের জন্য জীবনকে দুর্ব্বিসহ মনে করিতেছে? দুণাক্ষরে এ কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর হইলে তাঁহাদের আক্ষেপের সীমা থাকিবে কি?

রতিকান্তর মনের বল ফিরিয়া আসিল, সে স্থির করিল, যে আর কোনো-রূপ দুশ্চিন্তায় নিজকে অভিভূত হইতে দিবে না, চিত্তকে দৃঢ় করিয়া অতীতের দিকে যবনিকা টানিয়া দিয়া, নববলে বলীয়ান হইয়া, নবোৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে সে আবার জীবন-পথে যাত্রা করিবে। ভগবান তাহার সে যাত্রাকে জয়যুক্ত করিবেনই করিবেন আশার আলোকে সুদূর ভবিষ্যৎ, যুবার তরুণ চক্ষে আবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, পৃথিবীকে পুনরায় রমণীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

গভীর চিন্তা হইতে জাগিয়া রতিকান্ত যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে নির্ম্মল আকাশে সন্ধ্যাতারা ঝিকৃমিক্ করিতেছে, উহার পুণ্য দৃষ্টি রতিকান্তকে যেন প্রতিজ্ঞান্তে প্রথম অভিনন্দন করিয়া আনন্দিত করিল। রতিকান্ত পুলকিত হৃদয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, সন্ধ্যার কালো ছায়া চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে, যমুনার নীল জল সে ছায়ায় নিবিড়তর দেখাইতেছে। গাছতলায় সাধু সন্ন্যাসীরা ধূনি জ্বালিয়া কেহ বা ভজন গাহিতেছেন, কেহ স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, চারিদিকে বেশ একটি শান্ত ও পবিত্র ভাবের সমাবেশ বিশ্বপ্রকৃতি যেন সানন্দে গম্ভীর ভাবে সেই অনন্দময়ের ধ্যানে পুলকিত হইয়া সান্ধ্য-বন্দনায় তাঁহার আরতি করিতেছে। রতিকান্তর মনের অবসন্ন ভাব দূর হইয়া গেল। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট চিত্ত সম্ভ্রমে ভগবদুদ্দেশে নত হইয়া আসিল, সে কুটীরের দিকে চলিতে লাগিল। একজন সাধু তখন ভক্তিভরে রামায়ণ পড়িতেছিলেন, অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, সাধু তখন পড়িতেছিলেন,—

'কাম, ক্রোধ, মদ লোভরত, গৃহাসক্ত দুঃখরূপ
তে কিমি জানহীঁ রঘুপতিহিঁ, মূঢ় পরে তমকূপ।
নির্গুণ রূপ সুলভ অতি, সগুণ ন জানৈ কোই,
সুগম আগম নানা চরিত, শুনি মুনি মনভ্রম হোই।'

রতিকান্তের হৃদয় তন্ত্রীতেও একটি গানের দু'টি ছত্র বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল,—

"আমার মাথা নত কোরে দাও হে, তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার, ডুবাও চখের জলে।'

অষ্টাদশ

অমিতা বলিতেছিল, আপনি কোথা কোথা বেড়ালেন? এই ক'দিনেই আপনাদের এতো বড় সহোরের সব জায়গা বেড়ানো হোলো?

রতিকান্ত কহিল তা হোয়েছে এক রকম, এখানকার বাগান গুলোই বেশি দেখবার জিনিষ, ইংরেজরা এলাহাবাদকে City of gardens বলে সেটা খুব ঠিক। আবার যদি কখনো আসিস, ভাল কোরে দেখবো, এবারে এই পর্য্যন্ত। খসরুবাগটা কেবল বাকী আছে, আজি দিদিদের সেইটে দেখিয়ে আনবো।

অমিতা কহিল, আপনার মা আপনার জন্যে এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আরো দু'চার দিন থেকে গেলেই পারেন, আপনি তো ছোট ছেলে নন্ যে আপনার জন্যে ভাবছেন।

রতিকান্ত হাসিয়া কহিল, এটেই তো মায়েদের দোষ বা গুণ, যাই বলো। এর উত্তর আমি আর কি দেবো অমিতা, তোমার মাকেই জিজ্ঞেস কোরে দেখো।

শুচিতা কহিল, অমিতা তুই পাগলের মতন কি যে যা তা বোলে বসিস্ তার মাথা মুণ্ডু থাকে না। কাকামণির কাপড় চোপড় যে গুলো ধুয়ে এসেছে সব বেছে ঠিক কোরে রেখেছিস্ তো? উনি কোথায় বেরুবেন বলছিলেন।

অমিতা কহিল,তোমার আর তা বলতে হবে না বড়দি,সব ঠিক রেখেছি।

এই সময় থাকমণি আসিয়া কহিল, জেঠাই মা ডাকছেন গো বড় দিদিমণি, একবার আসুন এদিকে।

শুচিতা চলিয়া গেল যাইবার সময় বলিয়া গেল, আমার সঙ্গে দেখা না কোরে যাবেন না রতিবাবু, কাল পরশু দু'দিন আপনি আসেন নি, আজ সেটা পুষিয়ে দিয়ে যাবেন। আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই।

রতিকান্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, উভয়েই নিস্তব্ধ, কিন্তু বেশীক্ষণ এভাবে বসিয়া থাকা অমিতার স্বভাব নয়, সে নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া রতিকান্তর দিকে কৌতুহলী নেত্রে চাহিয়া কহিল, কি ভাবচেন আপনি? রতিকান্ত যেন

চমকিয়া উঠিল, সে কি কিছু ভাবিতেছিল ? কিছু অন্য মনস্ক হইয়াছিল বটে। ঈষৎ হাসিয়া রতিকান্ত উত্তর দিল, তুমিতো গুনতে জানো, বলো না ?

অমিতা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, একদিন বোলে এক সিকি পয়সাও পাই নি, এবারে যে পাবো তারও ভরসা নেই, বিনি পয়সায় গনৎকারেরা গুণে বলে না।

রতিকান্ত কহিল বেশ, বোলো না, আমি নিজেই বলছি। আমার যুদ্ধ শিখতে সাধ হয়েছে, যার সঙ্গে দেখা কোরে পল্‌টনে ভর্ত্তি হবো। বেশ হবে না কি ?

অমিতা এ সবের বেশ পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু রতিকান্তের প্রস্তাবে সে উৎসাহ প্রকাশ করিল না, বরং চিন্তার ছায়া তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

অমিতা কহিল, হঠাৎ এ সখ আপনার চাপ্‌লো কেন ? একদিনও তো বলেন নি ?

রতিকান্ত কহিল, কালকেই স্থির করেছি, একটা কিছু কর্‌তে তো হবে, বেকার বোসে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌বে কেন ?

রতিকান্ত যুদ্ধে যাইতে চায়, অতি উত্তম কথা, তাহার ন্যায় নির্ভীক বলশালী যুবার পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়, কিন্তু সত্যই কি সে, মনে প্রাণে ললিতার দাবী ত্যাগ করিয়া চলিল ? আভাসে অমিতা তাহা যতটা জানাইয়াছে, উহা জানিয়াও সে কাপুরুষের ন্যায় কোনো প্রতিকার করিল না ? কেন সে অকুণ্ঠিত চিত্তে, দৃঢ়তার সহিত মহেশবাবুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিল না ? যুদ্ধে যাইতে হয় যাইবে বিবাহ করিয়া যাইতে ক্ষতি কি ছিল ?

নবেন্দুর উপরও অমিতার আজ রাগ হইতে লাগিল, এত দিন ধরিয়া দেখিয়া শুনিয়া সে কি কিছুই বুঝিতে পারে নাই ? তাহার ন্যায় সুচতুর লোকের না বোঝা অসম্ভব, কিন্তু সে কিস্তি মাৎ করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে। কিন্তু ললিতাই তো যত নষ্টের গোড়া, শান্ত শিষ্টটির মতো সে পিতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য যে আত্ম বলিদান দিতে প্রস্তুত হইয়াছে সে কথা মন্দ নয়, কিন্তু দাম্পত্য-আদর্শ তাহাতে প্রশংসার যোগ্য নয়। অমিতার মনে হইতে লাগিল, যাহাদের মন এতো দুর্ব্বল তাহারা ভাল বাসেই বা কেন? সে বুঝিয়াছে যে, ঐ জিনিসটা ঠিক মানব হৃদয়ের আয়ত্তাধীন নয় এবং উহার মূলরহস্য চিরদিনই প্রচ্ছন্ন বলিয়া সে মাধুর্য্য চির নূতন, চির সুন্দর।

যাহা হউক, অমিতার মনে ইহাদের কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না, সকলেই যেন ব্যাপারটাকে উড়াইয়া দিয়া, চাপিয়া যাইতে চায়, অথচ উপরে যে যতখানিই ধৈর্য্য প্রকাশ করুক, মনের মধ্যে সকলেরই একটা দ্বন্দ চলিতেছে, অমিতা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল।

অমিতাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া রতিকান্ত বিস্মিত হইল, অমিতার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া কহিল, কি ভাবছ অমিতা? তোমার এতখানি নিস্তব্ধ ভাব ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ বোলে মনে হয় যে!

অমিতা কহিল, কিছু ভাবছিলাম বটে, সে কথা যাক্। আপনি একটু বসুন আমি ছোটদির কাছে একবার যাই, তাকে ওষুধ খাওয়াবার সময় হোয়েছে।

রতিকান্ত কহিল, কেন? তার কি অসুখ করেছে না কি?

অমিতা কহিল, আপনি কি হরদাদার কাছে শোনেন নি? ছোট্দির আজ তিন দিন থেকে জ্বর হয়েছে, আপনি দেখতে আসবেন তো আসুন? রতিকান্তর বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল, কেন এ প্রলোভন? কিন্তু প্রলোভনই বা কি, যাহার দাবী সে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাকে চোখের দেখা দেখিতে, দু'টা কুশল প্রশ্ন করিতে কি তাহার কোনও অধিকার নাই?

এই সময় ঈষৎ হাসিয়া অমিতা কহিল, এমন একদিন ছিল, যখন ললিতার খোঁজ আপনি সর্ব্বদাই করতেন, এখন একবার তার মরা বাঁচার খবর নিতে ইচ্ছে হয় না, আপনারা এই রকমই নিষ্ঠুর বটে!

কথা গুলা রতিকান্তর বুকে বড় বাজিল, রতিকান্তর মনের গোপন কথা কি জানাইবার? ললিতা তাহার নিকট হইতে যতই দূরে সরিয়া যাউক, তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তবু যে, সে প্রাণের সহিতই করিতেছে, তাহার সুখের জন্য সে যে কতখানি দিতে পারে, তাহা অন্যে কি বুঝিবে?

অমিতা উত্তর না পাইয়া কহিল, দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি, আসুন তবে, ছোট্দি ও ঘরে শুয়ে আছে। অমিতার বড় ইচ্ছা, খোঁচা দিয়া রতিকান্তর মনের কথা কিছু জানিয়া লয়, কিন্তু রতিকান্তর নিকট কোনও কথা ছলে কৌশলে জানা যে অত্যন্ত কঠিন, তাহা সে বুঝিয়াছিল। অথচ ললিতার প্রতি রতিকান্তর পূর্ব্বানুরাগ এখনও যে সেইরূপ প্রবল আছে, এ পরিচয় সে পাইয়াছিল, অথচ কোনো পক্ষ হইতে এসম্বন্ধে কেহ মীমাংসা করিল না, ইহাতে অমিতাই যেন সর্ব্বাপেক্ষা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

রাধানগরে-স্মৃতি মন্দির—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান (হুগলি) রাধানগর গ্রামে গত ৩ বৎসর হইতে যে একটি বিস্তৃত সদনুষ্ঠানের আরম্ভ হইয়াছে, আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, বিশেষ তৎপরতার সহিত এবার তাহার কার্য্য চলিয়াছে। প্রথমতঃ একটি আধুনিক ধরণের মন্দির হইবে, এবং তন্মধ্যে রাজার পূর্ণাকৃতি প্রস্তরমূর্ত্তি থাকিবে। স্মৃতি-মন্দিরের চারি পার্শ্বে বিচিত্র পুষ্পোদ্যান (Park) থাকিবে। তৎপরে অতিথি অভ্যাগতদিগের জন্য অতিথিশালা (Guest House) ও একটি পাঠাগার থাকিবে যাহাতে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, দর্শন শাস্ত্রাদি এবং তাহার প্রচারের জন্য একটি বিশিষ্ট অধ্যাপকের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। এতদ্ভিন্ন "রামমোহন" সরোবর নামে একটি বিস্তৃত জলাশয় হইবে। এজন্য হুগলি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ৭৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আর সকল কার্য্যগুলি যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া উঠে তাহার বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছে। প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজার জন্মোৎসব উপলক্ষে রাধানগরে এক মেলা বসিবে। ফলত এই স্থান এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব বর্জ্জিত, সকল ধর্ম্মের—সকল জাতির—সকল সম্প্রদায়ের মিলন মন্দির—এক উদার তীর্থক্ষেত্র এই রাধানগরে হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাঁহারা এই কার্য্যের উদ্‌যোক্তা, তন্মধ্যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল প্রভৃতির নাম স্বাক্ষরিত ১৪নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, (বাদুড়বাগান) কলিকাতা হইতে এক আবেদন পত্রে সর্ব্বসাধারণের নিকট সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

রামমোহন-স্মৃতি সভা ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ দিবস উপলক্ষে কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরীতে এবং সিটী-স্কুল বাটীতে স্মৃতি-সভা হইয়াছিল, প্রথমোক্ত সভার শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং দ্বিতীয় স্থলে শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। উভয় সভাতেই সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বক্তাগণ বক্তৃতা দ্বারায় রাজার মহোজ্জীবনীর বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ঐ দিবস এই উপলক্ষে হুগলিতে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তথায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সদনুষ্ঠান—অজ্ঞানতা, অস্বাস্থ্য ও অর্থহীনতা বঙ্গদেশের তিন প্রধান শত্রু। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, ন্যাসনাল লিবারেল লীগ পল্লীর অজ্ঞানতা ও অস্বাস্থ্য দূর করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যে ৩০টা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং ক্রমে বঙ্গের নানা স্থানে বহুশত পাঠশালা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে বঙ্গের সর্ব্বনাশ করিতেছে। বঙ্গদেশের বৃহৎ গ্রাম সমূহে "কো-অপারেটিভ মেডিকেল ও এন্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটি" স্থাপন করিয়া অনিবার্য্য মৃত্যুর হস্ত হইতে পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা করিবার কল্পনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে ২ হাজার হইতে ৫০০০ লোকের অধিবাস এমন ১৭৫৮টা গ্রাম এবং ৫০০০ এর উপর লোকের বাস এমন ১২৫টা গ্রাম আছে। ঐ উভয় শ্রেণীর গ্রামে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক বাস করে। ঐ সকল বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে কো-অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপন করিয়া এবং লীগ হইতে ২৫।৩০ হাজার টাকা ধার দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা, জঙ্গল পরিষ্কার, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ; পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, ডোবা ভরাট ও নির্ম্মল পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। লীগ অবিলম্বে এই শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা এইরূপ আশা করি। (সঞ্জীবনী)

আমরা বলি, যদি ১০ বৎসরেও এই মহাকার্য্যের কতক পরিমাণেও সুসিদ্ধ হয় তবে অত্যন্ত তৎপরই এই কার্য্য হইয়াছে বলিতে হইবে।

বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার—বস্ত্রাভাবে যাহারা ক্লেশ পাইতেছে তাহাদের ক্লেশ দূর করিবার জন্য সিটি ও রিপণ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছেন, এই প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে বস্ত্র দান—প্রায় ২ মাস হইল, ব্রাহ্মসমাজ বস্ত্র বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বহু পল্লীতে সাধারণতঃ ডাকযোগে ঐ সকল বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে। গতকল্য পুনরায় ২ হাজার টাকার বস্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে। পল্লীবাসী যে সকল নর নারী বস্ত্রাভাবে ক্লেশ পাইতেছেন, তাঁহারা কলিকাতা ২১১, কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়কে পত্র লিখিলে তিনি প্রত্যেক

সহিত বস্ত্র প্রেরণ করিবেন। রায় সাহেব রাজমোহন দাস মহাশয় ২।১ দিনের মধ্যে বগুড়া, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় বস্ত্র বিতরণের জন্য গমন করিবেন, ব্রাহ্মসমাজ যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, দয়ালু নর নারীর সাহায্য ব্যতীত তাহা নির্ব্বাহ করা সম্ভব নয়। আমরা পরদুঃখকাতর নরনারীদের নিকট এই নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন এই সময়ে যথাসাধ্য নরসেবা করিতে চেষ্টা করেন। (সঞ্জীবনী ২রা আশ্বিন)

কাহারও গঙ্গাজল পান করা উচিত নয়—বাংলা সেনেটারী কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী লিখিয়াছেন যে, গঙ্গাজলে অহরহ পুরীষ এত অধিক পতিত হয় যে, পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, ঐ জল পান করিলে কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি রোগ হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। প্রত্যেক নৌকার এবং বোটের মাজী মাল্লারা গঙ্গাজলে মল ত্যাগ করে। তদশয় অনেক কল কারখানার মল গঙ্গায় আসিয়া পড়ে, সম্প্রতি সহরের উপকণ্ঠে ৯টা চট কলের কুলীদের ময়লা গঙ্গাজলে ফেলিবার আয়োজন করা হইতেছে—ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করা উচিত। যদি কোথাও একান্ত পক্ষে গঙ্গাজল পান করিতেই হয়, তবে তাহা সিদ্ধ এবং পরিষ্কার করিয়া পান করা উচিত।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গৈপুর নিবাসী—রাঁচি প্রবাসী সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়, গৈপুরগ্রামে পানীয় জলের জন্য, গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটি হইতে যে নূতন পুষ্করিণী (রিজার্ভ ট্যাঙ্ক) খনন করা হইয়াছে তাহার পাকা ঘাট নির্ম্মাণার্থে ৬০০৲ টাকা উক্ত মিউনিসিপালিটির হস্তে প্রদান করিয়াছেন। এজন্য বসু মহাশয় গ্রামবাসীর নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

শারদীয় আশ্বিনের আগমনে বঙ্গবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে এক নবানন্দ জাগিয়া উঠে। আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বে এই আনন্দ সর্ব্বসাধারণের মনে যে ভাবে জাগিয়া উঠিত, বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাদির পরিবর্ত্তনে তাহা শিক্ষিত বঙ্গবাসীর

প্রাণে একটু অন্য ভাবে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে ছিল যেখানে ধর্ম্মভাব—শ্রদ্ধা এবং ভক্তির ভাব, এখন আর সেখানে সে ভাব নাই—না থাকিবারই কথা, কেন না এখন আর সাধারণতঃ অন্ধ বিশ্বাস ততটা লোকের মনে নাই। এখন একটা জ্ঞানের ভাব সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মধ্যযোগে নানা কারণে সেই নব-জ্ঞানযোগের পথে আসিয়া পড়িয়াছে, বিতর্ক—সন্দেহ, আর সর্ব্বনাশা অবিশ্বাস! মার্জ্জিত জ্ঞান, নবরসাভিসিক্ত ভক্তি, দেশবাসীর প্রাণে কতটুকু স্থান পাইয়াছে? সুতরাং খাঁটী ভক্তি শ্রদ্ধার স্থান আর নাই বলিলেই হয়। তবে সেই জায়গায় আর একটু আনন্দের ভাব আসিয়াছে। 'আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত' চাকুরে বাঙ্গালীর সম্মুখে "পূজার অবকাশ" যখন আসে, তখন সে আনন্দ ক্ষণিক হইলেও তাহাতেই শ্রান্ত বঙ্গবাসী কয়েক দিনের জন্যও একটু আরামের নিশ্বাস ফেলিতে চায়, কিন্তু তাই বা কতটুকু হয়।

কুশদহ-সমিতি

—:০:০:০:—

গত ২০শে ভাদ্র, কুশদহ-সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারিত মতে বস্ত্র ক্লেশ নিবারণ জন্য যে সাব-কমিটী গঠিত হয়, গত ২৮শে ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় ৩৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট কুশদহ-সমিতির কার্য্যালয়ে উক্ত কমিটীর এক অধিবেশন হয়। তাহাতে প্রথমে সভ্যদিগের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ উপস্থিত হইয়া কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, কিন্তু যিনি সমিতির স্থাপন কর্ত্তা—বিধাতা ভগবান, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমিতির জনৈক সভ্য—খাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল এই সাবকমিটীতে উপস্থিত হন, তিনি এই মতান্তর দেখিয়া বলেন, বস্ত্র বিতরণ সঙ্কল্প কিছু অন্যায়কার্য্য নহে, এবং যখন এই কার্য্য করা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে তখন তাহা বন্ধ করা যাইতে পারে না—তৎপরে তিনি এই কার্য্যের জন্য ১০০৲ একশত টাকা দিবেন প্রতিশ্রুত হন। এই ঘটনায় সভ্যগণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়া অর্থ সংগ্রহ কার্য্যের ব্যবস্থা চলিতে থাকে। সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ বস্ত্র যাহাতে পূজার মধ্যে বিতরিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

তৎপরে গত ২৯শে ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সেণ্ট্রাল-

কলেজ ভবনে সমিতির সাধারণ সভার মাসিক অধিবেশন হয়। খাঁটুরা নিবাসী—কলিকাতা আহিরিটোলা প্রবাসী স্বর্গীয় মহানন্দ পাল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, (চাউল এবং লবণ ব্যবসায়ী) বাবু খগেন্দ্রনাথ পাল এই সভার সভাপতির কার্য্য করেন। প্রথমে সম্পাদক কর্ত্তৃক মাসিক কার্য্য বিবরণী পঠিত হইয়া বস্ত্র বিতরণ সম্বন্ধে সাব-কমিটী গঠন পর্য্যন্ত কার্য্যের উল্লেখ করিয়া সভার অভিমত জানিবার জন্য প্রস্তাবের ভাবে সম্পাদক কিছু বলেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত পতিরাম দে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রভৃতি বক্তৃতা দ্বারায় প্রস্তাবের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে বস্ত্রবিতরণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় নিজ মন্তব্যে সমিতির হিতকল্পে একটি উৎকৃষ্ট চিন্তাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি যাহা বলেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে, দেশবাসীর সাধারণশ্রেণীর মধ্যে কিছু কাজ করিতে না পারিলে সভা-সমিতির প্রকৃত উন্নতি সাধন করা সহজ হয় না। সুতরাং সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে কোনও কাজ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শিক্ষা ভিন্ন কোন সদ্বিষয় বুঝিবার এবং বুঝাইবার উপায়ই নাই। অতএব অন্যান্য কার্য্যের সহিত যদি সমিতি সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিকে দৃষ্টি করিতে পারেন তাহা হইলে আমার মনে হয় কাজ খুব ভাল হইতে পারে।

অতঃপর সভাপতিতে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

ইতি মধ্যে বস্ত্র বিতরণার্থে অর্থ সংগ্রহ কার্য্যে সমধিক লিপ্ত থাকায় সমিতি অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, তবে খাঁটুরা শাখা কার্য্যালয় স্থাপন দিনে ঐ গ্রামের একটি রাস্তা মেরামত সম্বন্ধে যে একখানি দরখাস্ত সমিতির হস্তে আসিয়াছিল, তাহার জন্য গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটীকে স্থানীয় কমিসনার এবং শাখা কার্য্যালয়ের সম্পাদক বাবু প্রমথনাথ দত্তের যোগে পত্র লেখা হইয়াছে। তিনি রাস্তাটির নাম এবং বিবরণ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

কুশদহ পঞ্জী

—:০:—

ডাক্তার কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গোবরডাঙ্গা

ডাক্তার কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺কৃষ্ণরামের ৺রামনারায়ণ ও ৺রামবল্লভ নামে দুই সহোদর ছিলেন। এই ৺রামবল্লভ গোবরডাঙ্গার পণ্ডিত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব পুরুষ।

কৃষ্ণরামের পুত্র ৺নসিরাম। নসিরামের দুই পুত্র ৺কাশীনাথ ও ৺বালকরাম। এই বালকরামের বংশধর হাজারিলাল মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদারদিগের আমিন ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

কাশীনাথের ৫ বিবাহ।

১ম পত্নী মাটিকোমরার ৺ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা। এই বিবাহে ইনি কুল ভঙ্গ করেন।

২য় পত্নী ইছাপুরের পূর্ব্বপাড়ার স্বর্গীয়া দেবী ঠাকুরাণী। দেবী ঠাকুরাণীর পৈতা দেশ বিখ্যাত ছিল। (দেবী ঠাকুরাণীর জীবন বৃত্তান্ত এই লেখক কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেটে লিখিত হইয়াছিল।)

৩য় বিবাহ বেড়গুম গ্রামে।

৪র্থ বিবাহ চাকদহের নিকট কামারপুল গ্রামে।

৫ম বিবাহ অজ্ঞাত।

কাশীনাথের দুই পুত্র, ৺মধুসূদন ও ৺রামপ্রাণ।

মধুসূদনের পত্নী, গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাড়ীর ৺তারাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা ইন্দ্রমণি দেবী।

৺রামপ্রাণের পত্নী, উক্ত তারাচাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃতা আনন্দময়ী।

মধুসূদনের ৩ পুত্র, ৺ক্ষেত্রমোহন, ৺কালীপ্রসন্ন ও শ্রীকেশবচন্দ্র।

৺ক্ষেত্রমোহনের দুই বিবাহ।

১ম পত্নী, নবীনকালী দেবী ছয়ঘরিয়ার ৺অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।

২য় পত্নী, কামিনী দেবী পুঁড়ার ৺হরিচরণ মল্লিকের কন্যা।

ক্ষেত্রমোহনের ২য় বিবাহের পুত্র শ্রীপ্রফুল্লকুমার। প্রফুল্লকুমারের দুই বিবাহ।

১মা স্ত্রী, মৃতা সুশীলাবালা দেবী গোবরাপুরের ৺বরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

২য়া স্ত্রী, শ্রীমতী মহামায়া দেবী ধর্ম্মদহের শ্রীদেবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

৺কালীপ্রসন্নের দুই বিবাহ।

১ম পত্নী, ইছাপুরের (কথক) ৺রাজনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা নবীনকালী দেবী।

২য় পত্নী, খলিদপুরের ৺মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা কামিনী দেবী।

কালীপ্রসন্নের ২য় স্ত্রীর কন্যা মৃতা পাঁচীর স্বামী হুগলি জাহানাবাদের শ্রীপ্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, (কটক জজকোর্টের উকীল।)

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নী মৃতা রাখালদাসী দেবী পারমাজদিয়ার ৺রামদাস বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা।

কেশব বাবুর দুই পুত্র ও দুই কন্যা।

১ম পুত্র ৺শৈলেন্দ্রকুমারের স্ত্রী মৃতা রাজমণি দেবীর পিত্রালয় বারুইপুর।

শৈলেন্দ্রকুমারের একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রকুমার।

কন্যা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী ও শ্রীমতী লাবণ্যলতা দেবী।

প্রভাবতীর স্বামী শান্তিপুরের শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীঅশ্বিনী কুমার ভট্টাচার্য্য।

লাবণ্য লতার স্বামী মতিহারীর শ্রীরামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেশব বাবুর ২য় পুত্র ডাক্তার বিমলেন্দ্রকুমারের স্ত্রী, শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী বেহালা বরিষার সাহিত্যিক ও মাইনপুরের উকিল, ৺ননিলালবন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

বিমলেন্দ্রের একটি পুত্র শ্রীপারিজাত কুমার, কন্যা ৩টি—প্রতিভা, প্রতিমা ও প্রমীলা সকলেই অবিবাহিতা।

কেশব বাবুর ১মা কন্যা—লীলাবতীর স্বামী ফরিদপুরের বঙ্গেশ্বরাদি গ্রামের ৺নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (ফরিদপুরের জজ কোর্টের উকীল।)

শ্রীমতী সুশীলাবালার স্বামী বেহালা বরিষার ৺অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সবজজের) পুত্র ৺সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি আলিগড় ডিঃ জজ ছিলেন)

লীলাবতীর একটি পুত্র শ্রীসলিলকুমার ও ৩ কন্যা।

১মা কন্যা সরসীবালার বিবাহ গৈপুরে হয়।

২য়া কন্যা শ্রীমতী বিজন বালার স্বামী গৈপুরে ৺সূর্য্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

৩য়া কন্যা শ্রীমতী বিজলীবালার স্বামী, বিখ্যাত গ্রন্থকার ৺নৃসিংহ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রীসলিলকুমারের স্ত্রী, কলিকাতা বাগবাজারের ৺কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী লতিকা দেবী।

৺হাজারিলাল মুখোপাধ্যায়

ডাক্তার কেশব বাবুর বংশাবলীতে ৺বালকরামের যে উল্লেখ আছে, তিনি এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ। বালকরাম হইতে এই বংশ পৃথক্ হইয়াছে। হাজারিলাল কুলিন। বালকরামের পুত্র ৺ভগবান। ভগবানের পুত্র ৺মতিলাল।

৺মতিলালের পত্নী রামনগরের ৺উত্তমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

মতিলালের দুই পুত্র হাজারিলাল ও ৺মাখন লাল।

হাজারিলালের স্ত্রী মল্লিকপুরে শ্রীভূষণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী হিরণবালা দেবী।

হাজারিলালের দুই পুত্র ও এক কন্যা।

পণ্ডিত

বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়

এই বংশ কেশবাবুর বংশে যে ৺রামবল্লভের উল্লেখ আছে, তিনি এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ। রামবল্লভ হইতে এই বংশ পৃথক।

রামবল্লভের পুত্র রূপরাম, রূপরামের পুত্র কৃপারাম। কৃপারামের পুত্র নন্দকুমার। নন্দকুমারের পত্নী ৺সরস্বতী দেবীর পিত্রালয় খলিদপুর। নন্দকুমারের পুত্র ৺দীননাথ।

৺দীননাথের পত্নী রাণাঘাটের নিকট বৈদ্যপুর গ্রামের ৺উদয়চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা আদ্যাশক্তি দেবী।

৺দীননাথের পুত্র শ্রীবরদাকান্তের একটি কন্যা মৃতা মহেশ্বরী দেবী।

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের ৩ বিবাহ।

১মা পত্নী, মৃতা হৈমবতী দেবী ছয়ঘরিয়ার ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী।

২য়া পত্নী, মৃতা কাদম্বিনী দেবী ইছাপুর—শ্রীপুরের ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

৩য়া পত্নী, শ্রীমতী দীনতারিণী দেবী ইছাপুরে ৺বাণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

২য় বিবাহের পুত্র শ্রীঅবনীকান্ত ও দুই কন্যা শ্রীমতী যোগমায়া দেবী ও শ্রীমতী পঙ্কোজিনী দেবী।

অবনীর দুই বিবাহ।

১মা পত্নী, মৃতা পঞ্চাননী দেবী ইছাপুরের ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

২য়া পত্নী, শ্রীমতী চারুমতী দেবী নারায়ণপুরের শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের কন্যা।

অবনীর দুই পুত্র ও ৩টি কন্যা।

শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর স্বামী ভেদিয়ার শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বরদাকান্তের তৃতীয় বিবাহের চারি পুত্র ও দুই কন্যা।

১ম পুত্র শ্রীজনার্দ্দনের স্ত্রী গ্রাম নারায়ণপুরের শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী শৈলবাসিনী দেবী।

২য় পুত্র শ্রীমধুসূদনের স্ত্রী কলিঙ্গের শ্রীকুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সোহাগিনী দেবী।

৩য় শ্রীভূপেন্দ্র, ৪র্থ শ্রীভবানীপ্রসাদ (উভয়েই অবিবাহিত।)

১মা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবীর স্বামী বারাকপুরের শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২য়া কন্যা শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবীর স্বামী বারাসতের শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"তোমার জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব"

দশম বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩২৫ { সপ্তম সংখ্যা

জাতীয় সঙ্গীত

—:০:—

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা।

শক্তি পূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হ'ত, চিরদিন ভারত,
শক্তি পূজে শক্তি হীন হ'ত না।
কেবল ডাকের গহনায়, ঢাকের বাজনায়,
শক্তি পূজা হয় না;
এক মন বিল্বদল, ভক্তি গঙ্গাজল,
শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়ে)
দিলে আতপায়, কি মিষ্টায়,
মা যে তাতে ভোলেন না;
কেবল জ্ঞান দীপ জ্বেলে, একান্ত ধূপ দিলে,
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা। (মা)
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা,
মা সে বলি লন না;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান দাও বিলাস বাসনা।
কাঙাল কয় কাতরে, জাত বিচারে,
শক্তি পূজা হয় না,
সকল বর্ণ এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।

—কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকির।

সত্যের পূজা

—:০:—

অচেতন জড়—অসত্যের পূজা করিয়া কোনও দেশ—কোনও জাতি কখন সজীব-একপ্রাণতা লাভ করিতে পারে নাই। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। কত দুর্ব্বল পতিত জাতিও উত্থানের পথে তখনই দাঁড়াইতে পারিয়াছে, যে পর্যন্ত তাহারা আধ্যাত্মিক-জগতের কোনও একটি সত্যের রেখা স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। বস্তুগত সত্য, গৃহীতার গ্রহণীয় শক্তি, দুয়ের সমবায়ে সত্য লব্ধ হয়। আলোক এবং দৃষ্টি-শক্তি দুইটির মধ্যে কোনটির অভাবে দর্শন-কার্য্য সম্পন্ন হয় না। হরিকে রাম বলিয়া ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় না, যে হরিকে চায়, রামের দ্বারায় তাহার সে কাজ হইতে পারে না। একথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে পারা যায়, এই যে বঙ্গের শারদীয় দুর্গোৎসব যাহা এত বড় একটি জাতীয় মহোৎসব—যাহা বহুকাল চলিয়া আসিতেছে, ইহার দ্বারা জাতীয় জীবনগতই বলি—আর ব্যক্তিগত জীবনের দিক দিয়াই বলি—বাস্তবিক আধ্যাত্মিকতা লাভের পক্ষে কি সাহায্য হয়?

বোধ হয় এই কথার অবতারণা মাত্রেই অনেকে খড়্গ-হস্ত হইয়া বলিবেন, "পৌত্তলিকতা বিরোধী কথা ও-ত জানাই আছে, ও কথা আর শুনিবার প্রয়োজন কি?"

আমরা প্রথমেই বলিতেছি, বাস্তবিক আমাদের সে উদ্দেশ্য নয় যে, এই দেশব্যাপী একটি জাতীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে অযথা প্রতিবাদ করা; আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে দেশবাসীর মধ্যে যথার্থ সজীব-একপ্রাণতা আসে; প্রাণহীন—অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ভাব ও শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহার দিকে যদি একজনেরও দৃষ্টি পতিত হয়, তবে তদ্দারাও দেশের কল্যাণ হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা আমাদের সর্ব্বপ্রথমেই স্মরণ হয় যে, প্রকৃত পূজা-উপাসনা জিনিষটা কি? তাহা আন্তরিক না বাহ্যিক? উপাসনা বাহ্যিক হইতে পারে না, তাহাতে কোনই উপকার হয় না। জ্ঞানগত আন্তরিক উপাসনাই যথার্থ সত্যের সাধনা। জ্ঞানের উদয় না হইলে অনুতাপ আসে না, অনুতাপ না আসিলে পাপ ত্যাগ হয় না। মিথ্যা আচরণ—অভ্যাসগত পাপ পরিত্যাগ

করিতে হয় না, অথচ পূজা-পার্ব্বণে মত্ত হওয় চলে, এ প্রকার পূজাদির মধ্যে কি সত্যের পূজা হয়? ইহা স্পষ্ট বাহ্যিক ব্যাপার নয় কি?

দ্বিতীয় কথা, সত্য পূজা কাহাকে বলে; সত্য কি? তাহার সহজ সংজ্ঞা কি? সত্য যাহা যথার্থ, স্বরূপ বস্তু, অর্থাৎ বস্তুর যথার্থ রূপ—কিন্তু কোনও প্রকার কল্পনা নয় কিম্বা উপমাগত বস্তুও নয়। জ্ঞানযোগে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইয়া—প্রেমযোগে—বাধ্যতাযোগে তাঁহার নাম করিয়া যে আনন্দ সে আনন্দেই ত চরিত্র শুদ্ধ হইয়া যায়, নতুবা কেবল বাহিরে উৎসবে মাতামাতি—কেবল বাহিরের আনন্দ—অবশ্য যাহারা তাহার অধিক আর কিছু জানে না, তাহারা তাহাকেই যথেষ্ট মনে করিতে পারে কিন্তু তাহা ত বিশুদ্ধ আত্মানন্দ নয়, উহা একটা সাময়িক ভাব মাত্র। চরিত্রের সঙ্গে, ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, তাহা হইলে কি উৎসবের মধ্যেও মানুষ দুর্নীতির কাজ করিতে পারে? তাই পূজা আসিল, আবার চলিয়া গেল, জন প্রবাহ আবার স্রোতে ভাসিয়া চলিল—দুঃখ তাপ মোহ কিছুই কাটিল না। জ্ঞানী ভক্তগণ ঐ জাতীয় আনন্দের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তাই দেশব্যাপী বাহ্যিক পূজার ভীতরকার অবস্থা চিন্তা করিয়া দেশ-ভক্ত—সত্যের সাধক—কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির গাহিয়া গেলেন—

"শক্তি পূজা কথার কথা না।" ইত্যাদী (প্রথম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ভগবানকে বিন্দু মাত্রও ভালবাসিতে পারিলে প্রাণ কত পবিত্র হয়—প্রাণে কত নির্ম্মল আনন্দ লাভ হয়, তাহা যে কখন অনুভবও করে নাই, তাহাকে কি তাহা বুঝান যায়। অতএব যে বাহ্যিক পূজায় জ্ঞানোদয় হয় না, চরিত্র শুদ্ধি আনয়ন করে না—কয়েক দিনের বাহ্যিক আনন্দেই পর্য্যবসিত মাত্র, তাহা প্রাণ-প্রদ একপ্রাণতা দান করিবে কিরূপে। এইজন্য দেশবাসীর নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, এখন আর সেদিন নাই—এখন জাগিবার দিন আসিয়াছে, সকলে চিন্তা করুন জাতীয় উৎসবাদির ভিতর হইতে কি উপায়ে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হইতে পারে, নচেৎ কোনও দুঃখ দুর্গতি দূর হইবে না।

যদি কেহ বলেন, "দেশবাসীর মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে কি সত্যের সাধনা একেবারেই নাই, এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন? সত্যের সাধনা দেশব্যাপীভাবে একদিনেই যে হইবে ইহা কি কখনও সম্ভব? ধর্ম্মজীবন লাভ

করা কি কাহারও হাত ধরা, যে ইচ্ছা করিলেই আজ দেশশুদ্ধ লোক সত্যের সাধনা করিবে ? এই জন্যই ত সমবেত ভাবে জাতীয় উৎসবাদির সৃষ্টি।

আমরা বলি এ কথার মধ্যে অবশ্য কিছু সত্য আছে। ব্যক্তিগত সাধনা—যেমন নাম জপ, নাম সঙ্কীর্ত্তন অথবা ক্রিয়া যোগ প্রভৃতি সাধন আছে। কিন্তু তৎসম্বন্ধেও আমরা এখানে সত্যের অনুরোধে একটি ইঙ্গিত করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ঐ সকল সাধনার মধ্যে জ্ঞানের উৎকর্ষ, কার্য্যোদ্যম, একপ্রাণতা, জন-সেবার ভাব তেমন পরিস্ফুট দেখা যায় না। সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে সংকীর্ণতা বদ্ধমূল হইয়া যাহা আছে, তাহারও পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

তারপর দেখিতে হইবে এই যত প্রকার পূজানুষ্ঠানাদি চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কত অর্থ ব্যয়—কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে কয় জনের প্রাণে প্রকৃত ধর্ম্ম-চিন্তা—তত্ত্ব জ্ঞানোদয়, বিবেক বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়—সম্ভবতঃ একজনেরও নয়। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহাতে বর্ত্তমান সময়োপযোগী দেশের কতটুকু উপকার হয়। অন্যদিকে দিন দিন শিক্ষিত বাঙ্গালী এই সকল অনুষ্ঠানের প্রতি ভিতরে ভিতরে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাই পূর্ব্বে যে পরিমাণে এই সকল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত এখন আর তাহা হয় না। যদি বলেন, অর্থাভাবে এখন এইরূপ হইতেছে,—না, তাহা বলা চলে না, আগে ইহাপেক্ষা সামান্য অবস্থার মধ্যেও অনেক পূজা-পার্ব্বণ হইত, এখন তাহা হয় না। তাহার একমাত্র কারণ অনুরাগ এবং বিশ্বাসের অভাব। তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী পূজার অবকাশে দেশ ভ্রমণে তৃপ্ত। আমরা বলি ইহা দূষনীয় বা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এমন করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম-জীবন "যবস্থব" অবস্থায় কি চিরদিন চলিতে পারে? একটা অবস্থাব অবস্থা লইয়া একটা জাতীর কখনই উন্নতি হইতে পারে না। উন্নতির পথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল খাঁটী ধর্ম্মবিশ্বাসের বল। আমাদের বিশ্বাস এই বাঙ্গালী জাতীর নাম যদি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইবার হেতু না থাকে, তবে অবশ্যই বিধাতার বিধান-শক্তিতে একদিন জাতীয়জীবনে প্রকৃত খাঁটী ধর্ম্মবিশ্বাসের বল আসিবেই। বিধাতা সেই দিন আনয়ন করুন।

ভ্রমণের সার্থকতা

আমাদের দেশের লোক যেমন কূপ-মণ্ডুক হইয়া বাস করিতে ভালবাসেন, অধুনা পৃথিবীর অন্যত্র কুত্রাপি এমন দেখা যায় না। যদি কেহ কথা পাড়েন, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কেহ কেহ তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহারই বড়াই করিয়া থাকি—কিন্তু নিজেরা যে ঐ সকল স্থান মানচিত্রে ব্যতীত দেখি নাই, তাহাতে আদৌ লজ্জিত হইনা।

বাঙ্গালী বিহারে গেলে, বা পূর্ব্ববঙ্গের লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিলে তাহাই বিদেশ হইয়া পড়ে, বিহারী বাঙ্গালায় আসিলে ভয়ানক পরদেশ হইয়া পড়ে; কিন্তু আজকাল পৃথিবীতে যাঁহারা মানুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশ ছাড়িয়া, কত ভয়ঙ্কর নদ, নদী, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া, কত শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমিকে অবজ্ঞা করিয়া, জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়াছেন, আপনাকে ধন্য ও মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, একথা প্রকৃতভাবে এদেশের লোক কয়জন ভাবেন বলিতে পারি না। স্বপ্নের চিন্তার মত এ সকল কাহারো মনে উঁকি ঝুঁক না মারে এমন নয়, কিন্তু স্বপ্নের ভাব স্বপ্নেই মিলাইয়া যায়, তাহা কাহারো বাস্তব জীবনে দেখা যায় না!

ঘরমুখো কেবল বাঙ্গালী নয়, আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারতের লোকের প্রকৃতিই এই। যদিও বোম্বের পার্শি, ভাটিয়া, সিন্ধি প্রভৃতি জাতিকে ব্যবসায়-কল্পে আজকাল জাবা, সিঙ্গাপুর, হংকং, কলোম্বো, মরিসস, ইয়োকোহামা, কোবে, এডেন, সুয়েজ, এলেকজান্দ্রিয়া ও ইউরোপের কোন কোন স্থানে বাস করিতে দেখা যায়, কিন্তু ভারতের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড দেশের লোকসংখ্যা হিসাবে দেখিতে গেলে তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য।

ভ্রমণ সম্বন্ধে যে জাতি আপনার সমাজে উৎসাহ না পায়, সে জাতি কস্মিন্‌কালে জগতে মাথা তুলিয়া চলিতে পারে না—কোনও কালে সে জাতির উন্নতি সম্ভব হয় না। শাস্ত্রীয় শাসন বা যুক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আবহমান কাল সাধারণ চলিত কথায়ও বিদেশ ভ্রমণকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হইয়াছে। সমুদ্র যাত্রা করিলে সপ্তম পুরুষের সম্বন্ধে রক্ষিত জাতি (Caste)

নষ্ট হয়, এমন কি বিদেশে না যাইয়া স্বদেশের ভিতর বেড়াইলেও সমাজ "ভবঘুরে" উপাধি দিয়া থাকেন, সুতরাং এমন স্বর্গীয় (Home comforts) গার্হস্থ্যসুখ বিসর্জ্জন দিয়া কে অর্থ ব্যয় ও অজস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া সমাজের অপ্রিয় হইবেন? বলা বাহুল্য, তাহার ফলে ভারতের উদার আধ্যাত্মিকতার আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আছে, জাতীয় জীবন (Life instinct of a nation) সম্পূর্ণ অপরিস্ফুট রহিয়াছে, শিল্প, বাণিজ্য আদৌ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই যদিও ভারতবর্ষের এ সকল অনুন্নতির অন্য যথেষ্ট কারণ আছে—তথাপি ভ্রমণশীলতার অভাব যে তন্মধ্যে একটি প্রধান বিষয়, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তাহা সহজে বুঝিতে পারেন।

ভ্রমণে আধ্যাত্মিকতা—ভ্রমণের বিমলানন্দ অনির্ব্বচনীয়। যদি বিধাতার রাজ্যে স্বর্গীয় উপভোগের বস্তু কিছু থাকে, তবে একমাত্র ভ্রমণ হইতেই তাহা পাওয়া যায়। যদি স্বর্গরাজ্যের সুষমা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাও, যদি গমন-সম্ভব অপরিসীম জল, স্থল ও বায়ু-মণ্ডলের যেখানে বিশ্বশিল্পীর যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট রচনাবলী আছে, তাহা দেখিয়া ক্ষুদ্র মানব জীবনকে ধন্য করিতে চাও, তবে বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন দেশের প্রকৃতির মনোহারিণী মূর্ত্তি, গিরি, নদ, নদী, প্রস্রবণ, জলোধি-কল্লোল ও অনিল-পথ দেখিয়া আইস—সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া যাইবে। এখন গৃহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা হইতেছে না—তখন গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করিবে না, দূর হইতে দূরান্তরে ছুটিয়া যাইবে।

তুমি বাঙ্গালী সম্ভবতঃ বলিয়া বসিবে, 'বিদেশে যে কষ্ট—কি করিয়া যাইব?' মনে রাখিও, এই ভীরুতাই তোমার জীবনের ভীষণ শত্রু। এক বার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখ—তোমার কষ্ট নিবারণ করিতে কিরূপ দয়ার্দ্র চিত্তে, তোমার শ্রান্তি দূর করিতে কিরূপ সুশীতল বায়ুর ব্যজন হস্তে, তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে কিরূপ অপূর্ব্ব মনোহারিণী বেশে প্রকৃতি তোমাকে অভ্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তুমি শ্রীকৃষ্ণ, নানক, চৈতন্য, মহম্মদ, যীশু, বুদ্ধ প্রভৃতি যে মহাত্মারই শিষ্য (follower) হওনা কেন, যাঁহার অবর্ণনীয় ঐশী শক্তির প্রভাবে স্বভাবের সৌন্দর্য্যে তুমি অপরিসীম কষ্টের ভিতরেও এই প্রকার বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছ, তখন তাঁহার চরণে তোমার মস্তক আপনাআপনি বিলুণ্ঠিত হইবে।

আগ্রার তাজমহল, সাইপ্রাসের কলোসাস, টেমসের জলবন্ধ, চীনের

প্রাচীর, আদি অদ্ভুত অচিন্তনীয় কীর্ত্তিকলাপ বা লণ্ডন, প্যারী, ইয়োকোহামা, নিউইয়র্ক প্রভৃতি মনোরম আধুনিক প্রধান প্রধান সহর সকল দেখিলে মানবাত্মার ভিতর দিয়া বিধাতার অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়া তুমি নিশ্চিত বিমুগ্ধ হইবে। অথবা নায়গারার জল প্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যোৎগম, সাগরের অহর্নিশি উদ্বেলন দেখিয়া স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্তের বৈচিত্র্যে তোমার প্রাণ বিস্ময় রসে আপ্লুত হইয়া যাইবে।

শান্ত তুমি, নিরাময় তুমি, নির্ব্বিকার তুমি, তোমার প্রাণ বিশাল প্রকৃতির গভীরতা ও নিস্তব্ধতায় মিলিত হইয়া ভগবানে বিলীন হইতে চায় না—কিরূপে বিশ্বাস করিব? সৌন্দর্য্য অন্বেষী, রূপ রস-গ্রাহী, সজ্ঞান, সহৃদয় তুমি, তোমাকে বিদেশ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে? কি আশ্চর্য্য! "নাল্পে সুখমস্তি—যো ভূমান্ তৎ সুখম্" এই ঋষি-বাক্য শুনিয়াও ঐ নীলাকাশের অসীম সীমানায় স্বাধীনতা-পাখা লইয়া তোমার প্রাণপাখী উড়িয়া বেড়াইতে চায় না, তোমার সমাজ তোমার পাখা কাটিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করে, তোমার কুসংস্কার তোমায় কুঠারাঘাতে পঙ্গু করিয়া দেয়, তুমি গয়া, কাশী পর্য্যন্ত যাইয়া গৃহে ফিরিয়া আইস—তুমি এই ক্ষুদ্র স্বভাবের দাস হইয়া ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সেই অচিন্ত্য বস্তুকে লাভ করিবে, এই কি তোমার বিশ্বাস?

দশ মাইল দুর সমুদ্র হইতে পরিদৃশ্যমান পুরীর অত্যুচ্চ ভুবনেশ্বরের চূড়া; বিশালগগণস্পর্শী, স্বর্ণকায় ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ পগোদা সকল; প্রাসাদ সদৃশ, প্রকাণ্ড গম্বুজ বিশিষ্ট বিভিন্ন দেশে ইস্‌লামীয় মসজিদ্; ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবং জেরুজেলামের চার্চ্চ, সেণ্ট হেলেনার ক্যাথিড্র্যালস্ প্রভৃতি অভ্রভেদী চূড়া-বিশিষ্ট, সুশোভন, অতিকায় ধর্ম্মমন্দির সকল স্বচক্ষে দেখিলে অবিশ্বাসীর প্রাণেও ভগবৎ-ভক্তির উদ্রেগ হয়। ধর্ম্ম-বিশ্বাস পৃথিবীতে এযাবৎকাল মানব প্রাণকে কিরূপ আয়ত্ত করিয়া আছে, এ সকল তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ভগবৎ-শক্তি মানুষের প্রাণে সহজে ক্রিয়া না করিলে, তাহার প্রাণকে উদ্বুদ্ধ না করিলে, কখনো এই প্রকার স্বর্ণরৌপ্য খচিত, সুবিশাল ধর্ম্ম মন্দির সকল প্রচুর অর্থ ব্যয়ে, অভাবনীয় শিল্পনৈপুণ্যে নির্ম্মিত হইত না।

ইউরোপ যাইবার সময় আমরা একবার সমুদ্র গর্ভে প্রচণ্ড ঝড়ের ভিতর পড়িলাম। বিশাল সমুদ্রের তুলনায় একখানা বড় জাহাজ অতিক্ষুদ্র। জাহাজে কয়েকজন ইউরোপীয় প্রবীণ জ্ঞানী প্যাসেঞ্জার ছিলেন; ইঁহারা আমেরিকা হইতে স্বদেশে যাইতেছেন। একজন আমেরিকান মেথডিষ্ট

মিসনের পাদরী ও অপর জন কোন পাশ্চাত্য বড় কলেজের প্রফেসর, হারবার্ট স্পেনসরের মতাবলম্বী, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান (agonostist)। ঝড়ের পূর্ব্বে ইঁহাদের উভয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছিল। প্রফেসর কিছুতেই স্বীকার করিবেন না—ঈশ্বর আছেন। পাদরী কিছুতেই মানিবেন না—ঈশ্বর নাই। অবশ্য দুইজনই শিক্ষিত, জ্ঞানী পুরুষ, সুতরাং ইঁহাদের তর্কযুক্তি শুনিতে অন্যান্য প্যাসেঞ্জারগণ জড়ীভূত হইয়া গেল। স্পেনসার যে বলিয়াছেন Invincible force working on our head "এই অদৃশ্য শক্তিকে যদি ঈশ্বর বলা হয়, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ প্রকৃতিরই (nature) ক্রিয়া. প্রকৃতিকে বাদ দিলে ঈশ্বর বলিয়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু পাওয়া যায় না" ইহা প্রফেসর যুক্তিতে দেখাইলেন। "প্রকৃতির আপনার কোন শক্তি নাই যে সে ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন চলিতে পারে; সেই অনন্ত শক্তির দ্বারাই প্রকৃতির শক্তি পরিচালিত হইতেছে।" পাদরী নিবেদন করিলেন। "বিশেষ শক্তি (force) কথা দ্বারা অনন্তরূপী ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। তিনি দয়ার সাগর, গুণের সাগর, কেবল শক্তির সাগর নহেন। তাঁহার করুণা ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না।" এ সকল কথা পাদরী যখন বলিতেছিলেন, দার্শনিক প্রফেসর "কবির কল্পনা" বলিয়া মনে মনে তাঁহাকে উপহাস করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে সহসা আকাশ প্রগাঢ় মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, সুনীল সমুদ্রের জল প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। জাহাজের মাস্তুলে danger signal (বিপদ-পতাকা উঠিল। প্রচণ্ড ঝড় জাহাজ খানাকে প্রতি মিনিটে ডুবাইয়া, ভাসাইয়া, নাচাইয়া ইহার ধ্বংসের চেষ্টা করিতে লাগিল।ধ্বংসোন্মুখ জাহাজের কাপ্তানের আজ্ঞায় যাত্রীর প্রাণ রক্ষার্থ (life boat) লাইফ বোট সকল জলে নামান হইল, কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ উর্ম্মি-রাশির অত্যধিক ঘাত প্রতিঘাতে লাইফ বোট জলে নামাইবার পূর্ব্বেই ষ্টীমার হইতে কতগুলি প্যাসেঞ্জার হঠাৎ ভূমধ্যসাগরের অতল জলে পড়িয়া গেলেন। দুঃখের কথা তন্মধ্যে সেই সন্দেহবাদী প্রফেসর মহাশয়ও ছিলেন। "ভগবান ত নাই—তবে এই ভীষণ বিপদ সময় সমুদ্র গর্ভ হইতে কে তোমায় রক্ষা করিবে," তেমন মুখর লোকেরা সমুদ্রের স্বাভাবিক অবস্থা হইলে নিশ্চয় তখন

তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত ; কিন্তু সকলেই তখন আপনাপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত—কাজেই এ প্রশ্ন উঠিল না।

সমুদ্রে যত প্রচণ্ড ঝড়ই হউক না কেন আধুনিক জাহাজকে ডুবান বড় শক্ত ব্যাপার ; ফলতঃ হাজার গণ্ডা হাঁবুডুবু খাইয়াও জাহাজ ডুবিল না—কতগুলি যাত্রী অসাবধানতা বশতঃ জলে পড়িয়া কোথায় কোন্ দিকে পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউর মুখে ভাসিয়া গেল, নাবিকেরা (Officers) দূরবীক্ষণ দিয়াও সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। অবশেষে সমুদ্রের স্বাভাবিক ভাব হওয়ার পরে প্যাসেঞ্জার লিষ্ট ধরিয়া ঠিক করা গেল, পাঁচ জন লোক জলে পড়িয়াছে। তাহারা পড়িতে না পড়িতে life boa (লাইফ বোয়া) সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যেন যাহারা সাতার না জানে, বা যাহারা সাতারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহারা তাহার উপর ভর করিয়া জীবন বাঁচাইতে পারে। কিন্তু তাহা কাহারো ভাগ্যে জুটিল—কাহারো ভাগ্যে আদৌ জুটিল না—কেহ স্রোতের মুখে দশ মাইল অন্তর ভাসিয়া গেল। কিন্তু দিবা ভাগে এই ঘটনা হওয়ায় তবু অনেক চেষ্টায়—কাপ্তানের অক্লান্ত পরিশ্রমে চারিজনকে লাইফ বোট সাহায্যে সুদূর হইতে তুলিয়া আনিয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচান গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল. কিন্তু আর একজনের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। অবশেষে সকলেই প্রায় তাঁহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেলেন—তিনি আমাদের সেই প্রফেসর !

প্রাণপণে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া কাপ্তান জাহাজ গন্তব্য পথে চালাইলেন, কিন্তু রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সমুদ্রগর্ভে দেখিলেন একটা উজ্জ্বল আলো (fiash light) জ্বলিতেছে। দেখিয়া স্থির করিলেন, তাঁহার (life boa) লাইফ বোয়া যুক্ত বাতি ছাড়া আর কিছু নহে, (আধুনিক বোয়াতে এক প্রকার টিনে বাতির বন্দোবস্ত থাকে, তাহাতে সজোরে ধাক্কা দিলে তাহা হইতে আলো নির্গত হইয়া সমুদ্রে ভাসিতে থাকে) কাপ্তানের তাহা দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সেখানে সমুদ্রে পতিত কোন বিপদগ্রস্থ জীবন আছে। কাপ্তান দিক ফিরাইয়া সযত্নে সেই বোয়ায় ভাসমান অর্দ্ধমৃত মানুষকে আপনার জাহাজে তুলিলেন। কাপ্তান কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারিলেন না—এই লোক তাঁহারই জাহাজের প্যাসেঞ্জার ; তাঁহার ধারণা এ লোক কোন জাহাজের যাত্রী। তাঁহার জাহাজের পতিত প্যাসেঞ্জারের এতদূরে জীবিতাবস্থায় ভাসিয়া আসা অসম্ভব।

অফিসারগণ কাপ্তানের আজ্ঞানুসারে খালাসীদের দ্বারা বোয়া সংলগ্ন উদরে রাশিকৃত সমুদ্রের জলপূর্ণ,সেই অর্দ্ধমৃত জীবনকে অতি যত্নে জাহাজের ডেকে তুলিলেন। জাহাজের ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জনতা হইতে পৃথক ক্যাবিনে লইয়া যাইয়া নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদ্বারা তাঁহার উদরস্থ জল নির্গত করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না; তারপর যখন তিনি অর্দ্ধস্ফুটস্বরে দু' এক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সহযাত্রীরা (যাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথন হইতেছিল) তাঁহাকে চিনিলেন যে তিনি সেই সন্দেহ বাদী প্রফেসর। প্রফেসরও তাঁহার সহযাত্রীদের চিনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—My friends, let me tender my hearty thanks to God that He gave me an opportunity to be convinced of His greatness and omnipresense through this calamity that befell me quite unexpectedly and through Whose grace I have been saved. (বন্ধুগণ, আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি তাঁহার মহত্তা ও সর্ব্বব্যাপকতা বুঝাইবার জন্য অভাবনীয় দুর্ঘটনায় আমাকে ফেলিয়াছিলেন—আবার তিনিই দয়া পরবশ হইয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন)।

"ভ্রমণে জাতীয় জীবনের বিকাশ" সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

কীর্ত্তির ডাকাতি

(ছোট গল্প)

—:•:—

কীর্ত্তি, আজ তোর ডাকাতির গল্প বল্, চুণীদি, শুনবে।

কীর্ত্তি কহিল, রোজই তো বলি দিদি, শুনে তোদের ভয় লাগে না? আমার একটা নাত্নী ছিল, সে তো শুন্তে শুন্তে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে আমার বুকে মুখ লুকুতো।

চুণীর বয়স বছর বারো, সে একটু পিছু হটিয়া কহিল, আর শান্তি, ও গল্প আর শুনব না, তোর ছোট্ট ঠান্দির কাছে বেজমা বেজমীর গল্প শুনিগে চল্।

শান্তি ভয় পাইবার মেয়ে নয়, ঠাকুরমার ঝুলির আর রেজমা বেগমের গল্পেতে তার অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, তার চাইতে কীর্ত্তির গল্পে বেশ নূতনত্ব আছে। আর এতো গল্প নয়, এ একেবারে সত্যি ঘটনা। কীর্ত্তির অতীত জীবনের কাহিনী। শান্তি চুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, ভয় করছিস্ কেন চুণীদি, কীর্ত্তি ডাকাত হোলেও এখন তো আর ডাকাতি করে না, এখন ও খুব ভাল হয়েছে ও আমাদের কত ভালবাসে, ওরা যাদের বাড়ীতে একদিন নুন খায়, তাদের কখ্‌খনো অনিষ্ট করে না, না কীর্ত্তি ?

কীর্ত্তি নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতের চেটোয় তামাকুর পাতায় চুণ দিয়া মলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল একদিন সে ঐ ডাকাতি করিয়াই পরম গৌরব অনুভব করিয়াছে, তাহার ভয়ে দেশের ধনী জমীদার সকলেই ভীত, ত্রস্ত থাকিত, তাহার সাকরেদী কবিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে কত লোক আসিয়া শরণাপন্ন হইত,অথচ আজ একটি বালিকার শঙ্কিত ভীত ভাবে তাহার মনে আঘাৎ করিল কেন ?

আট বছরের মেয়ে শান্তি, এই বিশাল বপু, সুদৃঢ় বক্ষঃ কৃষ্ণকায় লাঠিয়াল কীর্ত্তিকে খুব ভালবাসিত। পুরাতন দস্যুর পাথরের কলিজায় যে এই কুসুম সুকুমার বালিকাটির জন্য একটি স্নেহের উৎস সৃষ্ট হয় নাই তাহাও বলিতে পারি না। শান্তি দেউড়ীর ভিতরে বেঞ্চিতে বসিয়া কহিল, শুনে নে চুণী দি, এমন মজার গল্প আর শুন্‌তে পাবি না, আমি ত্রো রোজই শুনি। তোরা তো দুদিন পরে চলে যাবি। বল্‌না কীর্ত্তি—তোর গল্প আরম্ভ কর্, চুণীদির শুন্‌তে খুব মন আছে, কেবল ভয় ভয় কর্‌ছে।

মুখের মধ্যে দোক্তা পুরিয়া হাত ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভূমি হইতে মোটা চকচকে লাঠিটা তুলিয়া লইয়া কীর্ত্তি কহিল, এই লাঠি আমার গুরুর দেওয়া, এই লাঠি আমার চিরদিনের সাথী, এই হাতিয়ার নিয়ে কত দেশ বিদেশে ডাকাতি করে বেড়িয়েছি, কতজনার মাথা ফাটিয়েছি, পা ভেঙেছি, তারপর যখন আমার পৃথিবীতে আপনার বল্‌তে আর কেউ রইল না তখনও এই লাঠিই আমার সঙ্গী—একে নিয়ে আবার তোদের দুয়োরে চাক্‌রী কর্‌তে এসেছি।

চুণীর ভয় ক্রমশ ভাঙিয়া আসিতেছিল, উৎসুক্যও বাড়িয়া চলিতেছিল, সে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি ভারী নিষ্ঠুর ; মানুষের হাত পা মাথা ভাঙতে তোমার একটুও মনে ব্যাথা লাগ্‌তো না ?

কীর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল, বড় বড় রুই কাত্‌লা মাছ ছিপে উঠ্‌লে তোমাদের মন কত খুসী হয়, মনে ব্যথা লাগে কি ?

চুণী তাড়াতাড়ি কহিল, "বাঃ ওরা যে মাছ – খাবার জিনিষ।

কীর্ত্তি কহিল, তোমাদের দরকার পড়ে বলে ঐ বাহানা কর্‌ছ, আমাদের সেই রকম বাহানায় নিষ্ঠুর কাজ গুলো অক্লেশে কর্‌তে মনে ব্যথা লাগ্‌তো না। কিন্তু আমার এক নাত্‌নী এসে সে সব গোলমাল করে দিলে। আবাগীর বেটী নিজেও বাঁচলো না, আমাকেও পথে বসিয়ে গেল।

শান্তি অসহিষ্ণু ভাবে কহিল, গোড়া থেকে বলনা কীর্ত্তি, তা না হোলে চুণী দি বুঝ্‌বে কি করে ?

ছোট বেলা থেকে খুব ডাকাবুকো হয়ে পড়ে ছিলুম। আমাদের গাঁয়ে তখন অনেক ঘর হিঁদু মুসলমানের বাস ছিল। মহরম আর কালী পূজোর সময় ভারী লাঠি খেলার ধূম হোতো, তিন বছর উপরি উপরি যে লাঠি খেলায় জিত্‌তে পারত, সে সবার বড় হোতো। আমি যখন লাঠি খেলায় কবারই জিত্‌তে পারলুম, আমার খুব কদর বাড়্‌লো। তারপর সে অনেক কথা—তোরা অতো শুনে কি কর্‌বি দিদি; আমি একজন পাকা ডাকাত হোয়ে দাঁড়ালুম। দলের মধ্যে,আমায় সবাই খুব মেনে চল্‌তো সর্দ্দারও আমায় খুব ভাল বাস্‌ত।

একবার একটা খুব বড় ডাকাতিতে সর্দ্দারের হাতে একজন স্ত্রীলোক মারা পড়ে, সর্দ্দার সেবার থেকে কেমন যেন হয়ে গেল, আর ডাকাতি কর্‌তে যেতে চাইত না, আমাদের তখন যোয়ান বয়েস ঘরে বসে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ত না। বন জঙ্গল ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সময় বুঝে ডাকাতি কর্‌তে যেতে খুব উৎসাহ বোধ হোতো। একবার একটা খুব দাঁও বুঝে আমরা সকলে গিয়ে সার্দ্দারকে ডাকাতি করতে যাবার জন্যে ধরলুম্। সর্দ্দার কিছুতেই রাজী হোলো না, অনেক পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, স্থাখ আর তোরা আমায় বিরক্ত করিস না, আমি ও কাজ ছেড়ে দিলুম। যা রোজগার করিছি, ঐ রেখে খেতে পার্‌লে সাত পুরুষ খাবে। তোরা কীর্ত্তিকে সর্দ্দার করে নে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস্, এ বড় পেছল রাস্তা, সাম্‌লে চলিস্ ঝোপ বুঝে কোপ মারিস্, আর পুঁটি মাছের লোভ করিস না, বড়

কাৎলা রুই যখন পারবি ধরবি, মেয়ে মানুষের গায়ে খবরদার হাত দিস্ না, ছোট ছেলেপিলেদের মারিস্ না। আর একটা কথা, আপোষে দলের মধ্যে মিল রেখে চল্‌বি—ঝগড়া ঝাঁটি রাখলেই সর্ব্বনাশ। এই বুড়ো সর্দ্দারের শেষ কথা গুলো মনে রেখে কাজ করিস্। আমার কাছে আর কেউ আসিস্ না, আমি এখন বুড়ো বয়েসে হরি নাম করবো. অনেক পাপ করিছি, আর না।

গল্পের গতিকে বাধা দিয়া চুণী প্রশ্ন করিল, হ্যা কীর্ত্তি, পরের ধন কেড়ে নিলে পাপ হয়, এটা কি তোমাদের মাথায় আস্‌ত না?

কীর্ত্তি কহিল, মাথায় এলেও সে কথা মান্‌ছে কে দিদি! এক রাজা যখন আর এক রাজ্যের প্রজাদের ধনে প্রাণে মেরে ফেলে রাজ্য কেড়ে নেয় তখন সেটাকে বলে যুদ্ধ জয়! আর আমরা যা করতুম তোরা তাকে বল্‌ছিস্ ডাকাতি। যে যত যুদ্ধ করতে পারবে, যতগুলো মানুষ মারতে পারবে, তার খুব সুখ্যাতি হবে, সে বড় বীর বোলে, সবাই তাকে মান্‌বে, তা তোরা আমায় ডাকাত বলে ঘৃণা করলেও দলের লোক আমায় খুব খাতির করত, তারপর শোন্।

আমি বিয়ে থা করলুম্ আমার একটা মেয়ে হোলো। গাঁয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতুম, আমার বাবা খুব পাকা মিস্ত্রী ছিল। আমারও হাত খুব ভাল হোলো। আমার গাঁথনি সবাই পছন্দ করত, অনেকে আমার কাছে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখ্‌ত। অনেক দূরে দূরে বড় বড় পাকা ইমারৎ মেরামত করিবার জন্যে আমার ডাক্ আসত।

আমি আবার কিছু কিছু ঝাড় ফুঁকও জান্‌তুম, ছেলে বুড়ো কারো ওপর, ওপর নজর হোলে ভাল করে দিতুম্, সবাই আমায় মান্‌তও খুব। ভদ্দর লোকের বাড়ীর গিন্নিরাও ছেলেদের অসুখ বিসুখ করলে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঝাড়তে বলতেন।

দুটো বড় বড় ডাকাতীতে গিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা লুটে আনলুম্, আমরা গয়না পাতি আন্‌তুম্ না, কেবল নগদ টাকা আর গিনি, মোহর এই সব আন্‌তুম। আমার স্ত্রী বুধি ছিল ভারী ভালমানুষ আর বোকা, কাজেই তাকে কখখনো কিছু বল্‌তুম না, ডাকাতী করতে যাবার সময় বল্‌তুম কাজে যাচ্ছি, যে দিন ফিরতুম, তাকে মদ খাইয়ে নেশায় ভোর কোরে রেখে তবে মাটী খুঁড়ে টাকা কড়ি পুঁতে রাখতুম। নিজেরা খুব বুঝে চলতুম, পাছে কেউ সন্দেহ করে, সে জন্যে খুব ভাল খেতুম না ভাল পরতুম

না, মেয়েটাকে গয়না কাপড় যখন যা চাইত তাই দিতুম, সেটার নাম ছিল খুকুনী, আমাকে ভারী ভাল বাস্‌ত তাকে ছেড়ে এদানীং বড় বেশী কোথাও থাক্‌তে পার্‌তুম না।

গল্প শুনিতে শুনিতে ডাকাতের প্রতি চুণীর যতই অশ্রদ্ধা ও ভয় বাড়িয়া চলিতেছিল, তাহার কৌতুহলও সেই পরিমাণ বাড়িতেছিল, ভয়ের স্বভাবই এই যে ভয়ানক বস্তুটিকে বার বার ফিরিয়া নিরিখ পরখ করা। চুণী আবার তাই প্রশ্ন করিল, পাড়ার লোকের বাড়ী সিঁদ দিতে না?

কীর্ত্তি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিল,আমরা তো চোর নই যে সিঁদ দোবো। আমরা লুকিয়ে কোনো জিনিষ নিতুম না,আগে থাক্‌তে চিঠি পাঠিয়ে তবে আমরা ডাকাতী কর্‌তে যেতুম। আমরা গাঁ ঘরে কখনো লুটপাট কর্‌তুম না, দূর দূরান্তরে ডাকাতি করতে যেতুম। যাদের সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করি, হাসি কথা কই, উঠি বসি, তাদের কখনও সর্ব্বনাশ করতে পারি? তবে এক জনের বাড়ী অনেক টাকা আছে শুন্‌লেই আমাদের লোভ হোতো। ছ'লাখ দশলাখ জমিয়ে রাখ্‌বে আর কেউ বা একটা টাকার মুখ দেখতে পাবে না, সে আমাদের বরদাস্ত হোতো না। অমনি সাজ গোজ করে লুটতে যেতুম। ফেরবার পথে দুহাতে বিলিয়েও কিছু দিতুম। আমার দলের কেউ কেউ আবার সেটা পছন্দ কর্‌তো না, তবে মুখ ফুটে আমায় কেউ কিছু বল্‌তেও পারত না।

আমাদের গাঁয়ে মিত্তির বাবুরা আর বোস বাবুরা মামা ভাগ্‌নে সম্পর্ক ছিল। তাদের দুই দলে ভারী একটা আড়াআড়ি চল্‌তো। সাম্‌না সাম্‌নি কেউ কিছু না কোরে আড়ালে আব্‌ডালে কত কেলেঙ্কারীই কর্‌তো। রাতের বেলা কেউ ওদের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ছেঁকে নিত. কেউ বা তার ওপোর রাত্তিরে একাটি গিয়ে তাদের পুকুরের জলে এমন জিনিষ ফেলে দিত যাতে তার পরদিন সমস্ত পুকুরের মাছ ভেসে উঠে খাবি খেতো। কেউবা ওর পুকুরের মুখ কেটে মাছ বের করে দিত, আবার কেউ বা তার শোধ নেবার জন্য ওপক্ষের ধান জমীর বাঁধা আল গুলো রাত্তিরে সব কেটে দিয়ে জল বের কোরে ফসল মারবার চেষ্টা কর্‌তো। দু দলেই মাইনে করা সব লেঠেল ছিল। একবার খানিকটা ধান জমীর দখল নিয়ে কি লাঠালাঠিই না হোলো. ব্যাপার দেখে আমার হাসি আস্‌তো। মনে মনে একটু সান্ত্বনাও পেতুম,ওদের চাইতে আমরা বেশী কিছু নীচু কাজ করিনা, আপন রক্তের সম্পর্কের

লোকের সঙ্গে তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে, লেখা পড়া জানা ভদ্দর লোকেরা যদি এই কাণ্ড কর্‌ছে, তখন আমরা মুখখু ছোট লোক আর কত ভাল হব ?

আমাকে তো দু দল থেকেই লেঠেল রাখ্‌তে জেদ্‌ করেছিল. আমি কিন্তু কোনো দলেই ঘেঁসিনি, একবার যখন দু দলে খুব লাঠালাঠি হচ্ছে শুনলুম, তখন আমার এই সর্দ্দারের দেওয়া লাঠিটি নিয়ে গিয়ে হাজির হলুম, লাঠি লুফে নিয়ে বুক ঠুকে বললুম, তোরা দুই দলে লাঠি চালা, আমি মাঝখানে লাঠি চালাবো।

দুই দলে তাল ঠুকে, বুক ফুলিয়ে লাঠি চালাতে সুরু করলে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি লাঠি খেলা আরম্ভ করলুম। লাফিয়ে নেচে, ঘুরে ফিরে ডাইনে বাঁয়ে এমন লাঠি ঘুরুতে আরম্ভ করলুম, যে আমার লাঠিকে ডিঙিয়ে কেউ কারো লাঠিকে মার্‌তে পারলে না, অবাক হোয়ে সবাই আমার লাঠি খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল, বড় বড় লেঠেলরা লাঠি মাটিতে ফেলে, আমার সাম্‌নে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, সাবাস লাঠি ধরেছ কীর্ত্তি, এমন লাঠি খেলা কখনও দেখিনি, তোমার সাম্‌নে লাঠি ধরে আমরা ছেলে খেলা করিছি। ছোট বড় সবাই বাহবা দিতে লাগ্‌ল. কেউ কেউ বল্‌লে ও যে জাদু জানে, ওতো খেলার বাহাদুরী নয়, যাদুর গুণ।

দু চারটে বড় বড় ডাকাতীর পর আর কোথাও যেতুম না। কিন্তু দলের লোকগুলো ছিল ছিনে জোঁক, ব্যাটাদের খাঁই আর কিছুতে মিট্‌তে চাইত না। আমি যেতে না রাজী হওয়ায় তাদের মধ্যে দলাদলি সুরু হোলো। একদল আমাকে বাদ দিয়েই ডাকাতীতে যেতে চাইত আর একদল এগুতে চাইত না। আমার তখন সর্দ্দারের কথা মনে হোলো। কিন্তু উপায় কি ? তারপর হঠাৎ শুনলুম, এক জায়গায় ডাকাতী কর্‌তে গিয়ে দু জন ধরা পড়ে গেছে। তাদের কপাল জোর ছিল, কি রকম কোরে খালাস পেয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদল আমার নামে পুলিশের কাছে বেনামীতে চিঠি দিতে সুরু কর্‌লে, পুলিশ হঠাৎ একদিন আমার বাড়ী খানাতল্লাসী কর্‌তে এলো, আমি আমার লাঠি নিয়ে যেমন দাঁড়ালুম, ৪।৫টা কনেষ্টবলই রণে ভঙ্গ দিলে, শুধু লাঠি হাতে কীর্ত্তিরে ধর্‌তে এমন বীর এখনও জন্মায় নি। পাড়ার লোক স্বপ্নেও জান্‌ত না যে আমি ডাকাতের সর্দ্দার, তারা আমার পক্ষ হোলো।

তারপর দিন তিন চার পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা পেট ভরে ভাঙ খেয়েছি, এমন সময়ে একটা লোক এসে দৌড়ে খবর দিলে, কীর্ত্তি তোর ঘরে পুলিশ আস্‌ছে, সেদিন আমার কব্জীতে জোর ছিল না, লাঠি তুলতে পারলুম না, নইলে সব ব্যাটাকে এক হাত দেখে নিতুম। ব্যাটারা এসে আমার ঘরের মেঝে, রান্নাঘর, আঙ্গিনে খুঁড়ে একসা কোরে ফেল্‌লে, কিন্তু কিছুই কিছু সন্ধান পেলে না। আমি হাঁক দিয়ে বললুম, সব খুঁড়ে দেখো, কিন্তু আমার গাছ একটিও যেন নষ্ট না হয়, তা হোলেই মজা দেখাবো। বড় বড় বেগুণ গাছ গুলিতে দু চারটে তখন বেগুণ ধর্‌তে সুরু হয়েছে, তারই তিন হাত নীচুতে আমার সর্ব্বস্ব পোঁতা ছিল। ব্যাটারা মুখ চুণ করে ফিরে গেল, বুধি তো রাস্তার দাঁড়িয়ে দুস্‌মনকে লক্ষ্য কোরে গলাগালি সুরু করেদিল।

আমি তারপর দিন দলের লোকদের সন্ধানে গেলুম, তারা তো কেউ কবুল ছায় না, তবে দেখলুম এ ওকে সন্দেহ কোরছে, এর আড়ালে এ ওর নাম কোরছে। আমি বললুম ছাখ্, একজন ধরা পড়লেই অপর জনেরও সর্ব্বনাশ হবে, তোরা নিজের বিপদ নিজেই ডাক্‌তে গেলি ক্যান ?

দু দিন পরে ফিরে এসে দেখি, আমার ঘরের সাম্‌নে লোকে লোকারণ্য, আমার আঙ্গিনায় পুলিশ সাহেব নিজে এসে লোক লাগিয়ে খোঁড়াচ্ছে, আমার বেগুণের গাছগুলো খুঁড়িয়ে একঘড়া টাকা পেয়েছে, গাঁ উজাড় কোরে ছোট বড় সবাই ভিড় কোরে অবাক হোয়ে দেখ্‌ছে। আমি হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বন্দুক নিয়ে চারজন লোক আমায় ঘিরে ফেল্‌লে। সাহেব জিজ্ঞেস কোরলে, তুমি ডাকাতী করো ? এতো টাকা তুমি কোথায় পেলে ? আমি বললুম, আমায় কোনও কথা জিজ্ঞেস কোরো না। আমায় নিয়ে যা খুসী করতে হয় কর। পাঁচ ঘড়া টাকা বের কোরে আরও খুঁড়তে লাগ্‌লো। আর ছিল না, তা পাবে কি ? বুধি আর মেয়েটা আছাড় কাছাড় কোরে কাঁদতে লাগলো, আমার চোখ দিয়ে যেন আগুণ ছুটতে লাগলো। হাতে হাত কড়ি দিয়ে আমায় থানায় নিয়ে গেল।

জেলায় চালান কোরলে, উকীল কত জেদ্ কোরলে, ম্যাজিষ্ট্রেট কত কথা জিজ্ঞেস কোরলে, আমি সেই এক কথা বলে চললুম, আমি কিছু বোলবো না, তোমরা যা হয় আমায় নিয়ে করো। দশ বছর জেল হোলো। দশ বছর জেলে পাথর ভাঙলুম। মেয়েটার মুখ মনে পড়ে বুকের কল্‌জে যেন জলে যেতো। এক একবার পালিয়ে যাব মনে কর্‌তুম, কিন্তু তা কর্‌লুম না।

পাপের শাস্তি দশবছরে যদি ক্ষমা হয় তা হোলে তাই হোক্। মনকে প্রবোধ দিয়ে দশবছর পাথর ভাঙলুম।

জেলার সাহেবের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো খেলা কোরে বেড়াত চেয়ে চেয়ে দেখতুম, মনে মনে ভাবতুম যদি আমি ওদের চাকর হোতে পেতুম, তা হোলে আশ মিটিয়ে ওদের ভালবাসতুম,—আদর যত্ন করতুম। মেয়ে গুলো আমার দিকে ঘেঁসতো না। সাহেবের একটি ছেলে ছিল—তার নাম টম্। সে এক একবার চক্ষু ঘুরিয়ে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কোরতো, "তোম ডাকু হ্যায় ?" আমি বলতাম "আগে ছিলুম, এখন তো আমি ডাকু না, কয়েদী। টম্ বোলতো "তোম বদমাস হ্যায়। রোজই সে আমায় ঐ রকম দু একটা কথা বোলতো, আমার কাণে তাই মিষ্টি লাগতো।

ক্রমে দশবছর শেষ হোয়ে এল। আমি আশায় আশায় দিন গুণতে লাগলুম, দশবছরের পর মেয়েটি আমার কত বড় হোয়েছে। সে আমায় আর চিনতে পারবে কি না, এই রকম কত কথাই মনে হোতে লাগলো, কিন্তু একবার এ কথা মনে হোলো না যে, সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে।" হায় রে বাপ মার মায়া !

দশবছরের পর গাঁয়ে এসে দেখলুম আমার ঘর ভেঙ্গে চুরে মাটীর ঢিপী পড়ে রয়েছে। বুধি মরে গেছে। যে মেয়েকে দেখবার জন্য ছুটে এলুম, সে বেটিও আমায় ফাঁকী দিয়ে চোলে গেছে, তবে সবাই বোলতে লাগলো, সে রাতদিন আমার কথা বোল্‌তো। তার ডাকাত বাপকে আর সবাই ঘেন্না কোরলেও সে সদাসর্ব্বদা বাপের নাম কোরতো, বাবা ফিরে এলে আবার বাবাকে দেখবে এই তার বড় আশা ছিল।

সে আমার জন্যে কিছু রেখে গেছে, সে কিছু কি ? একটি বছর ছয়েকের মেয়ে। পরাণ মোড়লের বাড়ীতে মেয়েটা আছে। তার মাকে তার বাপ ভাত দিত না। খুকনী গাঁয়ের লোকের ধান ভেনে নিজের আর মেয়ের পেট চালাতো। মরবার সময় গাঁয়ের লোকের হাতে ধোরে বলেছিল, আমার মেয়েকে একমুঠো ভাত কেউ দিও, একটু বড় হোলে সে কাজ কোরে খাবে, ভিক্ষে যেন কারু দুয়ারে করে না। তারপর ওর দাদা ফিরে এলে একটা কিছু গতি করবে।

আমার দু চোখ দিয়ে জলের ধারা ছুটতে লাগলো, আমি পরাণ মোড়লের বাড়ী ছুটলুম। কানী (ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড) পরে একটি মেয়ে নাচদুয়ারে দাঁড়িয়ে মুড়ি খাচ্ছে। একি? ঠিক আমার সেই খুকনী। আমি দৌড়ে গিয়ে কোলে নিলুম মেয়েটা কিন্তু সচ্ছন্দে গলা জড়িয়ে ধোরে বললে "তুমি দাদা"? তার মা তাকে দাদার কথা এমন কোরে রোজ শোনাতো, যাতে তার ছোট্ট প্রাণটি তার দাদাকে চোখে না দেখলেও মনের মধ্যে চিনে রেখেছিল। আমি তাকে কত আদর করলুম, সে বারবার কোরে কেবল এই কথাটি বল্‌তে লাগলো, আমায় ছেড়ে তুই আর যাস্‌নি দাদা।

ছোট্ট খুকনীকে নিয়ে আবার ঘরকন্না পেতে বসলুম, এতটুকু কচি মেয়ে একেবারে আমায় যেন শত পাকে জড়িয়ে ফেল্‌লে। সে বাঁধন কাটিয়ে এক পা নড়বার আমার ক্ষমতা রইল না। আবার রাজমিস্ত্রীর কাজ কর্‌তে লাগলুম। খুক্‌নী আমার সঙ্গে মসলার পাত্তর নিয়ে ফির্‌তে লাগল। সন্ধ্যে হোলে দুজনে বাড়ী এসে রান্না কোরে খাই, খুক্‌নী কুট্‌নো কুটে দেয়, ঘর ঝাঁট দেয়, কত ভারীক্কী চালে কাজ করে, খেলুড়ী মেয়েরা ডাক্‌তে এলে বলে, এখন কি আমি ঘর ছেড়ে যেতে পারি? রাত্রি বেলা খাওয়া দাওয়া হোলে সে আমার কোলে বোসে বলত, দাদা, তুই ডাকাতী করতিস্? কি করে বল্‌না, দাদা শুনি। তার আগ্রহে এক একদিন বল্‌তে সুরু করতুম, সে কিন্তু শুন্‌তে না শুন্‌তেই ভয়ে আমার মুখে তার ছোট্ট হাত চাপা দিয়ে আমার বুকে মুখ লুকুতো।

এম্‌নি কোরে আমার দিন কাট্‌তে লাগল। ছোট্ট খুকনীর বিয়ে দেবার জন্যে সবাই বল্‌তে লাগল, আমি কিন্তু তাকে বিদেয় দিয়ে থাক্‌তে পারব না, সে জন্যে সে কথা কাণে নিতুম না। বরং দেখে শুনে এর পরে, মা বাপ মরা একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে ঘর জামাই করে রাখব, এইটে মনে করতুম। খুকনীকে বিদেয় দিলে আমার আর রইল কি? না, না, তাকে আমি প্রাণ ধরে পরের ঘরে যেতে দিতে পার্‌ব না। কিন্তু আমার ভাগ্যে আমার শেষ বয়সের এ সুখটুকুও রইল না, তাই খুক্‌নী আমার চারদিকে কচি হাতে যে সব বাঁধন খুবই শক্ত করে বেঁধেছিল, নিজেই আবার সে বাঁধন কেটে দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। আমার মুক্তি হোলো, জন্মের মতন ছুটি হোলো।

কীর্ত্তির স্বর ধরিয়া আসিয়াছিল, সে থামিল। তাহার পাথরের মতন

চিত্ত দ্রব হইয়া নয়ন পথে অশ্রুধারা নামিল। চুনী ও শান্তি স্তব্ধ হইয়া কীর্ত্তির মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। কীর্ত্তির বেদনায় তাহাদের দুটি কোমল প্রাণ সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তাহাদেরও চক্ষে অশ্রু বিন্দু টল্ টল্ করিতেছিল।

একটু পরে কীর্ত্তি আবার আরম্ভ করিল। তারপর পাগলের মতন, হেথায় সেথায় ছুটে বেড়ালুম। লোকে আমার দিকে চেয়ে ঈসারায় বলাবলি করত, দেখছ, হাতে হাতে কেমন পাপের শাস্তি, মাথার উপর ভগবান রয়েছেন, একি সহজ কথা!

আমার মনে হোতো, ভগবান এক চোখো; নইলে কত জনা তো কত পাপ কোরেও কেমন সাত ব্যাটার বাপ হয়ে সুখ সম্ভোগ করছে, আমার বেলায় অমনি বুঝি ন্যায় বিচার দেখান হোলো? কেন? আমি ঘুস্ দিতে পারিনে বলে? বছর বছর মানসিক কোরে, জোড়া পাঁঠা, মোষ এ সব বলি দিতে পারি নি বলে? আচ্ছা এইবার তো আমায় সব রকমে ফকীর করেছ, আর আমার কি কেড়ে নেবে? আবার দল বাঁধবো, আবার ডাকাতী কোরবো, কি করে আমায় তোদের ভগবান হাতে হাতে আর জব্দ করেন, দেখ্‌ব।

চির দিনের সাথী এই লাঠিটাকে হাতে নিয়ে পুরনোসঙ্গী সাথীদের খোঁজে বেরুলুম, কতজনা মরে গেছে। সর্দ্দার তখন খুব বুড়ো হয়েছে। কিন্তু কোনো অভাব নেই, নাতি পুতি নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে শেষ বয়েসে হরিনাম করছে! যাই হোক্ তার সুখে আমি হিংসে করি না। শীগগীরই আবার আমার চারদিকে লোক জড় হয়ে উঠলো কিন্তু রাত্রি বেলা স্বপ্ন দেখলুম খুকনী এসেছে, যেমন তাকে কোলে নিতে যাব, সে ভয়ে সরে যাচ্ছে, আর বলছে তুই ডাকাত? না দাদা, তোর কোলে যেতে আমার ভয় লাগছে।

আমার মন বিগড়ে গেল, রাতারাতি দলের কাউকে কিছু না বলে সরে পড়লুম। এ-দেশ ও-দেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে তোদের ঘরে এসে চাক্‌রী নিলুম। এই বেশ আছি দিদি, তোদের নিয়ে অনেকটা আরাম পাই। ভগবানের মর্জ্জি তো বুঝতে পারলুম না, সে এক মহা খামখেয়ালী লোক, কিন্তু উপায় নেই, তার রাজত্বিতে সে যা করছে তার উপর কথা কইতে গেলে কোনো ফল নেই। যদি কখনও সাম্‌না সাম্‌নি হোতে পারি, তবে তাকে একবার জিজ্ঞেস করি, এ খামখেয়ালের অর্থ কি।

চুনী গম্ভীর ভাবে কহিল, তুমি তো খুব পাপ করেছ, মলে পরেও তাঁর দেখা তো পাবে না।

কীর্ত্তি—লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া কহিল "পেতেই হবে, সাধ্য কি তার, যে আমায় লুকিয়ে থাকবে. আমি তাকে একবার ধরবই দিদি, তা বেঁচেই হোক আর মোরেই হোক। আমি পাপী হই, যাই হই, তারই হাতের গড়া তো বটে।

কীর্ত্তির মুখে একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আকাশের আঙ্গিনায় দেববালাদের পদ্মহস্তে শত শত মাণিকের বাতি জ্বলিয়া উঠিয়া চারিদিকে স্নিগ্ধ দীপ্তি ছড়াইয়াছে। শরত লক্ষীর গলার শিউলী ফুলের মালার বাতাসে সন্ধ্যার বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। চুনী ও শান্তির ভাব-নিমগ্নচিত্ত এই সময় বুড়ী ঝির ডাকে চমকিয়া উঠিল। বুড়ি ঝি বলিতেছিল, ওমা, দিদিমণিরা তোমরা সব এখানে। আমি সারা মুলুক খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক গা গয়না পরে, ভর্ সন্ধ্যেবেলা দেউড়ীর দোরে বোসে কি হচ্ছে তা জানি নে। যে দিন কাল পড়েছে, দু দুবার বাড়ীতে চুরী হয়ে গেল। এস এখন, মা ঠাকরুণ ডাকাডাকি করছেন।

শান্তি ও চুনী উঠিয়া দাঁড়াইল যাইতে যাইতে শান্তি কহিল, আর আমাদের বাড়ী চোর ডাকাত কেউ মাথা গলাতে পারবে না তা জানিস্ চুনী দি? কীর্ত্তি বলে, যে বাড়ীতে কীর্ত্তি লেঠেল আছে, চোর কি ডাকাতরা শুনবে, তারাদশ কোশ দূর থেকে নমস্কার কোরে পালিয়ে যাবে, সে দিকে আর এগুবে না।

শ্রীসরসীবালা বসু।

কুশদহর রক্ষার্থে অবতীর্ণ বাণী

যখন প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টির কোন অংশ ধ্বংশমুখে পতিত হয়, তখন তাহার রক্ষা মনুষ্য সাধ্যের যেন অনায়ত্ত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যদি তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজনাভাব না হইয়া থাকে, তবে তাহার ক্ষয় নিবারণ জন্য বাধিতা প্রেরিত প্রতিবিধান আসে। বিধাতার বিধান মানব-হস্ত-সিঞ্চিত

জলের ন্যায় নহে—তাহা স্রোতের আকারেই আসে। যেন সকলেরই জন্য ফলশালী হয়।

আমরা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ক্লীষ্ট কুশদহবাসী মাত্রেই কুশদহর পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে একরূপ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। কুশদহ রক্ষার জন্য বিধাতা কোন বিধান ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না, এত দিন আমরা তাহারও কোন অনুধাবন করিতে পারি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার লীলা রহস্য! যাই কুশদহ-বাসীগণ সমবেত ভাবে কুশদহ রক্ষার চিন্তায় মিলিত হইতে কেবল মাত্র সঙ্কল্প-যুক্ত হইয়াছেন, অমনি তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্র প্রকাশ করিয়া ধ্বংশমুখীন সন্তান সন্ততিগণের রক্ষার জন্য তিনি বহুপূর্ব্ব হইতে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার রহস্য ভেদ করিয়া তাঁহার সেই মহাবাণী শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি গম্ভীর—সুমধুর স্বরে বলিতেছেন:—

"হে আমার কুশদহ-বাসী সন্তানগণ, আমি তোমাদের রক্ষার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতে বিধান-ব্যবস্থা করিয়াছি, তোমরাও অনেকে তাহা অনুসরণ করিয়াই এখন পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছ, কিন্তু তোমরা তাহা অনুধাবন করিতে পার নাই যে, তাহা আমারই ব্যবস্থা। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্ঞানে-সচৈতন্যে তাহারই পূর্ণতা সাধন তোমাদের করিতে হইবে।"

"তোমরা যাহারা পূর্ব্ব হইতে সপরিবারে কুশদহর বাস ছাড়িয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে—সহরে, প্রবাসে আসিয়া, স্বাস্থ্যে, ধনে, বিদ্যায়, উন্নত হইয়াছ—হইতেছ, তাহারাই আপনাপন ব্যক্তিগত জীবন বাঁচাইয়া জন্মভূমির নাম রক্ষা করিয়াছ। আজ তোমরাও যদি ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিতে তবে তোমাদের দশাও ঐ দেশবাসীর ন্যায় হইত না কি? অতএব এক্ষণে যাহাতে তোমাদের প্রতিবাসীগণ যাহারা এখনও ভাল স্থানে আসিয়া তোমাদের ন্যায় আত্মরক্ষা করিয়া উন্নত হইতে পারিতেছে না; পল্লীতেই দিনের পর দিন ম্যালেরিয়া ক্লীষ্ট দেহ লইয়া ধ্বংশমুখে অগ্রসর হইতেছে, তজ্জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভাল স্থানে আসিয়া বাস করিতে, উৎসাহিত এবং সাহায্য কর।"

"তোমরা যাহারা কল্পনা বশতঃ মনে করিতেছ, দেশ ছাড়িয়া যেন অন্যায় করিয়াছ, এবং তজ্জন্যই গ্রাম জনশূন্য ও শ্রীহীন হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, উহা ভালই করিয়াছ, উহাতেই দেশ রক্ষা হইয়াছে।"

"দ্বিতীয় যাহারা একান্তই দেশ ছাড়িয়া আসিতে পারিতেছেনা, তাহাদের

মঙ্গলের জন্য এবং তোমাদের বংশাবলীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তোমাদের পল্লীর পরিত্যক্ত গৃহাবলী ও নিবিড় জঙ্গলাবৃত বাগানগুলি পরিষ্কার কর। তাহাতে প্রাকৃতিক নিয়মেই নষ্ট স্বাস্থ্যের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার হইবে। তোমাদেরও তাহাতে আবার দেশের প্রতি আকর্ষণ হইবে।"

"বাসস্থানের বাগানের সম্পূর্ণ আকার নূতন কর। নূতন স্থানে নূতন ফল-মূলাদিযুক্ত ক্ষেত্র কর। সাধ্যানুসারে সকলে তন্মধ্যে এক একটি পানীয় জলের ইঁদারা কিম্বা পুষ্করিণী কর।"

"তৃতীয়; যাহারা দেশের কৃষক - যাহারা তোমাদের অন্ন যোগায়, তাহাদের প্রতিও ভালবাসার কাজ কর। প্রথমতঃ তাহাদের নিরক্ষরতা দূরের জন্য গ্রামে গ্রামে—পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা (শিক্ষালয়) কর। তৎপরে অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধন করিতে চেষ্টা কর।"

"সমস্ত কুশদহবাসীর একতা স্থাপন দ্বারা এই সকল কার্য্য ও ভবিষ্যৎ বংশকে বলে ও চরিত্রে মানুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইবার জন্য গঠন কর"।

"কুশদহ রক্ষার জন্য ইহাই আমার আদেশ। ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই জানিবে। ইহাই মূল ভাব জানিবে। বিশেষ বিশেষ ভাব সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে আপনাপন হৃদয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইবে। মূল লক্ষ্য রাখিবে, দেশ রক্ষার জন্য সকলে প্রেমে মিলিত হও। ব্যক্তিগত ভাবেও প্রত্যেকে সুখী ও পুষ্ট হইবে। এই সত্য তোমাদের মধ্যে প্রতিভাত হইয়া, কেবল কুশদহবাসীর রক্ষার উপায় হইবে তাহা নহে, সকল পল্লীর রক্ষার্থেও এই প্রণালীই গৃহীত হইবে। এক্ষণে যাহারা এই সত্য গ্রহণ করিতে পারিবেনা—প্রতিবাদ, অবিশ্বাসও করিবে, তাহারাও পরে বুঝিতে পারিবে।"

ভগবদ্বাণী, মানবভাষার মধ্যদিয়া বর্ণিত হওয়ায় তাহাতে যে কোন অপূর্ণতা ত্রুটী না থাকে তাহা নহে; কিন্তু প্রত্যেকের অন্তরে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। আবার কালে মূলভাব হইতে মানববংশ যখন সরিয়া পড়িতে থাকে তখন তাহাতে বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

—:০:—

জগদ্ব্যাপী শান্তি—মানবের আত্যান্তিক "দুঃখ নিবৃত্তি" জ্ঞানে, ইহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যাপার। সেই অবস্থা হইতে পৃথিবী এখনও বহু দূরে। তৎপরে মানবে মানবে প্রেমে সদ্ভাবের এক প্রকার শান্তি রাজ্য আছে। বিবাদ বিদ্বেষ যুদ্ধবিগ্রহে এই রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। জগতের স্রষ্টা মঙ্গলময়। মানবের যত কিছু মানবীয় মনবৃত্তি আছে তদ্বারা মানব কখন সুখ কখন দুঃখ ভোগ করিতেছে, কিন্তু বিধাতা ব্যক্তিগত জীবনে বা সমষ্টিগত জীবনে সকল ঘটনার মধ্য হইতে জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। মানব পাপ করিয়া শাস্তি পায় তাহা মঙ্গলের জন্য। যাহা হউক এ সকল কথায় জন সাধারণের একপ্রকার মোটামুটী বিশ্বাস আছে কিন্তু ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতেই সমস্ত মানবের পক্ষে এক শান্তিরাজ্য আসিবে। এই সত্যে বোধ হয় জগতের সকল লোকের স্থির বিশ্বাস নাই। জাগতিক মানবের অবস্থা দেখিয়া এ প্রকার বিশ্বাস না থাকারও অবশ্য কারণ আছে। তবে মানব-চিত্ত স্বভাবতই বিশ্বাসী, আজ আমার যে বিশ্বাস নাই, কল্য তাহা আসিতে পারে।

এই প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের শেষ ফল যে মঙ্গলে পরিণত হইবে, এ বিশ্বাসে কেবল সাধারণের মধ্যে নয়, অনেক জ্ঞানী বিদ্বান লোকের মনেও সন্দেহ আসিয়াছিল। ন্যায় সত্যের জয় হইবেই এ কথা মৌখিক স্বীকার করিয়াও ন্যায় সত্যের নির্ব্বাচনে সকল মানুষের জ্ঞান বিশ্বাস সমান দেখা যায় না। মঙ্গলময় ঈশ্বরের স্বরূপে স্থির বিশ্বাস না থাকিলে সত্য দৃষ্টি লাভ করা যায় না। জগতব্যাপী মঙ্গলের রাজ্য আসিবে এ বিশ্বাসও বিধাতার মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাসের ফল মাত্র। মহাযুদ্ধে পৃথিবীর যত পাপ ক্ষয় হইল, যত সত্যের দৃষ্টি জাগিল—তাঁহার একমাত্র কারণ বিধাতা মঙ্গলময়।

কৃতজ্ঞতা দান—জগতে ওতপ্রত ভাবে অবিরত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু মানুষ তজ্জন্য চমকিত হয় না, চমকিত হয় তখন যখন প্রবল ঝটিকা প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। মঙ্গলময় বিধাতা অবিরাম অশেষরূপে জীবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ আমরা তাহা দেখি না। তবে যখন বিশেষ কোন অনুকূল ঘটনা ঘটে, তখন হয় ত একটু আধটু অনুভব

করি। বিশ্বাসী ভক্তগণ ভগবানের করুণা অনুক্ষণ অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হন। সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতা মোহ বশতঃ নিয়ত নিজ কামনা স্রোতে ভাসিয়া থাকে। কামনাই যে দুঃখের কারণ—যতদিন দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার না হয়, ততদিন শতবার দুঃখ ভোগ করিয়াও সে কথা মানুষ বুঝিতে পারে না, তাই সংসার সর্ব্বদাই দুঃখ ময় বোধ হয়। এই দুঃখ অশান্তি ভোগ করিতে করিতে ভগবানকে মঙ্গলময় বলিয়া বিশ্বাস করা অজ্ঞানী মানুষের পক্ষে কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানীর নিকট তাহা হয় না—মঙ্গল-দৃষ্টি মঙ্গলময় হইতে তাঁহারা লাভ করেন।

আজ যুদ্ধ নিবৃত্তিতে যে ঘটনা ঘটিল—পৃথিবী রক্ষা হইল—কখন কি হয় ভাবিয়া লোকের মনে যে আশঙ্কা ছিল—দিনের পর দিন নূতন নূতন দুর্ভিক্ষ্য উপস্থিত হইতেছিল—সর্ব্বোপরি রক্তস্রোতে ধরণী প্লাবিত হইতেছিল, তাহার নিবৃত্তি হইল। চারিবৎসর যুদ্ধে মানুষের মন কত কঠিন হইয়া গিয়াছিল, প্রতিদিন সহস্র সহস্র মানব-জীবনের ক্ষয়ে আমরা এতটুকও যেন কষ্ট বোধ করিতাম না, কিন্তু আজ সহসা অভাবনীয় রূপে দাম্ভিকের পরাভব ঘটিল। চিন্তাশীল মানব-হৃদয় আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভগবানের করুণা স্মরণ করিতেছেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া ভগবানের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছেন, মাতৃভূমির সেবকগণ আশার চক্ষে ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতি বর্ত্তমানেই বিশ্বাসচক্ষে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেছেন। উদারহৃদয় মনীষীবৃন্দ ভবিষ্যৎ জগতে এক অভিনব সাম্য রাজ্যের সূচনায় কত আশা করিতেছেন। ধন্য বিধাতার বিধান, আজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া ধন্য হই।

কুশদহ-সমিতি

(প্রাপ্ত)

(বস্ত্র বিতরণ কার্য্যবিবরণী)

এই দীর্ঘ অবকাশ কালে সমিতির কি কি কাজ হইল তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। ৺পূজার অবকাশে সমিতি বস্ত্র বিতরণ কার্য্যেই এক প্রকার ব্যাপৃত ছিলেন। এই মহৎ কার্য্যে সমিতি যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন গত মাসের কার্য্য বিবরণী হইতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। অতঃপর

সমিতি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই বস্ত্রভাণ্ডারে সাহায্য করিয়াছেন তন্মধ্যে খাঁটুরা নিবাসী পরদুঃখ কাতর শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারই উৎসাহে সমিতি এই কার্য্যে বিশেষ শক্তি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি এককালিন একশত টাকা বস্ত্রভাণ্ডারে দান করিয়া গরীব মাতৃ জাতির লজ্জানিবারণ ক্লেশ দূরের জন্য যেটুকু চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতেই যে পরমমাতার আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ দান সংগ্রহ হইবে তাহা অনেকেরই হয়ত মনে হয় নাই; কারণ "শুভ যার ইচ্ছা, ঈশ্বর তার সহায়" এ কথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। আমরা স্বকৃতজ্ঞ হৃদয়ে দাতৃগণের প্রতি নমস্কার জানাইয়া তাঁহাদের দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

নাম	নিবাস	কলিকাতার ঠিকানা	পরিমাণ
স্যার্ কৈলাসচন্দ্র বসু	...	সুকিয়া ষ্ট্রীট	২৫৲
রায় বাহাদুর হরিরাম গোএনকা	...	বড়বাজার	২৫৲
শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী	...	দর্জ্জিপাড়া	১৫৲
,, নফরচন্দ্র নন্দী	...	,,	১৫৲
,, নরেন্দ্রনাথ পাল	...	সুকিয়া ষ্ট্রীট	২৲
,, হৃদয়কৃষ্ণ দে বি, এ, (প্রফেসর)	...	মেট্রপলিটান কঃ	১৲
নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মাঃ শ্রীনাথ দত্ত	...	কলিকাতা	১০৲
হাকিম মাসীহর রহমন সাহেব (বেগম বাহার)	হৃদয়পুর	চিৎপুর রোড	৫৲
শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল	খাঁটুরা	পটলডাঙ্গা	১০০৲
ষ্টেট্ ৺ মহানন্দ পাল— মাঃ সুরেন্দ্রনাথ ও খগেন্দ্রনাথ পাল	,,	আহিরিটোলা	২৫৲
শ্রীযুক্ত কুশচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	,,	বড়বাজার	১০৲
,, মহামূল্য আশ	,,	,,	১০৲
,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য— (৺সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র)	,,	নন্দরাম সেনের গলি	২৲
,, খগেন্দ্রনাথ পাল	হরদাদপুর	বাগবাজার	১০৲
,, শিবদাস রক্ষিত	,,	বড়বাজার	৫৲

,,	সুবোধচন্দ্র কুণ্ডু	গোবরডাঙ্গা	রামবাগান	১০৲
,,	কুমুদবিহারী রায়	খাঁটুরা-'মঙ্গলালয়'	কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট	৫৲
,,	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ইছাপুর	টালা	১০৲
,,	গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল	,,	,,	৩৲
,,	অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,	,,	২৲
,,	যতীন্দ্রমোহন মিত্র	গৈপুর	হেমকরের লেন	২৲

মারফতে সম্পাদক, বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকগণ দ্বারা
কয়েকটি স্কুল কলেজের আদায় ১নং নঃ ৫নং বহি— মোট—২২॥৵০

৩১১॥৶০

ব্যয়

কাপড় খরিদ। ১০ হাত ৪৬ ইঞ্চি ২১ থান, ৮৪ খানা ৫৸০ হিঃ— ১২০৲
ধুতি ৯ হাত ৩৯ ইঞ্চি ৫০ জোড়া ৩৶০ হিঃ—১৬৫॥৵০ মধ্যে ১৬৩॥৵০

২৮৩॥৵০

গাড়ী ভাড়া ট্রাম ভাড়া ও কাপড় খাঁটুরায় পাঠান লগেজ
মুটে ইত্যাদি খরচ ৬৸/১০

২৯০।৶/১০

পুনরায় খরিদ

১২ খানা ধুতি ও থান মোট— ১৪৸৶০
ট্রাম ভাড়া— ৵/১০

৩০৫॥/০

মৌজুত—৬৵০ আনা সমিতির সম্পাদকের হস্তে সমিতির তহবিলে দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে বস্ত্র বিতরণের বিবরণী ছাপা হইবে এবং ডাক মাশুল দিয়া সকল সভ্য ও বস্ত্র-ভাণ্ডারে দাতৃগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

গোবরডাঙ্গা, হয়দাদপুর, খাঁটুরা, জামদানি, ত্রিপুল, দেওড়া, বেড়গুম, জানাপুল, পায়রাগাছি, ধর্ম্মপুর, ইছাপুর, ভদ্রডাঙ্গা, বেলিনি মাঠকোমরা, লোহপুল, ঘোষপুর প্রভৃতি ২১ খানি গ্রামে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অর্থ সংগ্রহ হইতে, প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে প্রকৃত বস্ত্রাভাব গ্রস্ত গৃহস্থদিগের তালিকা সংগ্রহ এবং বস্ত্র খরিদ, বস্ত্র বিতরণ পর্য্যন্ত কার্য্যের সমস্ত ব্যবস্থা ও কার্য্য-নির্ব্বাহার্থে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল "যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু "সুরেন্দ্রনাথ পাল, "পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, "নীলাচল মুখোপাধ্যায়, "নিশিভূষণ মুখো-

পাধ্যায়, "দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণকে লইয়া একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তি বিশেষের নিকটও পত্র লেখা হইয়া ছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মপুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বেড়গুম, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষপুর, মহাশয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য। বস্ত্রভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ উদ্যমশীল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল ও সমিতির চিরানুগত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় বস্ত্র ক্রয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই মাহার্ঘ বাজারে তাঁহারা অনেক সুবিধায় কাপড় সংগ্রহ করিতে পারিয়া ছিলেন।

২৮শে আশ্বিন নবমী পূজার প্রাতে গৈপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটিতে সাবকমিটীর এক অধিবেশন হয়। তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংগৃহীত, অভাবগ্রস্তগণের নামের তালিকা নির্ব্বাচনানুসারে মোট ১৮৪ খানা বস্ত্রের মধ্য হইতে ১৩৯ খানা কাপড় দেওয়া ধার্য্য হয়।

ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল শ্রীযুক্ত নীলাচল মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রভৃতি মহাশয়গণ খাঁটুরা অঞ্চলে ত্রিপুল দেওড়া প্রভৃতি গ্রামে বস্ত্র দিয়া মেদে হইতে নৌকা যোগে রাত্রে খাঁটুরায় আসেন। গৈপুর হইতে ঐ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামের বস্ত্রগুলি, তার প্রাপ্ত সভ্যগণের দ্বারা বিতরণকার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

এই কার্য্যে যাঁহারা স্বচক্ষে গৃহীতাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছেন, তাহাদের প্রেরিত মন্তব্য পাঠ করিলে বস্ত্র বিতরণ কার্য্য কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ঐ সকল মন্তব্য স্বতন্ত্র মুদ্রিত বস্ত্র বিতরণ কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে।

অতঃপর বস্ত্র সাবকমিটীর কলিকাতায় আর একটি অধিবেশন হয়, তাহাতে পুনরায় প্রাপ্ত নামের তালিকানুসারে উদ্বৃত্ত ৪৫খানি ও মৌজুত অর্থ হইতে আরো ১২খানি বস্ত্র খরিদ করিয়া তালিকা প্রেরক মহাশয়গণের দ্বারা দেওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীগিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

কুশদহ-পঞ্জী

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ

গৈপুর।

(চারু বাবুর সংগৃহীত পুথি হইতে লিখিত)

শ্রীহর্ষের উনিশ পুরুষের অধস্তন বিখ্যাত কামদেব পণ্ডিতের সন্তান এগার জন। এই ১১ জনের মধ্যে মধুসূদন আচার্য্যের দুই পুত্র—অনন্ত ও সন্তোষ। চুঁচড়ার স্বনামধন্য বিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই সন্তোষের ধারা হইতে উৎপন্ন। অনন্তের দুই পুত্র—শ্রীকান্ত বিদ্যানন্দ ও ভবানী বিদ্যালঙ্কার। শ্রীকান্তের ধারা এই কুশদহে দেখা যায়। শ্রীকান্তের সাত পুত্র। তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্র খুলনার অন্তর্গত হরিদাস গ্রাম হইতে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। উক্ত রামচন্দ্রের তিনপুত্র কাশীশ্বর, গোপাল (ভঙ্গ) ও গোবিন্দ। গোপালের পাঁচ পুত্র। ইঁহার দুই পুত্র গোবরডাঙ্গা হইতে নদিয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটের নিকট মধ্যমগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইঁহারা উক্ত গ্রামের ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের জমিদার। এই জমিদার বংশে গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র, রুদ্র ও মহাদেব। এই রুদ্রের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত রামদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় যশোহর মাজিষ্ট্রেটের সেরিস্তাদার ছিলেন। পেন্সন লইয়া এক্ষণে চাঁচড়ার রাজষ্টেটের ম্যানেজার। এই রামদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জামাতা শ্রীমান শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সবরেজিষ্টারি করেন। উপরোক্ত ভঙ্গ গোপালের ৫ পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র গোবরডাঙ্গায় থাকেন। এই গোপালের পৌত্র বিনোদ বিদ্যানিবাস বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এই বিদ্যানিবাসের ধারায় গোবরডাঙ্গায় রূপরঘু, হরি ও নারায়ণ।

গোপালের ভ্রাতা কাশীশ্বরের ১১ পুত্র। তন্মধ্যে অনেকেই নিঃসন্তান। কাশীশ্বরের পুত্র খেলারামের তিন পুত্র—কন্দর্প বিদ্যাবাগীশ, সন্তোষ ন্যায়ালঙ্কার ও প্রাণবল্লভ বিদ্যারত্ন। কন্দর্প বিদ্যাবাগীশের ও সন্তোষের সন্তানেরা ক্যাড়াগাছী ও কদম্ববেড়েয় গিয়া বাস করেন। প্রাণবল্লভ বিদ্যারত্নের বংশ গোবরডাঙ্গায় থাকেন। এই বংশের স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। গোপাল মুখোপাধ্যায়ের পত্নী গৈপুরে ৺বেণী মাধব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। গোপালের ভ্রাতা যদুর পুত্র সুবো-

গোবরডাঙ্গায় জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্যের জামাতা। যদুর স্ত্রী গঙ্গাগতি বংশীয় নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা হাজরাদাসী দেবী। গোপালের দুই পুত্র শ্রীকালীপদ (সন্তু) ও শ্রীপ্রফুল্ল। কালীপদর (সন্তুর) দুই বিবাহ। ১ম বিবাহ চাঁদায়, ২য় বিবাহ ঘাটবাঁওড় অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত। প্রফুল্লের বিবাহ খাটুরায় শ্রীযুক্ত সনাতন ভট্টাচার্য্যের ভাই ঝির সহিত।

উপরোক্ত রামচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র গোবিন্দের তিন পুত্র—রামবল্লভ, কৃষ্ণরাম ও রামনারায়ণ। রামবল্লভ কুশদহের বিখ্যাত কুলীনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। এই চাঁদ বন্দ্যোর বংশ গৈপুরের দক্ষিণ পাড়ায়, যশোহর জেলার সামন্ত গ্রামে ও খুলনা জেলার পির জঙ্গে দেখা যায়। উক্ত জগদীশ্বরীর রূপরাম ও বিষ্ণুরাম নামে দুই পুত্র ছিলেন।

রামবল্লভের ভ্রাতা রামনারায়ণের পুত্র নিধিরাম, ইছাপুরে রামজয় চৌধুরীর কন্যা ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন। নিধিরামের পুত্র তারাচাঁদ, তারাচাঁদের পুত্র আনন্দচন্দ্র একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এবং গোবরডাঙ্গায় জমিদার কালীপ্রসন্ন বাবুর সভাসদ ছিলেন। আনন্দের দুই পুত্র দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের পুত্র স্বর্গীয় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। ইহার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ গয়েশ পুরের কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত। এই স্ত্রীর পুত্র শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গায় জমিদার বাড়ীতে চাকরী করেন। দ্বিতীয় বিবাহ গৈপুরে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত। এই স্ত্রীর পুত্র শ্রীমান প্রমথ। ইনিও উক্ত জমিদারের সরকারে কাজ করেন।

রামবল্লভের ২য় ভ্রাতা কৃষ্ণরামের বংশাবলী গোবরডাঙ্গায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জগদীশ্বরীর যে দুই পুত্রের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপরাম কুল ভঙ্গ করেন। এই রূপরামের তিন পুত্র কৃপারাম, বলরাম ও রামেশ্বর। রূপরামের বিবাহ বেড়গুমের বেগের গাঙ্গুলী প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত। প্রাণকৃষ্ণ নিজে মেজেলি রায়দের বাড়ী ভঙ্গ হন, তৎকালে স্বকৃতভঙ্গ লয়বংশীয় রামদেব বন্দ্যো ও মধু চট্টো বংশীয় রামানন্দ চট্টোর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

রূপরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃপারামের দুই বিবাহ। ১ম বিবাহ টাকীর

চক্রবর্ত্তী দিগের বাড়ীতে অলকামণির সহিত, ২য় বিবাহ গঙ্গাপার চট্টো বংশে। কৃপারামের ৭ পুত্র, ১ম নন্দকুমার ২য় রামমোহন, ৩য় রাজচন্দ্র ৪র্থ কৃষ্ণমোহন, ৫ম রাজীবলোচন ৬ষ্ঠ নীলমণি ৭ম ঈশ্বরচন্দ্র।

১ম পুত্র নন্দকুমারের পৌত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্তের পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজচন্দ্র, রামমোহন ও নীলমণি নিঃসন্তান ছিলেন। ৪র্থ পুত্র কৃষ্ণমোহনের বিবাহ গৈপুরে লম্ব বন্দ্যো বংশীয় ৺কাশীনাথ বন্দ্যোর কন্যা আন্নাকালী দেবীর সহিত হয়। তৎপুত্র ৺উমেশচন্দ্র। ইনি সাহিত্যিক ছিলেন। ৺উমেশচন্দ্রের বিবাহ মদনপুরে হয়।

ইহার দুই পুত্র শ্রীষষ্ঠীবর ও ৺হারাণচন্দ্র। ষষ্ঠীবর বাবু গোবরডাঙ্গার মধ্যম সরকারের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। ইহার বিবাহ বেড়গুমের কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর সহিত। ৺হারাণচন্দ্রের বিবাহ চালৃকীতে হয়।

কৃপারামের ৫ম পুত্র রাজীবলোচনের একমাত্র কন্যার বিবাহ খুলনা জেলার অন্তর্গত শোভনাগ্রামের চট্টো বংশে হয়। রাজীবলোচনের দৌহিত্র ৺বিপিবিহারী চটোপাধ্যায় পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন।

৭ম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র (চারুবাবুর পিতামহ) গোবরডাঙ্গা হইতে টাকী বাস করেন। ইহার পত্নী গৈপুরে গঙ্গাগতি বংশীয় রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা নৃত্যকালী দেবী। এই বিবাহের পর ইনি গৈপুরে আসিয়া বাস করেন। ইনি বারাশাতের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রাণ বাঁচাইয়া তাঁহার নিকট সম্মানিত হন।

ইঁহার দুই পুত্র—শরৎচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের পত্নী গৈপুরে ৺রামধন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা লক্ষ্মীমণি দেবী।

প্রকাশের তিন বিবাহ, ১ম পত্নী ইছাপুরে ৺ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা সয়মণি দেবী। ২য় গৈপুরে ৺ হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মৃতা ক্ষেত্রমণি দেবী। ৩য় খুলনা বারুইপাড়া গ্রামের ৺পিয়ারীমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কন্যার সহিত হয়। প্রকাশের একমাত্র কন্যা জ্ঞানদা সুন্দরী দেবী।

শরৎচন্দ্রের দুই পুত্র—শ্রীচারুচন্দ্র ও শ্রীহরিদাস। চারু বাবুর তিন বিবাহ—

১ম—পারমাজদিয়া নিবাসী ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা মৃতা প্রভাতকুমারী দেবী—

২য়—ধর্ম্মপুর নিবাসী শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২য় কন্যা মৃতা শুভাসিনী দেবী।

৩য়—বেড়গুম নিবাসী ৺হারাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ২য় কন্যা মৃতা সরলাবালা দেবী।

৩য় বিবাহের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমান সচ্চিদানন্দ। কন্যা শ্রীমতী পুষ্পবালা দেবীর বিবাহ ঘাটভোগ নিবাসী ৺পরেশনাথ চটোপাধ্যায়ের ৩য় পুত্র শ্রীমান গিরিজাপ্রসন্নের সহিত। ২য় কন্যা বীণাপাণি (অবিবাহিতা) চারু বাবু বনগ্রাম হাই স্কুলের হেড মাষ্টার। তাঁহার প্রণীত "কালিদাস" পুস্তকে তাঁহার রচনার মাধুর্য্য প্রকাশিত আছে। হরিদাস বাবুর দুই বিবাহ।

১ম খাটুরা নিবাসী শ্রীকুশচন্দ্র ভটাচার্য্যের ১মা কন্যা মৃতা মলিনা দেবী।

২য়—নদিয়া দেবগ্রাম হাটপাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকমল চটোপাধ্যায়ের ১মা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সহিত।

১মা স্ত্রী মলিনার দুই পুত্র—শ্রীমান নয়নানন্দ ও শ্রীমান জীবানন্দ। একটি কন্যা শ্রীমতি বিজনবাসিনী দেবীর বিবাহ বড়িবা নিবাসী ৺কেনারাম গঙ্গোর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত। ২য় পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর একটি পুত্র শ্রীমান রণজিৎ।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

—:o:—

এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সমর-জ্বরের প্রভাব খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি কুশদহ অঞ্চলেও কম নহে। অনেক নরনারীর এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গৈপুর নিবাসী—রাঁচি প্রবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র অলোকনাথ, ২ দিনের জ্বরে গত ২৩শে আশ্বিন বিজয়া দশমীর প্রাতে সাকৃচিতে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। আলোকনাথ টাটার লৌহখনির রাসায়নিক পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বহু গুণান্বিত অমায়িক যুবক ছিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যার সহিত অল্পকাল হইল বিবাহ হইয়াছিল, একটি মাত্র শিশু পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। বসু মহাশয়ের এই দারুণ শোকের সান্ত্বনাবাণী যেন আমাদের বচনাতীত বলিয়া মনে হইতেছে। বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জামাতা রজতনাথের শোকে তাঁহার হৃদয় জীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তবে তিনি জ্ঞানী পুরুষ, মনে হয় কোন রকমে মনস্থির করিলেও করিতে পারিবেন, কিন্তু শোকাতুরা জননী এবং নবোঢ়া বধুমাতার কথা ভাবিলে বাস্তবিক হৃদয় আকুল হইয়া পড়ে। এক্ষণে আমাদের এইটুকু আশা যে, দুর্ব্বলসন্তানের প্রতি জননীর দৃষ্টি যেমন সর্ব্বোধিক—তদ্রূপ ভগ্নাত্মার প্রতি পরম জননীর কৃপাও যেন অধিক। তিনিই সকলের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

প্রবাদবাক্য আছে, "কালের প্রভাব মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না।" কালের কোন প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় না, বংশ পরম্পরা মানব মনের চিন্তাপ্রবাহ—জ্ঞান, ভাব, আকাঙ্খাদি যোগে কালের গতি নির্ণয় হয়; ফলতঃ মানবচিত্তই কালের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কাল তাহার সাক্ষী স্বরূপ। আমরা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্থানে স্থানে আমোদ প্রমোদ উদ্দেশ্যে "বারোইয়ারি" দেখিয়াছি, কিন্তু গ্রামের দশজনে মিলিয়া দুর্গোৎসব করা তখন ছিল না। ইহা অল্পকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কুশদহে এই প্রণালীর পূজা এক আদ খানি করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। গৈপুর, মাটকোমরা এইরূপ সম্মিলনী পূজা হয়। এবার গোবরডাঙ্গার ঘটকপাড়ায় আর একখানি নূতন আরম্ভ হইয়াছে। বিবিধ উপলক্ষে ভারতবাসী—বঙ্গবাসী মিলিতভাবে যতই সকল কাজ করিতে চেষ্টা করেন ততই ভাল। তাছাড়া খাঁটুরা দুই দত্ত বাটী, রক্ষিত বাটী, গোবরডাঙ্গার মধ্যম তরফ জমিদার বাটী ও গৈপুর শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয়ের বাটীতে শারদীয় দুর্গোৎসব হইয়াছিল, তবে ব্রজ বাবুর বাটীতে ধুম ধাম অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ করুন তাঁহার সৎকাজে প্রবৃত্তির অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, কুশদহ-সমিতি ক্ষুদ্র আয়োজনের মধ্যেও এবার পূজার অবকাশ কালে কুশদহর প্রায় ২১।২২ খানি গ্রামে নিঃস্ব গৃহস্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্য তিন শতাধিক টাকার বস্ত্র বিতরণ করিয়া দান কার্য্যে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন গৈপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয়ও অনেক বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন। আর গৈপুর নিবাসী কাশ্মীরের এসিঃ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পতিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একশত টাকার বস্ত্র গ্রামবাসীদিগের মধ্যে বিতরণ জন্য টাকা পাঠাইয়াছিলেন। কাঙ্গালের ঠাকুর—দুঃখীর বন্ধু ভগবান, দাতৃগণের অন্তরে আশীর্ব্বাদের সুকোমল স্পর্শ দান করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—পূজার অবকাশের পর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর প্রভৃতি কারণে ছাপাখানার কার্য্য বন্ধ থাকায়, কম্পোজ করা ফর্ম্মা ছাপা হইতে পারে নাই, এই প্রেস্‌-বিভ্রাটে পড়িয়া কার্ত্তিক সংখ্যা বাহির হইতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া একত্রে অগ্রহায়ণ, পৌষ সংখ্যা "কুশদহ" ২০শে পৌষ নাগাত বাহির করিতে হইবে। তজ্জন্য গ্রাহকগণ ব্যস্ত হইবেন না। অপর সংখ্যাগুলি ঠিক্ মত পাইবেন।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইল্‌কিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"তোমার জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব"

দশম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩২৫ | ৮ম, ৯ম, সংখ্যা

নূতন গান

(৭ই পৌষ "শান্তি নিকেতনে" গীত)

কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়!
জয় অজানার জয়।
এই দিকে তোর ভরসা যত ঐ দিকে তোর ভয়!
জয় অজানার জয়।
জানা শোনার বাসা বেঁধে, কাটল ত দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।
জয় অজানার জয়।
মরণকে তুই পর করেছিস্ ভাই,
জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই।
দু'দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে, তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়?
জয় অজানার জয়!

—রবীন্দ্রনাথ

সিদ্ধপুরুষ রাজা রামমোহন

—•—

(স্মৃতিসভায় কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম)

বৎসরের পর বৎসর, এমনই দিনে, আমরা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি আমাদিগের সম্মান, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য সম্মিলিত হই। তিনি এখন যে লোকে অবস্থিত. সেখানে আমাদিগের এ প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি গৃহীত হয় কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না। তথাপি যে আমরা তাহা অর্পণ করি, তাহার একমাত্র কারণ রাজা রামমোহনের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য নয়, আমাদিগের নিজের প্রতি আমাদিগের যে কর্ত্তব্য আছে তাহারও জন্য বটে। ভগবানের ভক্ত ও সেবকদের চিন্তায় আত্মার কল্যাণ হয়। রামমোহন ভগবানের পরমভক্ত ও একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, সেইজন্য আমরা আরো বিশেষভাবে তাঁহার কথা স্মরণ করিতে আসিয়াছি।

তাঁহার জীবনচরিতে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল আখ্যান আছে, তাহার একটি এই যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে মদন কর্ম্মকার নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। বুদ্ধিমান ও নিজের ব্যবসায়ে দক্ষ বলিয়া তাহার সুখ্যাতি ছিল। মদনের গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি চিত্র লম্বিত ছিল। মদন প্রতিদিন রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে লইয়া, ভূ-নত হইয়া, রাজাকে প্রণাম করিত। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মদন বলিত, রাজা রামমোহন রায় একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। মদন কিজন্য তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিত, তাহা আমি জানি না। কিন্তু সিদ্ধপুরুষ সম্বন্ধে প্রচলিত যে সকল সংস্কার আছে রামমোহন রায় অবশ্য তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সিদ্ধপুরুষ বলিলে লোকে তাঁহাদিগকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বুঝেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে শূন্যে বিচরণ করিতে পারেন, জল ও অগ্নির স্বাভাবিক শক্তিকে নষ্ট করিতে—এমন কি, দেবদেবীগণেরও দর্শনলাভ করিতে পারেন।

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৈরাগ্যবশতঃ সংসার ত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘকাল তিনি নানা তীর্থে ও নানা সাধুজনের সহবাসে যাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার জটাজুট মণ্ডিত, বিভূতিভূষিত মূর্ত্তি দেখিয়া

গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ রুদ্র বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তিনিও আপনাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং লোকের অনুরোধে আপনার অলৌকিক শক্তির প্রমাণ দিতে স্বীকৃত হইলেন। গ্রামের পার্শ্বে একটি নদী ছিল। বহুজনের সমক্ষে তিনি কাষ্ঠের পাদুকা পরিধান করিয়া সেই নদীর উপর দিয়া গমন এবং প্রত্যাগমন করিলেন। তখন জয়নাদে আকাশ ধ্বনিত হইল। সিদ্ধপুরুষ সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন যে, বহু কৃচ্ছ্র সাধন ব্যতীত কেহ এরূপ শক্তি লাভ করিতে পারেনা এবং কঠোর সাধনার ফলেই তিনি এই শক্তি লাভ করিয়াছেন। সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। কেবল একজন সরল কৃষক বলিল, "দাদাঠাকুর! দশ গণ্ডা কড়ি দিলে যে কার্য্য (অর্থাৎ খেয়া নৌকায় নদী পার) হয়—তা'র জন্য এই বারোবৎসর আপনি এত কষ্ট কল্লেন কেন?" এ প্রশ্নে সকলেই নিরুত্তর রহিলেন।

রামমোহন এ শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না। তাঁহার সিদ্ধি সত্য অন্বেষণে, তাঁহার সিদ্ধি সত্যপ্রতিষ্ঠায়, তাঁহার সিদ্ধি সত্য-সম্ভোগে। এই সত্য অন্বেষণে তিনি সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সত্যঅন্বেষণে তরুণবয়সে, ব্যাঘ্রভল্লুক-সঙ্কুল পথ দিয়া, তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। যখন তিনি সত্যলাভ করিলেন, তখন সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলেন। রাশি রাশি পুস্তক রচনা করিয়া, বহুব্যয়ে দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া এবং স্বয়ং মুদ্রা যন্ত্র স্থাপন করিয়া, তাহার সাহায্যে নিজের অর্জ্জিত সত্য তিনি স্বদেশীয়গণের নিকট প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার জন্য প্রকৃতই তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এই সত্য প্রচারের জন্য তিনি যে কি লাঞ্ছনা, কি নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাদ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'নগরান্তে বাসী'—অর্থাৎ চণ্ডাল। তিনি সহমরণ নিবারণের বিষয় বুঝাইতে যাইয়া ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড গমনের পূর্ব্বে লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, অনেকে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তিনি বিচলিত হন নাই। বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন।

রামমোহনের তৃতীয় সিদ্ধি সত্যসম্ভোগে। তিনি কেবল পুস্তকার্জ্জিত জ্ঞান লইয়াই তৃপ্ত ছিলেন না; নিজের জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া-

ছিলেন। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই তিনি স্থির, ধীর, অবিচলিত। কারণ, যিনি ভগবানকে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর সুখ দুঃখ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ছোট বড় সকল কার্য্যেই রামমোহনের এই অবিচলিত ভাব লক্ষিত হইত। ইংলণ্ড গমনের সময় প্রবল ঝড়ে জাহাজের দ্রব্যাদি বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বাসগৃহ জলপূর্ণ, দ্রব্যাদি সিক্ত, অপর যাত্রীরা যখন ব্যতিব্যস্ত, রামমোহন তখন অবিচলিত। তিনি কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী, পরীক্ষার জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অলীক মৃত্যুসংবাদ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। রামমোহন তখনও অবিচলিত। পত্র পাঠ করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই যে কার্য্য করিতে-ছিলেন তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন। অলীক সংবাদ-দাতৃগণ তাঁহার ব্যবহারে কাতরে ম্রিয়মাণ হইল। এইজন্যই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গঃ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

মনের এই সাম্যাবস্থা হইতেই তিনি সর্ব্বদা ভগবৎসান্নিধ্যজনিত সুখ সম্ভোগ করিতেন। কুমারী Hare লিখিয়া গিয়াছেন, whether sitting or riding he was frequently in prayer. এই নিত্য সান্নিধ্যসুখই প্রকৃত সিদ্ধি। এ যুগে যদি ভারতে কোন সর্ব্বাঙ্গীণ সিদ্ধপুরুষ জন্মিয়া থাকেন তবে এক রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার এই মৃত্যুবাসরে আমরা বিশেষভাবে তাঁহাকে স্মরণ করি এবং যে সত্যান্বেষণ, সত্যপ্রতিষ্ঠা ও সত্যসম্ভোগের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার অনুধ্যানে কৃতার্থ হই। (তত্ত্বকৌমুদী)

প্রায়শ্চিত্ত

ঊনবিংশ

টেবিলের উপর বড় ফুলদানিতে, কয়েকটি বৃহৎ রক্তবর্ণের গোলাপ, দুই তিনটি কুঁড়ি ও বিলাতী ফার্ণ দ্বারা বাঁধা একটি সুন্দর তোড়া, ঘরখানি সুগন্ধে ভরিয়া তুলিয়াছিল। বিছানায় শুইয়া কম্বলে দেহ ঢাকিয়া ললিতা একদৃষ্টে গোলাপ গুলির দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। যে ভাবনা গুলাকে সে বার বার তাড়া দিয়া মনের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিয়াছে—পলা

টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে, সেই গুলাই এখন ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে আসিয়া হুড়ামুড়ি বাঁধাইয়া একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিতেছিল। অনন্যোপায় হইয়া ললিতা ঐ গোলাপগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, ঐ যে সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল গুলি, যাহা প্রকৃতির মধ্যে কত দ্বন্দ্ব বিরোধের মীমাংসা চিহ্ন প্রকৃতির বক্ষ শোণিতের আভায় সমুজ্জল হইয়া গোপাল রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারও বিক্ষিপ্ত, জয় পরাজয়ের দ্বন্দ্বে নিপীড়িতচিত্ত কি একদিন সকল ব্যথা—সকল কণ্টককে ধন্য করিয়া জয়ের সৌরভে ফুটিয়া উঠিবে না? হউক তাহা বক্ষের শোণিতে রক্ত বর্ণ, সেই তো তাহার সার্থকতার চিহ্ন! যাহাকে সে জীবন দেবতা, পতিরূপে গ্রহণ করিতে যাইতেছে, উহা তাহারই চরণতলে উপহার দিবার উপযুক্ত দান।

অন্তর্যামী জানেন, ললিতা রতিকান্তকে বিভীষিকার ন্যায় দেখিতেছিল। এতো দিনেও নবেন্দুর প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ তাহার না জন্মিলেও, আজকাল যেন রতিকান্তকে দেখিয়া সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিতেছিল। এবং শিশু যেমন ভয়ানক জন্তু দেখিলে ভীত হইয়া আত্মীয় স্বজনের বক্ষে মুখ লুকাইয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে চায়, আবার ক্ষণে ক্ষণে মুখ তুলিয়া সেই ভয়ানক বস্তুটির দর্শনাকাঙ্খাও ত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ ললিতাও রতিকান্তর কণ্ঠস্বর শ্রবণে, রতিকান্তর দর্শনে যতই চাঞ্চল্য অনুভব করিত, ততোই সে নবেন্দুর সঙ্গ যেন প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিত, অথচ বিদ্রোহী মনকে কিছুতেই সম্পুর্ণ রূপে বশে আনিতে পারিতেছিল না, সে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাছলে সেই রতিকান্তকেই স্মরণ করিতে চাহিত।

হঠাৎ অমিতার পিছনে রতিকান্তকে দেখিবামাত্র, ললিতা চমকিয়া উঠিল। অজ্ঞাতপুলকে তাহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিলেও, জোর করিয়া সে বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিল, একি উৎপাৎ—আমার ঘরে কেন?

অমিতা রতিকান্তকে চেয়ার টানিয়া বসিতে দিল। রতিকান্ত বসিয়া কোমল স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিল, "ললিতা, কেমন আছ?"

রতিকান্তরও স্বর যেন আবেগ ভরে কাঁপিতেছিল, তাহারও বক্ষের স্পন্দন সহজ ভাবে হইতেছিল না।

ললিতা তৎক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। এ মধুর সামান্য একটি কুশল প্রশ্ন—এ স্নেহপূর্ণ আহ্বান সে যে কতদিন শোনে নাই; সে প্রশ্নে যে কতখানি

প্রাণভরা স্নেহ ভালবাসা প্রচ্ছন্ন আছে, তা কি তাহার অগোচর ? ললিতা মৃদুস্বরে কহিল, ভাল না।

রতিকান্তর মনে প্রশ্ন জাগিল, এ উত্তর কি শরীর মন উভয় সম্বন্ধেই ? তারপর গৃহ নিস্তব্ধ, কারো কোন সাড়া শব্দ নাই, টেবিলের ক্লক ঘড়িটা কেবল টিক্ টিক্ করিয়া সে নিস্তব্ধতাকে আঘাত করিতেছিল মাত্র। আরও কি কিছু বলিবার নাই ? রতিকান্ত দেশ ভ্রমণে আসিয়া হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবেই ললিতাকে দেখিতে পাইয়াছিল, দু' একদিনে আবার সে চলিয়া যাইতেছে, ললিতার নিকট হইতে সম্ভবত এ চির বিদায় গ্রহণ। সুতরাং তাহাকে দেখিতে আসিয়া, বিদায় লইবার জন্য মনের মধ্যে কি আজ পুঞ্জীভূত বাণী মুখ হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল না ? রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে তাহারা কি সবলে নিষ্ফল আঘাত করিতেছিল না ? রতিকান্তর হৃদয় কি কাতরকণ্ঠে কহিতেছিল না, "ওগো আমার চির মনোরমা হৃদয় লক্ষ্মী, ওগো আমার অন্তর শতদলবাসিনী প্রিয়তমা, আজ আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসে, কায় মনো প্রাণে দেবতার চরণে তোমার চিরকল্যাণ প্রার্থনা করি, তুমি চির সুখিনী হও. হতভাগার স্মৃতি তোমার সংসারিক সুখ শান্তিতে কখনও যেন কাঁটার মতো বিঁধে অশান্তির ব্যথা না জাগিয়ে তোলে।

কিন্তু মানুষ দেবতা নয় তার মনের বল যতই হউক, তাহার সীমা একটা আছেই, এ কথাগুলি ভাবিবার সময় রতিকান্তর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে বড় নীরস, বড় উদাস. মনে হইতেছিল, বিরাট শূন্যতায় তাহা মন ভরিয়া উঠিতেছিল, যেন কোথাও কিছু আর অবলম্বন করিবার নাই।

এই সময় সে নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া চপলকণ্ঠে অমিতা কহিল, রতিবাবু যে একেবারে বাক্‌শক্তিহীন হয়ে বোসে রইলেন। ছোট দি, শুনেছ নতুন খবর ? আমাদের রতি বাবু যুদ্ধে যাচ্ছেন ?

ললিতার কাণে কথাগুলা একেবারে সূচীর মত বিদ্ধ হইল, কিন্তু এ কি ? যে রতিকান্তর সঙ্গ আজকাল তাহার নিকট বিভীষিকার ন্যায় মনে হয়, তাহার চলিয়া যাইবার সংবাদে তাহার মনে ব্যথা অনুভব হয় কেন ? আর সে সংবাদ অমিতা তাহাকে শুনাইবারই বা প্রয়োজন কি ? অমিতা কি রতিকান্তর সহিত পরামর্শ করিয়া ললিতার মনের ভাব যাচাই করিতে আসিয়াছে ? ললিতার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "সে খোঁজ আমি নিতে চাই না, আমায় শোনাবার দরকার ?"

ললিতার অস্বাভাবিক বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে রতিকান্ত চমকিয়া উঠিল, এযে ঘৃণা, এ তো তাচ্ছল্য, এ তো অবজ্ঞা? ললিতা কি মনে করিতেছে, আমি কোনো ছলনা করিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি? ছি, ছি! মুহুর্ত্তে সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ললিতাকে কহিল, কিছু মনে কোরো না ললিতা, আমি শুধু তোমাকে একবার দেখতে এসেছিলাম, এ ছাড়া আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

অমিতা কহিল, "আপনি হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন কেন? দেখতে আসেন নি,খেতে এসেছেন? এমন কথা তো আমরা বলিনি,কি বলো ছোট দি?

রতিকান্ত সে পরিহাস কানে না তুলিয়া কহিল, না অমিতা, আমি চল্লুম। আমার সম্বন্ধে তোমরা আর যাই ভাব, আমাকে কিন্তু নিতান্ত নীচ হৃদয় মনে কোরো না। ত্রুটি আমার যা হোয়ে থাকে, তার জন্মে ক্ষমা কোরো।

রতিকান্ত চলিয়া গেল। জ্যাঠাই মা ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, রতি কি চলে গেল-রে? ওরা না কি কা'ল চলে যাবে, আমি আজ একবার ওবেলায় কমলার সঙ্গে দেখা করতে যাব বোলে দিতুম।

অমিতা কহিল, তা না বল্লেই বা কি হয়েছে গেলেই হবে। আমাকেও মা নিয়ে যেয়ো, আমিও কমলাদিদির সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো।

জ্যাঠাই মা চলিয়া গেলেন। ললিতা শ্রান্ত ভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিয়াছিল। অমিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ছোট দি, রতিবাবুর সম্বন্ধে ও রকম অগ্রাহ্য কোরে কথা বলাটা তোমার ভাল হয় নি, উনি মনে ব্যথা পেলেন—আর কি ভাববেন বলো দেখি।

ললিতার কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়িল। ললিতা তীব্র কণ্ঠে কহিল, ভাবলে তো বয়ে গেল, আমাকে দেখতে আসতে তাকে কেই বা ডাক ছিল। আমার অসুখ তা তার কিসের মাথা ব্যাথা?

অমিতা রাগিয়া গেল। কহিল, তা তো বটেই, এত লোক যারা দেখতে আসে, তাদেরও তো কিছু মাথা ব্যথা পড়েনি তবে রতিকান্ত বেলাতেই দোষ হোল? নিজের মনের কোনে কালি জমা করেছ বোলে রতিবাবুর মনের মধ্যেও সেটা আছে তাই মনে করেছ, কি তীব্র অনুযোগ!

ললিতাও এ অপ্রত্যাশিত অনুযোগের তীব্র কষাঘাতে রাগিয়া আগুন হইয়া, লেপ ফেলিয়া উঠিয়া বসিল, চোখ মুখ রাঙা করিয়া, ঝাঁজের

সহিত বলিল, বাড়াবাড়ি করিস্ নে অমিতা, আমাকে যা তা বলবার, তুই কে ? তুই তোর রতিবাবুর মনের খবর হাতড়ে বেড়াগে যা।

অমিতা ললিতার রাগ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। আস্তে আস্তে কহিল, বাড়াবাড়ি তুইই করছিস্ ছোট দি ? শেষ পর্য্যন্ত মিল রাখতে পারলে হয়। অই তোর মিষ্টার সরকার আসছে।

নবেন্দু ঘরে ঢুকিয়া ললিতার দিকে চাহিয়া কহিল, এখন কেমন আছ ?

"সেই রকমই।" ছোট্ট উত্তরটি দিয়াই সে আবার আপাদমস্তক কম্বল মুড়িয়া শুইয়া পড়িয়া আদি অন্তহীন চিন্তা সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। কূল কিনারা পাইল কিনা কে জানে ?

বিংশ

বৃহৎ বটগাছের তলায় যেখানে লোহার পেরেক সাজান খাটের উপর অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে, সাধুজী গম্ভীরভাবে হিন্দী ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন সেখানে ছেলে বুড়া নরনারীর অভাব ছিল না। ভীষ্মের শরশয্যার ছোটরকম সংস্করণ স্বরূপ এই কণ্টকশয্যায় শয়ান মহাপুরুষ যে একজন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ ছিল না। সকলেই ভক্তি-বিহ্বলচিত্তে, সাধুবাবার চরণে যথাসাধ্য প্রণামী রাখিয়া প্রণাম করিতেছিল। বিশুও বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছিল। প্রত্যহই সে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা ব্যাপার দেখে, এবং সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকার প্রশ্নে হরদাদাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে ; কেন না তাহার প্রশ্নগুলিকে আর কোন সহিষ্ণু শ্রোতা আমল দিতে চায় না। বালক তাহার এগারো বৎসর বয়স নিজেদের ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামেই অতিবাহিত করিয়াছে, এবং পল্লীসুলভ অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সে ক্রটি করে নাই। সে জানিত তাহাদের পল্লীই বুঝি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। ভূগোলে মানচিত্র দেখিয়া, ও কলিকাতা নগরীর সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়া অবাক্ হইত বটে, কিন্তু তবু তাহার মন সায় দিত না, যে এই চির পরিচিত ঘাট, মাঠ, পুকুর, রথতলা, হরিসভা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু মন ভুলান জিনিষ থাকিতে পারে। বড় বড় সহরের ঘর বাড়ী, রাস্তা, জনতা, সম্বন্ধীয় বর্ণনাকে সেও অনেক রকম রঙের ছোপ ধরাইয়া মনের মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ এই সুদূর পশ্চিমে আসিয়া, নানাদৃশ্য দেখিয়া বিপুল কোলাহল, লোক সমারোহের মধ্যে

সে একেবারে বিস্ময় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের পল্লীটির বাহিরেও এতো বড় পৃথিবী, এতো কোলাহল, এতো বিস্ময়, এতো আনন্দ আছে ইহা তাহার কাছে বড় কৌতুক জনক মনে হইত। আবার বাড়ী ফিরিবার সময় কাশী বেড়াইয়া যাওয়া হইবে, আবার একটি নূতন দেশ দেখা যাইবে, বাড়ী ফিরিয়া সে তাহার এই অত্যাশ্চর্য্য ভ্রমণ কাহিনীর খুঁটি নাটি বৃত্তান্ত ভুতোনকে মহোৎসাহে শুনাইয়া তাহাদিগকে চমৎকৃত করিবার প্রলোভন মনের মধ্যে জমাইয়া রাখিতেছিল, কিন্তু এতো শীঘ্র এ ভ্রমণ শেষ করিবার তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অথচ কা'লই তাহাদের যাইতে হইবে, মা পোঁটলা পুঁটলি বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। হিন্দী ভাষা তাহার নিকট দুর্ব্বোধ্য হইলেও সে ভাষা শুনিতে তাহার ভালই লাগিত, এবং ভাটা মানে বেগুণ, কদুয়া মানে লাউ, তরোই মানে ঝিঙা প্রভৃতি হিন্দী বিশেষ্য গুলি সে এ কয়দিনে আয়ত্ত করিয়াছিল! বাড়ী গিয়া সকলকে সে তাহার হিন্দি ভাষায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া চমৎকৃত করিবে সন্দেহ নাই। আর একটি মজার কথা সে সংগ্রহ করিয়াছিল। আগের দিন সকালবেলায় পাণ্ডাদের একটি ছোট ছেলেকে বিন্দু একটি নাউ আনিবার জন্য দাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলে "দু ডবল লাগবে মা-জী। বিন্দু দুটি পয়সা দিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে যে 'নাউ' আনিয়া উপস্থিত করিল, বিন্দু উহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, কেন না সেটি খাদ্য মোটেই নহে, বরং তাহাদেরই মতন একটি সজীব মানুষ, এবং বগলে কামাইবার সরঞ্জাম। বিন্দু বিস্ময় হইয়া যখন বকাবকি আরম্ভ করিলেন, বালকটি হতভম্ব হইয়া কহিল, "তুম তো মা-জী, দো ডবল দিয়া, হাম তো দো ডবল দেইকে নাউ লায়া—পুছো উস্‌কো।"

রতিকান্ত ও হরদাদা ব্যাপার শুনিয়া হাসিয়া অস্থির, আর বিশু তো একেবারে মাটীতে লুটোপুটি। সে সেই দিনই সেই কৌতুক কাহিনী অমিতাদের নিকট বলিবার জন্য হরদাদাকে টানিয়া সেখানে লইয়া গিয়াছিল, এবং সে কাহিনী শুনিয়া শ্রোতারাও অবশ্য সে হাসিতে যোগ দিয়াছিল, নহিলে বিশুর উৎসাহ জমিবে কেন? শুচিতা যখন জিজ্ঞাসা করিল, "বিশু, তুমি যে এতো হাস্‌ছ তুমি বল দেখি নাউ মানে কি?" বিশু সগর্ব্বে কহিল "কেন আমি কি জানিনা নাকি? নাউকে ওরা নাপিত বলে। আমি কি ওর মতন বোকা?

কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তীর্থ যাত্রী স্ত্রীলোকের দল নিজেদের পুণ্যের হিসাব করিতেছিলেন, কোন্ তীর্থ ভ্রমণে কি কি ফল, এবং কার ভাগ্যে

কোন্ কোন্ তীর্থ দর্শনে সে ফল সঞ্চয় হইয়াছে, "পাপ মুখে বলিতে নাই" বলিয়া, সকলেই একে একে উহার তালিকা, তীর্থস্থানে সঙ্কল্প ও সুফল প্রভৃতির দ্বারা তীর্থের পাণ্ডা মহারাজের নিকট হইতে বৈতরণী পারের ছাড় পত্র কাহার কাহার অদৃষ্টে জুটিয়াছে, একে একে এই সকল আলোচনা করিতেছিলেন। ঘর বাড়ী আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া সুদূর প্রয়াগে কল্পবাসে একমাস কাটাইতে আসিয়া দিনের পর দিন মন কিরূপ উতলা হইয়া উঠিতেছে, কেহ বা ছেলের পত্রে, কেহ কন্যার, কেহ কোন আত্মীয়ের পত্রে তাঁহার অবর্ত্তমানে কিরূপ সাংসারিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে সে কথাও বলিতে ছিলেন, অথচ মাস পূর্ণ না করিলে কল্পবাসের পুণ্য লাভ হইবে না সুতরাং এ কয়টা দিন না কাটাইলেই নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্যাঠাইমা অমিতাকে লইয়া কমলা ও বিন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদেরও এই রকম আলোচনা চলিতেছিল। "রাজা বাসুকী", "আলোপী মাই," "ভরদ্বাজ আশ্রম," "শিউ কোটী" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য পুণ্য স্থানগুলিও সব দেখা হইয়াছে কি না, কোন স্থানের মাহাত্ম্য কিরূপ এই সম্বন্ধে টীকা টিপ্পনিও চলিতেছিল।

এই সকল ভাবনা চিন্তা, সম্ভবতঃ অন্য বয়সের জন্য রাখিয়া, বয়োধর্ম্মে যে চিন্তা—যে ভাবনা মানুষকে ব্যাধির আকারে পাইয়া বসে, অমিতা ও রতিকান্তর মধ্যে উহারই সমালোচনা কিছু তীব্র ভাবেই চলিতেছিল। গঙ্গার একটা বালুকাময় চরের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে অমিতা কহিতেছিল, "আপনি বিশ্বাস করুন রতিবাবু, ছোটদি আপনাকে ইচ্ছে করে অপমান করেনি, বা আপনার সম্বন্ধে কোনো মন্দ ধারণা তার হয় নি। তাকে আমি আপনার চাইতে ভাল জানি,তার স্বভাব অত্যন্ত চাপা, কিন্তু আমাকে সে কিছু লুকোতে পারে না, তার মনের মধ্যে আজকাল যে সংগ্রাম চলছে, তার ফলে তার মাথার ঠিক্ নেই।

রতিকান্ত কহিল "না অমিতা, আমার অপমান বা অগ্রাহ্য করার কথা আমি তো বলছি না, তাতে কিছু এসে যায় না, আমিও মন প্রাণের সহিত ললিতার সাংসারিক জীবনের সুখ শান্তি কামনা করছি, কিন্তু ঐ যে তুমি সে সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা কোরে বোসে আছ, ওর একটা সংশোধন চাই?"

অমিতা কহিল, আবার আপনি আমার অবিশ্বাস কোরছেন রতিবাবু? ললিতা আপনাকে এখনও ভোলে নি, বাইরের আড়ম্বর সে যতই করুক, মন

তার সেই পরিমাণে ফাঁকা। আপনাকে সে-যে কোনো দিন ভুলতে পারবে, আমার তা মনে হয় না।"

এ সংবাদ সত্য হউক, অসত্য হউক, রতিকান্তর বুকের মধ্যে দুর দুর করিয়া উঠিল কেন? ওগো, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, প্রভৃতি বড় বড় কথা গুলার যতই চমকপ্রদ বিশেষণ থাকুক না কেন—উহার আদর্শ যতই মহান গৌরবময় হউক, এই মানুষের হৃদয় বলিয়া জিনিষটা যিনি গড়িয়াছেন, ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্মও কি তিনি গড়েন নাই? যাহাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, যাহার সঙ্গ-সুখে এ জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে চাই, তাহার প্রতি ভালবাসা, যদি অনুচিত, এমন কথা জানিতে পারি, তাহা স্বত্বেও সে আমায় ভালবাসে এ সংবাদে হৃদয়মধ্যে পুলক-কম্পন অনুভব করা কি অসম্ভব? রতিকান্ত কায় মনে ললিতার দাবী ত্যাগ করিলেও যেমন সে শুনিল "ললিতার হৃদয়ে আজও তার স্থান অটুট আছে, তার অন্তরের ছিন্ন বীণার তারে যেন কার কোমল অঙ্গুলীর তাড়না পড়িল,আর সেই মৃদু ঝঙ্কারে তার সমস্ত মন প্রাণ চকিতে শিহরিয়া উঠিল।

রতিকান্তকে নীরব দেখিয়া অমিতা কহিল "কি ভাবছেন রতিবাবু, ভাবনার সমুদ্রে থেই না হারিয়ে দিক নির্ণয় করুন, জীবন তরীকে কিনারার দিকে ভিড়িয়ে নিয়ে চলুন, সুচতুর নাবিকের এই তো কাজ।" রতিকান্ত সে পরিহাসের উত্তর না দিয়া কহিল "আমি ভাবছি, ললিতার গার্হস্থ্য জীবন সুখের হবে কি না, আর নবেন্দু বেচারার জন্যেও আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।"

ঈষৎ হাসিয়া অমিতা কহিল, "বিয়ে হোলে কর্ত্তব্যের চাপে সব তখন ঠিক হোয়ে যাবে, ললিতাও তখন নিজেকে সাম্‌লে নিতে পার্‌বে?"

সবিস্ময়ে রতিকান্ত কহিল "তোমরা স্ত্রী জাতি কি যাদু মন্ত্র জান? নিজের স্বভাব দু' দিন পরে ইচ্ছে মত বদ্‌লে নিতে পার? কিম্বা ছলনার আবরণে নিজেদের অবস্থানুযায়ী স্বভাবের পরিচয় দাও।

অমিতা এ শ্লেষবাক্যে বিচলিত হইল না, ধীরকণ্ঠে কহিল "তা পারতে হয় বৈকি? যখন পুঁথি, বিধি, বিধান, শাস্ত্র, মন্ত্র সব পুরুষের হাতে, তখন মেয়েদের ইচ্ছে কোরে 'ডাইনী' 'মায়াবিনী' সবই সাজ্‌তে হয়, রীতিমত সাজ সজ্জা কোরে অভিনয় পর্য্যন্ত করতে হয়, নইলে রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারগুলা কেবল ট্র্যাজিডিই হোতো—সংসারে তাতে অশান্তিরও সীমা থাকৃত না।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, অমিতাই শেষে সে নীরবতাকে ভাঙ্গিয়া কহিল,

ভগবান আপনাদের অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন, শরীরে মনে কোথাও কৃপণতা করেন নি, কিন্তু আর একটু দিলেই ভাল হোতো, মেয়েদের বাহ্যিক ধরণ ধারণ, চলা ফেরা যেমন আপনাদের ইঙ্গিতের বশ হোয়ে গেছে, হৃদয় জিনিসটাও যদি সেই রকম ইঙ্গিতের বশ হোতে পারতো, তা হোলে আর কোনো গণ্ডগোলের সৃষ্টি হোতে পারতো না—কি বলেন রতিবাবু ?

রতিকান্ত দুই বাহু বক্ষের উপর নিবদ্ধ করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিল "কিন্তু, সত্যিই তোমরা মায়াবিণী, নিজের মনের কথা খুলে বলতে তোমাদের এতটুকু সাহস নেই, প্রবঞ্চনা করতে তোমাদের এতটুকু বাধে না ? ধিক এ নারী জাতিকে।"

অমিতা হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল, "থামুন রতিবাবু, অত জোরে মেয়েদের ধিকার দেবেন না, তারা যদি অতোখানি moral courage দেখাতে যায়, তা হোলে পৃথিবী ওলোট পালট না হোক্, সমাজের সনাতন বিধি ব্যবস্থা গুলো এখুনি ডিগবাজী খেতে আরম্ভ করবে, তার চাইতে তাদের অন্তরের তপ্ত শ্বাসে, ভেতরটা যতখানি জ্বলে পুড়ে যাক্, বাহিরটা যেন সেই ছলনার আবরণে বেশ শান্তভাব ধারণ কোরে পৃথিবীর কাছে—সমাজের কাছে, আদর্শ রমণীর বাহবা নিতে পারে, তা হোলেই তাদের নারী জন্ম সার্থক হোয়ে উঠবে।"

রতিকান্ত আবার বুকের উপর দুই বাহু নিবদ্ধ করিয়া, নতমুখে ধীরে ধীরে সেই বালুর চরে পায়চারী করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ সে থামিয়া অমিতার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা অমিতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সত্য উত্তর দিও, ললিতার caseএ তুমি যদি পড়্‌তে কি করতে ?"

মৃদু হাসিয়া অমিতা উত্তর দিল, আপনার কি মনে হয় ?

রতিকান্ত কহিল, আমার মনে হয়, তোমায় সবাই প্রগল্‌ভাই বলুক, চঞ্চল স্বভাব বোলে অগ্রাহ্য করুক, কিন্তু তোমার মধ্যে সাহস আছে, তুমি কখনো এমন কোরে আত্মপ্রবঞ্চনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও প্রতারণা করতে না, সত্যকে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ কোর্‌তে তোমার কোথাও বাধ্‌তো না, তার ফল যাই হোক্।

অমিতা কহিল, আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু তবু সেটা জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি না, যেহেতু কর্ম্মক্ষেত্রে কি করতে পারতুম, তা সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই জানেন। লোক নিন্দার রক্তাক্ত চক্ষুকে কতখানি অগ্রাহ্য করতে

পারতুম, তা সে অবস্থায় বাইরে দাঁড়িয়ে বলা বড় কঠিন,—কেন না, আমাদের স্বভাব কত কালকার সংস্কার আর অভ্যাসে বিদখুটে রকমের এক ঘেঁয়ে হোয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অমিতা আবার কহিল, কিন্তু রতিবাবু, একটা কথা আপনাকে না বোলে থাকতে পারছি না, আপনার একবার উচিৎ ছিল কাকামণির কাছে বিবাহের কথাটা পাড়া, কেন না আপনার সঙ্গে তো কথা একরকম পাকাপাকি হোয়ে ছিল।

রতিকান্ত বিস্মিতভাবে কহিল, তুমি একথা কেমন কোরে বলতে পারলে অমিতা, তুমি কি তোমার কাকাবাবুর মন জান না? সব জেনে শুনে হাস্যাস্পদ হবার জন্যে কেমন কোরে আমি মহেশ বাবুর কাছে এ প্রস্তাব করতে পারি? তা ছাড়া তুমি জান, তিনি ললিতার বিবাহে মোটা রকমের যে যৌতুকটা দিতে চেয়েছেন ওটাও আমার পক্ষে একটা মস্ত বাধা, উনি ভাববেন এরই লোভে ছোক্‌রা সব জেনে শুনেও এতটা হীনতা স্বীকার কোরে এ প্রস্তাব করতে এসেছে।

অমিতার কিছুই অবিদিত নাই। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও রতিকান্তকে কন্যা দান করা মহেশবাবুর পক্ষে যে অসম্ভব তাহা সে বেশ বুঝিয়াছিল, তবু তাহার মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িল, সম্ভব অসম্ভবের দিক দিয়া কোন কথা আমাদের মন নিজের মধ্যে তোলাপাড়া করে না, আপনার খেয়ালে সে আপনি মশগুল! আর বাহিরে উহার আভাস প্রকাশ করা অবিবেচকের কাজ হইলেও কোন্ ফাঁকে যে উহার এক আধটু বাহির হইয়া পড়ে সেইটাই সব চাইতে মুস্কিলের কথা।

একবিংশ

সকালের আহ্নিক সারিয়া হরিনামের মালাটি কয়েকবার ঘুরাইয়া এবং মাথায় ঠেকাইয়া প্রণামান্তে যথাস্থানে মালা তুলিয়া রাখিয়া জ্যাঠাইমা কহিলেন "কি করছিস শুচি? কুটনো টা থাকোকে দিস্ নি না কি? অমিতা কি চা করছে না?

শুচিতা কহিল, না, তার আজ এই মাত্র ঘুম ভাঙলো, আমায় বোল্লে, চা টা করে দাও গে দিদি, তার বুঝি আজ মন ভাল নেই মা, রতি বাবুরা চলে যাবেন, তার জন্যে মন কেমন করছে।

জ্যাঠাই মার চক্ষে যেন সন্দেহের ছায়া ঘনাইয়া আসিল, শুচিতাকে

ডাকিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, হ্যাঁরে শুচি, বলি অমিতার সঙ্গে রতির বিয়ে হোলে বেশ হোতো না কি ?

শুচিতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "সে কি মা ? কাকাবাবু তা দেবেন কেন ? আর তা ছাড়া রতিবাবুর সঙ্গে অমিতার অন্য রকম ভাব, ওদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ আসতেই পারে না।

জ্যাঠাই মা রাগিয়া কহিলেন, তোদের সব ভাব অভাব অতো বুঝি না, ধন্যি কলিকালের মেয়েগুলো, আর এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে হবার নাম নেই, সতেরো আঠারো বছরের ধিঙ্গী হয়ে পছন্দ অপছন্দের হরেক রকম বুলি ফুটবে না তো কি ?

শুচিতা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, রাগ করছো কেন মা ? রতি বাবু ললিতাকেই বরাবর ভালবাস্‌তেন।

জ্যাঠাই মা বাধা দিয়া কহিলেন, বাস্‌তো তো কি হয়েছে ? এক সময় রতির ওপর ললিতার মন পড়েছিল, তা বলে এখন কি আর নবেন্দুকে বিয়ে করবে না, না ভালবাসবে না ? সেও পুরুষব্যাটাছেলে কি আইবুড়ো থাক্‌বে ? তোর কাকাবাবুর সবেতেই বাড়াবাড়ি ! রতির কাছে কি নবেন্দু ? ছেলেতো নয় হীরের টুক্‌রো—অমন জামাই কি আমার ভাগ্যে আছে ?

শুচিতা মাতাকে আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, চায়ের জল লইয়া চলিয়া গেল, জ্যাঠাই মা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বুদ্ধি করিয়া রতিকে কি কমলাকে একবার এ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন না কেন, অমিতা ললিতার চাইতে পাঁচ মাসের ছোট বই তো নয়, চেহারায় বরং তাহাকেই বড় দেখায়। হউক অমিতা শ্যামবর্ণ, তাহার মুখের গঠন ও চুলের বাহারে সে শ্যামবর্ণকে এমন একটি সুন্দর শ্রী দান করিয়াছে, যাহা অনন্য দুর্লভ।

শুচিতা টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখিতেছে, নবেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, অমিতার আজ বদ্‌লী হোয়েছে না কি ?

অমিতা তখন আলনায় কাকামণির কাপড়গুলি গুছাইয়া রাখিতেছিল। শুচিতা বক্রদৃষ্টে অমিতার দিকে চাহিয়া কহিল, ওর আজ মন ভাল নেই।

নবেন্দু যে পর্য্যন্ত ইহাদের সংস্রবে আসিয়াছে, অমিতার সহিত গল্পে, গানে, তাসে একরকম বেশ আমোদ অনুভব করিত, শুচিতাও ইহাতে যোগদিত,ললিতা অবশ্য একটু আড়ালেই থাকিত, কিন্তু রতিকান্তর আকস্মিক আবির্ভাব হইবার পর অমিতার যেন আর নাগাল পাওয়া যাইত না, নবেন্দু

অমিতার এ পক্ষপাতীত্বে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে এক আধটু পরিহাস করিতেও ছাড়িত না,আজ শুচিতার মুখের কথাটি লুফিয়া লইয়া নবেন্দু কহিল, কি অমিতা, তোমার আবার মনের কি ব্যাধি হোলো? ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না কি?

অমিতা বিরক্ত ভাবে কহিল, আমার আর কি চিকিৎসা করবেন, মনে রাখবেন Physician heal thy self.

নবেন্দু খোঁচা খাইয়া বলিয়া বসিল, "না হয় রতিবাবুকেই খবর দিই।

অমিতা রাগিয়া কহিল, নবেন্দু বাবু, এ রকম পরিহাস গুলো আমাকে কোরবেন না, আরও দু একদিন আপনি করেছেন, আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু আজ আপনি জেনে রাখুন, রতিবাবু আপনাদের পরিহাসের যোগ্য নন, তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে, আর আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাও করে থাকি, আর সে শ্রদ্ধা, প্রণয়ের নামান্তর নয় তাও শুনে রাখুন।"

নবেন্দুকে রতিকান্তর অপেক্ষা এতোখানি হেয় জ্ঞান করায় নবেন্দুরও রাগ হইল, সে কহিল, তাই তোমার শ্রদ্ধার পাত্র দু' বছর জেল খেটে কপালে এমন দাগ নিয়ে এসেছে যে, ভদ্রলোকেরা তার ত্রিসীমানায় আসিতে সঙ্কুচিত হয়।"

এ অপ্রিয় প্রসঙ্গে শুচিতাও চঞ্চল হইয়া উঠিল, অমিতার স্বভাবও তাহার জানা আছে, সে তাড়াতাড়ি কহিল, কি ছেলেমানষী করিস্ অমিতা, একটু ঠাট্টাও যে সইতে পারিস্ না।

অমিতা কহিল, ঠাট্টার একটা রকমারী আছে, তা ছাড়া, রতিবাবুর চরিত্রের দোষ, দুর্ব্বলতার আলোচনা যারা কর্‌তে যায়, তারা আগে যেন তাঁর সদ্‌গুণের অধিকারী হোতে চেষ্টা করে।

মহেশ বাবু ঘরে ঢুকিয়া অমিতার উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই কহিলেন, খুকী তুই এখনো গরম জামা গায়ে দিস্ নি? তোদের আমি আর পারি না, ঐ একজন ভুগছে। নিজের দোষে তোরা ভুগতে ছাড়বি না আর সবাইকেও ভোগাতে থাক্‌বি। রাগের সময়ও অমিতার হাসি আসিল, যেহেতু ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হওয়া তাহার কপালে যে কোনো দিন ঘটিয়াছে এমনতো মনে হয় না। তা ছাড়া আর একটা কথা তার মনে হইল কাকাবাবু মেয়েদের শরীরের দিকে সর্ব্বদা যেমন প্রখর দৃষ্টি রাখেন মনের দিকে যদি তার এতটুকুও রাখতে পারিতেন।

দ্বাবিংশ

নব-বসন্ত সমাগমে, প্রকৃতির মধ্যে এক বিরাট সাজ-সজ্জার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। বসন্তের আগমন বার্ত্তা সবুজ পত্রে লিখিয়া কে যেন গাছে গাছে লাগাইয়া দিয়াছে। শীতক্লিষ্ট নর নারীর মুখে আবার নবশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। জড় ও চেতন সবারই মধ্যে যেন একটা জীবনের চাঞ্চল্য—তাজা প্রাণের আভাস ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। ওগো চির যৌবনা, চির আনন্দময়ী প্রকৃতি, ওগো অনন্ত সৌন্দর্য্যের খনি, বৈচিত্র রূপিণী ধরনী, তোমার এ মহাসম্পদে মানব সন্তানকে বঞ্চিত করিয়াছ কেন দেবী? আমরা যা একবার হারাই, আর তাহা পাইনা কেন? আমাদের জীবনে বসন্তের জাগরণ একবার বই দ্বিতীয়বার থাকে না কেন? ইহা তোমার আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ? ওগো মূক প্রকৃতি! একবার মুখর হও, দেবী, একবার বলিয়া দাও, তোমার তর্জ্জনী হেলনে এই যে নিখিল বিশ্বে বসন্তের আবির্ভাবে যে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়া গিয়াছে, এ সৌন্দর্য্য মানুষের দেহ, মনে একবার বই দুইবার ফোটেনা কেন?

পদ্মার নির্ম্মল, ঊর্ম্মি বহুল সলিল রাশির প্রতি চাহিয়া রতিকান্ত বুঝি ঐ কথা গুলিই ভাবিতেছিল। মাঝিরা দাঁড় টানিয়া সারি গাহিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে, সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, কত লোকে বায়ু সেবনের জন্য নদী তীরে এদিক ওদিকে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, মেয়েরা জলপূর্ণ কলসী কক্ষে গৃহে ফিরিতেছে। অদূরে একটা মাঠে ক্রীড়ারত বালক ও যুবকগণের উচ্চ কল-হাস্য ধ্বনি নদীর বুকে আনন্দের প্রতিধ্বনি তুলিতেছে, রতিকান্তের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে কোনও কিছুরই দাগ বসিতেছিল না, সে যেন সংসারের সঙ্গে সব দেনা পাওনা শোধ করিয়াছে, তাহার এই পূর্ণ যৌবনে ইহা কি সম্ভব —না স্বাভাবিক? হায় হায়, ঘটনা চক্রে সবই যে সম্ভব হইয়া উঠে।

দেড়মাস হইল,রতিকান্ত কমলাদের দেশে পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, দিন কতক ললিতার চিন্তায় তাহার মন অপ্রসন্ন থাকিলেও, শীঘ্রই সে প্রকৃতিস্থ হইয়া, নানারকম কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিল,কিন্তু প্রতিপদে যেন তার বাধিতে লাগিল, অথচ প্রথম প্রথম সে কোনো কিছু স্পষ্ট কারণ বুঝিতে পারিল না। কি ভাগ্য, যে মা আর এ সময়ে বিবাহের জন্য জিদ্ করিলেন না, কেননা এখন বিবাহ করা তার পক্ষে অসম্ভব, অথচ সে জানিত,

মা তাহার বিবাহের জন্য কি রকম ব্যস্ত হইয়া আছেন, কিন্তু এখন তাঁর সে ব্যস্ততার অভাব দেখিয়া সে মনে মনে স্বস্তি বোধ করিল। কিন্তু একদিন রতিকান্ত নিজের অনিচ্ছা স্বত্বেও হরদাদা মাতার সহিত যে কথা গুলি কহিতে ছিলেন তাহা শুনিতে পাইল তখন তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। হরদাদা বলিতে-ছিলেন, ব্যস্ত হোচ্ছ কেন বউ মা রতিরও তো এখন বিয়ে কর্‌তে মন নেই, আর কিছু দিন যাক্ তখন আপনা হোতেই সব গোল মিটে যাবে, তখন আবার কত মেয়ের বাপ্ আপনি সেধে এসে তোমার দুয়োরে ধন্না দেবে।

চিন্তামণি কহিল, তা বটে বাবা, কিন্তু আমার মন যে মানে না। রতির মনটা যেন শুকিয়ে থাকে, তার মন সর্ব্বদা উদাস। বিয়ে দিলে ছেলের মন ভাল হোতে পারে, আমার সোণার চাঁদ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে কত লোকে মাথা মুড় খুঁড়তো, আর এখন কি না ঘটকি পাঠাইলে বলে "দণ্ডবৎ ও ছেলের নামে, ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে শেষে কি একটা বিপদ ডেকে ঘরে তুল্‌ব"। আমার হীরের টুক্‌রো—চারটে পাস করা ছেলে, শেষে এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের জিনিষ হোয়ে দাঁড়ালো, সবই আমার কপালের গেরো।"

চিন্তামণি যে কতখানি আঘাত পাইয়াছেন, তাহা রতিকান্ত আর শুনিবার জন্য সেখানে দাঁড়ায় নাই, নিজের গৃহে আসিয়া শ্রান্ত ভাবে শুইয়া পড়িয়াছিল। যে উৎসাহ হীনতা ও অবসাদে তাহার চিত্তকে আনন্দহীন করিয়া ফেলিতেছিল,আজকাল সে গুলিকে দূর করিতে সে অনেক চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ আবার একি শুনিল!

এখন তাহার খুটি নাটি অনেক কথা মনে পড়িল, সে যে সত্যই এখন আর সকলের নিকট সেই সহজ, সরল স্বভাব, অমায়িক, সচ্চরিত্র রতিকান্ত নয়। এক কুয়াশার আবরণে তাহার সে প্রকৃত স্বরূপ ঢাকা পড়িয়াছে, সুতরাং সে এখন সকলেরই নিকট বিভীষিকার বস্তু। অথচ এ বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া স্বপ্রকাশ করিবার চেষ্টা আবার আরও মারাত্মক আরও অধিক সন্দেহ জনক। সেদিন একটু রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিলে,উমাকান্ত তিরস্কার সূচক কণ্ঠে বলিয়াছিলেন "তোমার কি একটু self respect নেই, এতো রাত অবধি সেখানে তাদের বাড়ী বসে তাস খেলার কি দরকার ছিল?"

আর একদিন হরদাদা রতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথা যাচ্ছ রতি? রতিকান্ত উত্তর দিল, ছেলেদের ফুটবল ম্যাচে আজ ফাইন্যাল হবে, কাপ্তেনের পায়ে ফোড়া হয়েছে, আমি দেখি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।

হরদাদা কহিলেন "না, তোমার সেখানে গিয়ে দরকার নেই, আমার একটি রুগী আছে, তুমিও তাকে দেখবে চল, হরদাদা হাত ধরিয়া টানিয়া রতিকে সেদিন লইয়া গিয়াছিলেন, অথচ ইতিপূর্ব্বে তাঁর কোনও রোগীকে তিনি রতিকান্তকে দেখাইবার আবশ্যক বোধ করেন নাই।

রতিকান্ত এতদিন এ সকল বিধি নিষেধের অর্থ তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করে নাই, আজ সকলেরই অর্থ তাহার নিকটে সহজে পরিষ্কার হইয়া গেল। সেদিন যখন সে এ সকল বাঁধাবাঁধির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পিতার নিকট পুনরায় দিন কতক বাহিরে বেড়াইতে যাইবার অনুমতি চাহিল, তিনি রুক্ষ কণ্ঠে কহিলেন, এই তো সেদিন বেড়িয়ে এলে, এখন কিছু-দিন ঘরেই থেকে কাজ কর্ম্ম দেখা শোনা কর, সেবারে তুমি বেড়াতে গেলে আমার মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল।

তাহা হইলে রতিকান্ত এখন সকলেরই একটা বিপদ ও অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে? যে রতিকান্ত পারৎপক্ষে কখনও কাহারও পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় নাই, আজ ঘটনাচক্রে সে কিনা সকলেরই সংসার যাত্রার পথে যথা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল, হা নিষ্ঠুর অদৃষ্ট!

যুবক ও ছাত্রের দল যে রতিকান্তকে খেলিবার গ্রাউণ্ডে পাইলে তাহারদের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা থাকিত না—ছাত্রসমিতিতে রতিকান্তকে বক্তা পাইলে সভ্যগণের উৎসাহ দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিত, আজ যদি ঘটনাক্রমেও সে সেই সকল স্থলে তাহাতে গিয়া পড়ে, তাহাতে বিপদাসঙ্কার ছায়া, সকলের ললাটে যেন স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠে। সাপে খাওয়া ফলের মতো সে আজ যেন বিশ্বের পরিত্যজ। এ অবজ্ঞা ও তাচ্ছল্যের ভারে তার জীবন যে বোঝা হইয়া উঠিল, এ গুরুভার বহন করিয়া এ দুর্গম সংসারপথে চলবার তার সামর্থ্য কই? কি আছে তার? কিসের বলে সে যুঝিবে? তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া বিশ্বাস করে, এমন একখানি নির্ভরশীল হৃদয় যদি আজ তাহার কোথাও থাকিত। চকিতে ললিতার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি তাহার মনে পড়িল, কিন্তু হায়, সেও দুরাশা, সেও তাহাকে আর বিশ্বাস ও প্রীতির চক্ষে দেখে না। স্নেহময়ী জননী তাহার জন্য নিতান্ত অশান্তিতেই কালযাপন করিতেছেন, পিতা, ভ্রাতা কেহই আজকাল সুখী নহেন, হায় হায় সে এমন হতভাগ্য, এমন সুখের আনন্দোজ্জ্বল সংসারে সে একেবারে এতখানি কালী ঢালিয়া দিল। ইহার কি কোনো প্রতীকার নাই, কোনো প্রায়শ্চিত্ত নাই।

পশ্চিম গগণ হইতে ধীর পদে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, শঙ্খ ও কাংস্য ঘণ্টাধ্বনিতে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল, নদীর বক্ষে সে প্রতিধ্বনি ও কম্পন তুলিল, আকাশে একে একে তারার দীপ জলিয়া উঠিতে লাগিল, রতিকান্ত তখনও উদাস হৃদয়ে, শূন্য পানে চাহিয়া, প্রাণের মধ্যে কি এক অতলস্পর্শী শূন্যতা অনুভব করিয়া মোহাবিষ্টের ন্যায় স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। (ক্রমশ) শ্রীসরসীবালা বসু।

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

অকাল বার্দ্ধক্য নিবারণ।—মানুষকে বৃদ্ধ হইতে হইবে কিন্তু অকালে বার্দ্ধক্যকে উপস্থিত হইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। রোগের ন্যায় অকাল বার্দ্ধক্যের বিপক্ষেও আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে শরীরের সকল যন্ত্রকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা এবং আহার ও সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে মিতাচারী হওয়াই উত্তম উপায়। শরীরের সমস্ত যন্ত্রকে সুস্থ রাখিতে এবং তাহাদের ক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে, সর্ব্বদা নির্দ্দোষ রক্ত সরবরাহ করিতে হইবে। হৃদয় ও রক্তাধার সমূহ দ্বারা এই গুলিকে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম রাখিতে হইবে। যাহাদের নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহারা তাহাতেই ব্যায়ামের সুফল পাইবেন কিন্তু যাঁহারা পরিশ্রম করেন না তাঁহাদের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ভ্রমণই তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য উপায়। ভ্রমণ দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াবৃদ্ধি পায়, রক্তাধার সমূহে (Bloo-vessels) অধিক রক্ত চালিত হয়, ফলে রক্তাধার সমূহ অধিকতর ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া বিভিন্ন যন্ত্র ও তন্তু সমূহে সবলে রক্ত প্রেরণ করে এবং তাহাদিগকে সুপুষ্ট করে। শ্বাস অধিক গভীর হয় এবং অধিকতর অক্সিজেন গৃহীত ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস পরিত্যক্ত হইয়া সমস্ত দেহ যন্ত্রের উন্নতি সাধন করে। ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যায়ামের আর একটি সুফল এই যে, তদ্বারা পেশী সমূহের পুষ্টিরও উন্নতি ঘটে, ফলে বলহানী এবং দেহের তাপহানির সম্ভাবনাও রোধ হয়। ভ্রমণের পরিবর্ত্তে অশ্বারোহণ, নৌকাচালন, জিমনাষ্টিক প্রভৃতি অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামও চলিতে পারে।

প্রত্যহ দশ পনের মিনিট ফুসফুসের ব্যায়াম করিলে ভ্রমণের সুফল আরও

বর্দ্ধিত করা যায়। এই ব্যায়ামের একটি সহজ উপায় লিখিত হইল। সোজাভাবে দাঁড়াইয়া মুখ বন্ধ রাখিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। ১৫ সেকেণ্ড হইতে ৬০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্বাস ধরিয়া রাখিয়া প্রশ্বাসে যতটা পারা যায় ততটা বায়ু দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। পরে যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস গ্রহণ একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে। এই সময়ে উদরের পেশী একেবারে সঙ্কুচিত করিয়া ভিতরস্থ যন্ত্রাদির উপর চাপিয়া দিতে হইবে। নিশ্বাস গ্রহণের সময় হস্তদ্বয় তুলিয়া রাখিতে এবং প্রশ্বাস ত্যাগের সময় সমস্ত শরীর নত করিতে হইবে। শরীরের পোষণ ঠিক ভাবে হইতে থাকিলে এই ব্যায়ামে হৃদযন্ত্র রক্তাধার সমূহ এবং ফুসফুসের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে এবং অকালক্ষয় নিবারিত হইবে। (স্বাস্থ্য সমাচার)

অবসর প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব
ভাইস চ্যান্সেলর

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম—১৮৪৪—২৭এ জানুয়ারী।

মৃত্যু—১৯১৮—২রা ডিসেম্বর।

২রা ডিসেম্বর সোমবার রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিটের সময়ে কলিকাতা বাগবাজারে স্বীয় ভবনে সর্ব্বজনপূজ্য; সর্ব্বজনপ্রিয়; শিশুস্বভাব নির্ম্মল চরিত্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার মত বিদ্বান, ধীমান্, লোক বঙ্গদেশে দুর্লভ নহে, কিন্তু তাঁহার মত চরিত্রবান্ লোক সর্ব্বদেশে, সকল সমাজে দুর্লভ। নিরহঙ্কার অমায়িক স্যার গুরুদাসকে বালবৃদ্ধ নরনারী সকলে ভক্তি করেন। লোকহিতকর অসংখ্য অনুষ্ঠানে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। শিক্ষাপ্রদ নির্দ্দোষ অতি ক্ষুদ্র সভায় বালকদের দ্বারা আহূত হইলেও স্যার গুরুদাস তথায় গমন করিতেন। বয়সে তিনি বিদ্যালয়ের বালকদিগের পিতামহ হইলেও সরলতায় ও বালকোচিত উৎসাহে যে কোন উৎসাহী বালকও তাহার কাছে হার মানিত। অনন্য সুলভ ধর্ম্মনিষ্ঠা, সরলতা ও বিশুদ্ধচরিত্রের জন্য স্যার গুরুদাস স্বদেশবাসী নরনারীর মনোমন্দিরে ঋষিবৎ পূজা পাইবেন। স্যার গুরুদাসের মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ মন বলিয়া উঠিয়াছে—"আহা, এমন মানুষ

আর হইবে না। সত্য সত্যই বঙ্গজননীর এই সুসন্তান যে আসন শূন্য করিয়া আনন্দলোকে চলিয়া গেলেন এই আসন কে পূর্ণ করিবেন? কবে পূর্ণ হইবে? তাহা বলা কঠিন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদের সহিত আমরাও এই মৃত্যুর বেদনা অনুভব করিতেছি। (সঞ্জীবনী)

পরমায়ু বৃদ্ধি ও নষ্টের উপকরণ—বৃদ্ধির উপকরণ।—(১) সরল বিবেক। (২) মনের সহজ ও সরল অবস্থা এবং রিপু দমন। (৩) সদা সন্তুষ্ট হৃদয়। (৪) নির্ম্মল চরিত্র। (৪) সানন্দতা। (৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। (৭) সৎসঙ্গ। (৮) দৈনিক পরিশ্রমশীলতা। (৯) প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ। (১০) প্রতিদিন নিয়মিত ৮ হইতে ৯ ঘণ্টা সুনিদ্রা। (১১) সাময়িক ফল এবং শাক সব্জী ভোজন। (১২) স্বাস্থ্যকর জলবায়ু। (১৩) আশা। (১৪) বিশুদ্ধ আমোদ। (১৫) হাস্য। (১৬) আহার বিহারে মিতাচার (১৭) উপযুক্ত বিশ্রাম। (১৮) বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। (১৯) সুচারুরূপে আহার্য্য চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া। (২০) সর্ব্ববিষয়ে পরিমিতাচার। (২১) পুষ্টিকর সুপথ্য। (২২) আলোক বায়ু সঞ্চালিত শয়নকক্ষ। (২৩) যথাযোগ্য আহার। (২৪) সর্ব্বাবস্থায় মনের প্রশান্ততা রক্ষা।

নষ্টের উপকরণ।—(১) ভেঁজাল খাদ্য। (২) বিলাসিতা ও ব্যভিচার। (৩) ক্রোধ। (৪) সর্ব্বদা কুটিল চিন্তা। (৫) বদমেজাজ। (৬) বাল্য বিবাহ ও অধিক বয়স্কা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ। (৭) সর্ব্ববিষয়ে অতি ব্যস্ত বা অতি ব্যগ্রতা (৮) অতিশয় আমোদ প্রিয়তা। (৯) গুরু পরিশ্রম। (১০) বিষাদ। (১১) ঘৃণা। (১২) হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা। (১৩) পরের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া কাতরা। (১৪) আলস্য এবং শ্রমকাতরা। (১৫) অমিতাচার। (১৬) মাদকদ্রব্য সেবন। (১৭) লাম্পট্য। (নিদ্রাভাব বা রাত্রি জাগরণ। (১৯) অসময়ে এবং অধিক রাত্রে আহার। (২০) শারীরিক এবং মানসিক গুরু পরিশ্রম। (২১) মনের অশান্তি। (২২) শোক। (২৩) গুরু আহার (২৪) স্বল্পাহার। (২৫) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব। (২৬) অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু। (২৭) অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে বাস। (২৮) অধিক বাচালতা। (২৯) অবরুদ্ধ অন্ধকার শয়ন গৃহ। (৩০) অতিরিক্ত ধনাকাঙ্ক্ষা। (আয়ুর্ব্বেদ)

যমুনা নদী সংস্কার

JABOONA ANTI-MALARIAL SCHEME.

বহু পূর্ব্বে যমুনানদী সংস্কারকল্পে দুই একবার কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু সে সকল চেষ্টা তখন ফলপ্রসূ হয় নাই। পরে বিগত ইংরাজী ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে এই নদীর উভয় তীরস্থ গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া তদানিন্তন মহামান্য গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের নিকট সেনিটেরি ড্রেণেজ এ্যাক্ট অনুসারে নদী সংস্কারের প্রার্থনা জানাইয়া এক আবেদন পত্র (Memorial) প্রেরণ করেন। এই আইন অনুসারে নদী সংস্কৃত হইলে উপকৃত জনগণ ধার্য্য কর দিতে সম্মত আছেন ইহা জ্ঞাপন করায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্বিষয়ের আলোচনা হয়। কিন্তু ঐ সময়ে য়ুরোপে মহা সমর উপস্থিত হওয়ায় ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারীর উপদেশানুসারে ঐ আলোচনা কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল। পরে যমুনা সংস্কার সমিতির পক্ষ হইতে পুর্ত্ত বিভাগের সেক্রেটারী কাউলি সাহেবকে একখানি পত্র দেওয়া হয়। তদুত্তরে তিনি বলেন, যমুনা সংস্কার এখন গভর্ণমেণ্টের বিচারাধিন রহিয়াছে, শীঘ্রই সরকার এতদ সম্বন্ধে মনোভাব প্রকাশ করিবেন। পরে ইংরাজী ১৯১৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুর তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারি, পুর্ত্তবিভাগের সেক্রেটারি, চিপ ইঞ্জিনিয়ার ও স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া নদী পরিদর্শন করিয়া যান।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই গত ২৯শে জানুয়ারি তারিখে লাটভবনে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয় এক প্রকাশ্য সভায় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন। উক্ত সভায় ২৪ পরগণা, যশোহর ও নদীয়া জেলার বিশিষ্ট জমিদারগণ,জেলা বোর্ড সমূহের ও গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সকলেই আমন্ত্রিত ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। গভর্ণর বাহাদুর বলেন, যমুনা নদীর সংস্কার হইলে ঐ প্রদেশে ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য নিশ্চয়ই হ্রাস হইবে এই আশায় নদী সংস্কার করা হউক।

এই কার্য্যের বিহিত ব্যবস্থার ভার সমগ্র বঙ্গদেশের সেনিটেরি কমিসনার বেণ্টলি সাহেব ও Superintending Engineer এডামস্ উইলিয়াম সাহেবের উপরই ন্যস্ত হয়। তাঁহারা উভয়ে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে প্ল্যান্ ও এষ্টিমেট প্রস্তুত করিয়া গভর্ণমেণ্টে পেশ করেন এবং গভর্ণমেণ্ট ও উহা মঞ্জুর করায় এইবার কার্য্যারম্ভ হইল।

এই নদীর পঙ্কোদ্ধার হইলে নদীর নিকটবর্ত্তী ৩২২½ বর্গ মাইল পরিমিত ভূমির জল নিকাশ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতিও হইবে। ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহক Anopheles মশকের জন্মস্থান ও আবাস ভূমি নষ্ট হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিবে। তাই এই শুভানুষ্ঠানের নাম "যমুনা এ্যাণ্টি ম্যালেরিয়া স্কীম" (Jaboona Anti Malarial Scheme) রাখা হইয়াছে।

যমুনা নদীর গভীরতা বিরোহীর (বিরুই) কাছেই সর্ব্বাপেক্ষা কম। ঐ স্থান হইতে পশ্চিমে কাঁচড়া পাড়ার নিম্নে গঙ্গা পর্য্যন্ত নদী একপ্রকার ভরাট হইয়া গিয়াছে। সে কারণ বিরোহীর পশ্চিমে আর নদী সংস্কারের চেষ্টা হইল না। অতঃপর ঐ পথে নৌকা যোগে গঙ্গায় যাতায়াত করা চলিবে না। সে উপায় করিতে হইলে আরও বিশলক্ষ টাকার প্রয়োজন এবং তাহাতে বিশেষ সুবিধারও সম্ভাবনা নাই। বাণিজ্যের অথবা গমনাগমনের সুবিধার জন্য এই নদী সংস্কার নহে। এ প্রদেশের স্বাস্থ্যোন্নতি করাই এই নদী সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য। "Sauitary Drainage Act" অনুসারেই সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

এই নদীর সংলগ্ন যে সকল খাল বিস্তৃত ও সংস্কৃত করিতে হইবে তাহার পরিমাণ ৬৪ মাইল। ঐ সকল খাল কাটিতে যে জমির প্রয়োজন হইবে সে জমিতে যদি দ্বাদশ বৎসরাধিক কাল আবাদ হইয়া থাকে তবে ল্যাণ্ড "এ্যাকুইজিসন এ্যাক্ট" অনুসারে প্রতি বিঘার মূল্য ৭০৲ টাকা প্রদত্ত হইবে। যমুনা নদীর চর ভূমির মূল্য কিছুই দেওয়া হইবে না।

ইতিপূর্ব্বে "Sanitary Drainage Act" অনুসারেই হাওড়া, মগরাহাট, রাজাপুর প্রভৃতি স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতি করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল স্থানের ব্যয়ের হার অপেক্ষা যমুনা সংস্কারের ব্যয়ের হার অল্প হইবে! যমুনা ২০ মাইল মাত্র সংস্কৃত হইবে; কারণ এই নদীর অবস্থা অনেক স্থানেই ভাল আছে। ইহার প্রতি বিঘায় ১।০ দেড় টাকা খরচ পড়িবে।

গভর্ণমেণ্ট যমুনা সংস্কারের জন্য ১,৫০,০০০৲ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় পড়িবে।

মাটী কাটা	... ...	৭,৩৬,৪৩৭৲ টাকা
সরঞ্জামি ও দ্রব্যাদি খরিদ	...	৮১,০০৮৲ "
জমি খরিদ	... ...	১,১০,২৭০৲ "
	মোট—	৯,২৭,৭১৫৲ টাকা।

গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকা বাদে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীকে ৪২২০৲ টাকা দিতে হইবে। কারণ যমুনা নদী ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর ১·৭৫ বর্গ মাইল বিধৌত করিতেছে। অবশিষ্ট ৭,৭৩,৪৯৫৲ টাকার ভার নিম্নলিখিত জেলা বোর্ডগুলি এই ভাবে গ্রহণ করিবে।

২৪ পরগণা	...	১২৬¼ বর্গ মাইল	...	৩,০৪,৪৫৪৲ টাকা
যশোহর	...	৯২¼ ,,	...	২,২২,৩৬৩৲ ,,
নদীয়া	...	১০২¼ ,,	...	২,৪৬,৫৭৮৲ ,,
		৩২০¾ ,,		৭৭৩,৪৯৫৲ টাকা

এই নদী সংস্কৃত হইলে উহার সংরক্ষণ জন্য বাৎসরিক ৯০০০৲ টাকা খরচ পড়িবে। তাহা হইলে বিশ বৎসরে গড়ে ১,৮০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। তাহাও পড়্তা মত ধরা হইয়াছে।

যমুনা সংস্কৃত হইলে এই প্রদেশের কেবল যে স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে এমত নহে, ঐ সঙ্গে খালবিলের পতিত ও নিমজ্জিত ভূমিগুলি ও উচিৎ হইয়া কৃষিরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইবে। কারণ এই নদীর সঙ্গে সঙ্গে মগরা, বুলি, ভোমরা, হিতে, তালকোলা, আমকোলা, চাঁচড়া, গোপালপুর, রুয়ে, কুঁচলে, রত্নাখালী, চালুন্দে, সলুয়া, গাজনা, পদ্মা ও বৈঁকার খালও সংস্কৃত হইবে। ঐ সকল খালের মুখে গো-শকট চলিতে পারে এরূপ প্রশস্ত পুল নির্ম্মিত হইবে ও কপাট বসিবে। প্রত্যেক কপাট আবশ্যক মত খোলা ও বন্ধ করা যাইবে; সুতরাং যে খালে যখন যে জল রাখার প্রয়োজন হইবে তখন সেই পরিমাণ জল রাখা যাইতে পারিবে। তাহাতে আবাদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

নদীর পঙ্কোদ্ধার হইলেও নৌকা যাতায়াতের জন্য কোন "টোল" বসিবে না; কিন্তু মৎস্য ধরিবার বাঁধ উঠিয়া যাইবে। নদীর বিস্তার অধিকাংশ স্থলেই ১২০ ফুট হইবে। বারোমাস সর্ব্বস্থানে প্রায় ১৪ ফুট জল থাকিবে এবং স্রোতের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২ ১৭ ফুট দাঁড়াইবে। সুতরাং জলে শৈবালাদি জন্মিতে পারিবে না। কাযে কাযেই তখন নদীর জল সুপেয়, স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

পূর্ব্বে গঙ্গা ও ইছামতীর মুখে কপাট বসাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু এক্ষণে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। বাগনার সন্নিকটে যমুনার উপরে একটি বড় পুল হইবে। উহার চারিটি ফুকার (opening) থাকিবে। প্রত্যেক ফুকার বিশ ফুট লম্বা হইবে। এই সেতু নির্ম্মাণ জন্য ১৭,৯৪২৲ টাকা ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে।

যমুনা নদীর সংরক্ষণ ও তত্বাবধারণ জন্য দুইজন ওভারসিয়ার চিরদিনই নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য গভর্ণমেণ্ট ৩,৭০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

এতদিনে আমাদের প্রজারঞ্জক সদাশয় গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুরের কৃপায় এ দেশের একটি বিশেষ অভাব দূর হইল। এই অক্ষয় কীর্ত্তির জন্য ঐ মহাপুরুষের পবিত্র নাম এ দেশবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

যমুনা সংস্কার সমিতির সভাপতি ও সভ্যগণও এ দেশবাসীর বিশেষ ধন্য-বাদার্হ। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও শ্রম সফল হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যিনি এই মহৎ কার্য্যের প্রধান উদ্‌যোগী সেই দেশ হিতৈষী জমিদার রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর আজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

গোবরডাঙ্গা—　　শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র L. M. S.
২১।১২।১৮　　যমুনা সংস্কার সমিতির সেক্রেটারি।

কুশদহ-সমিতি

——:০:——

(প্রাপ্ত)

পূজার বন্ধের সময় দুস্থ কুশদহ-বাসীগণের মধ্যে যথাসাধ্য পরিধেয় বস্ত্র বিতরণ কার্য্য লইয়া সমিতি কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। কার্ত্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় নিম্ন লিখিত বিষয় কয়টীর আলোচনা করা হয়। প্রথমেই শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয়ের জলকষ্ট নিবারণ কল্পে প্রতিশ্রুত ৪০০৲ চারিশত টাকার এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষ আলোচনার পর স্থির করেন যে, উপস্থিত প্রায় ১৫০৲ ব্যয় করিয়া খাঁটুরায় একটি Tube well প্রতিষ্ঠিত করা হউক। পুষ্করিণী কিম্বা ইদারার জন্য ৪০০৲ টাকা যথেষ্ট নহে। যদি সাময়িক চাঁদা বা অন্য কোনও উপায়ে আরও অর্থসংগ্রহ হইতে পারে তথাপি পুষ্করিণী বা ইঁদারার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই উহার জল অপেয় হইয়া যাইবে। অতএব বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরীক্ষা স্বরূপ একটি টিউব ওয়েল খনন করাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মতে সর্ব্বাপেক্ষা সমিচীন বোধ হয়।

এবং খাঁটুরায় উহা স্থাপন করিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল খাঁটুরার অধিবাসীগণই জমি ও অর্থ দিয়া এ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ এবং আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন,সুতরাং পরীক্ষার্থে খাঁটুরায় উহা স্থাপিত করায় কোনও ক্ষতি নাই। গত ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে সাধারণ সভায় এই বিষয় আলোচিত হয়; কিন্তু উপস্থিত অধিকাংশের মতে টিউরওয়েল স্থায়ী হইবে না বলিয়া উহা গৃহীত হইল না। তৎপরে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটি পৃথক কার্য্যালয়, বস্ত্র বিতরণ সম্বন্ধীয় কার্য্যবিবরণী গ্রহণ ও সমিতির সভ্যগণের নিকট নিয়মিত চাঁদা আদায়ের উপায় নির্দ্ধারণ এই কয়েকটি বিষয়ও আলোচনা হয়।

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পুনরায় এক অধিবেশন হয়, এবং তাহাতে ইছাপুর স্কুলের পুনঃ সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল এক প্রস্তুত করেন। তাহার ফলে ইছাপুর স্কুল সম্বন্ধীয় যাবতীয় আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ ও অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবুর উপর ভার অর্পিত হইল।

লক্ষীপুল হইতে মল্লিকপুর পর্য্যন্ত এক রাস্তার জন্য ২৪ পরগণা ডিঃ বোর্ডে ইতিপূর্ব্বে সমিতি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার উত্তরে ২৪পরগণা ডিঃ বোর্ড পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত রাস্তার জন্য যে সকল জমি আবশ্যক হইবে তাহা স্বত্বত্যাগ করিয়া ডিঃ বোর্ডকে দেওয়া সম্ভব হইবে কি না। এই পত্রের উত্তরে ডিঃ বোর্ডকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিত হইয়াছে যে, উল্লিখিত রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য যে জমি আবশ্যক হইবে তাহার একটা সঠিক বিবরণ সমিতির হস্তগত হইলে সেই জমির স্বত্বত্যাগ পূর্ব্বক দান সম্ভব কিনা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে। ইহার উত্তর এখনও হস্তগত হয় নাই।

গত ২১শে পৌষ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে সমিতির বর্ষ শেষ উপস্থিত বিধায় কুশদহর কোন গ্রামে বাৎসরিক অধিবেশনের ব্যবস্থার জন্য একটি সাবকমিটী গঠিত করিবার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব সাধারণ সভায় গৃহীত হয় এবং কয়েক জন উৎসাহী সভ্য লইয়া অধিবেশনের আয়োজনাদির জন্য একটি সাবকমিটি গঠিত হইয়াছে। ইছাপুরের দক্ষিণ সীমায় ডাক্তার বেণীমাধব ঘোষের বাটীর নিকট অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিবেশন দুই দিন ব্যাপী হইবে এবং সকল গ্রামের অধিবাসীগণের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া সভায় আপন আপন গ্রামের পক্ষ

হইতে উপস্থিত থাকিবেন। প্রতিনিধিবর্গকে এবং সমাগত সকলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ যদি তিনি যথা সময় সভায় উপস্থিত হইতে না পারেন তবে তৎপরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন। আগামী ২২শে ২৩শে মাঘ, বুধ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত অধিবেশনের দিন ও সময় স্থির হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আর একটি মাত্র অধিবেশন হইবে এবং তাহাতে সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণী প্রণয়ন এবং বার্ষিক হিসাব পরিদর্শন ও আগামীবর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহকসভা, গঠন, এবং সম্পাদক, সহঃ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

——:o:——

এতদিনে কুশদহ বাসীর একটি গুরুতর অভাব ও আকাঙ্খা পূর্ণ হইল। সকলে শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত ও আশান্বিত হইবেন যে, যমুনা নদীর সংস্কার কার্য্যের সমস্ত ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি খনন কার্য্য যে, শীঘ্রই আরম্ভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে যে সতন্ত্র প্রবন্ধ এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইল তাহা পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। একমাত্র বিধাতার কৃপায় এবং সদাশয় গভর্ণর বাহাদুরের শুভ ইচ্ছায় বহু-কালের অভিলষিত বিষয়টি আজ কার্য্যে পরিণত হইল, তজ্জন্য কুশদহবাসী মাত্রেই বিধাতার করুণায় এবং মানব সহৃদয়তার প্রতি কৃতজ্ঞতা দান করিবেন সন্দেহ নাই। এই কার্য্যে এ পর্য্যন্ত কুশদহবাসী যাঁহারা কিছু চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, আজ তাঁহাদেরই বা কত আনন্দ! এই শুভবার্ত্তা শ্রবণে দেশবাসী যদি সত্যই আনন্দিত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের মনে হয় সে আনন্দ অব্যক্ত রূপে কখনই হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে না। নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যেও

তাহার প্রকাশ দেখা যাইবে। এইবার নদী সংস্কারের পূর্ব্ব হইতেই দেশবাসী জঙ্গল পরিষ্কারে উদ্যোগী হউন। আপন আপন পুরাতন বাগানের মায়া ত্যাগ করিয়া জমি সকল ফাঁকা করুন। এবং সাধ্য সম্ভব অনুসারে ঐ নূতন ক্ষেত্রে ফল মূল উৎপন্ন করিয়া ও কূপ খনন করিয়া দেশের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনুন, ইহাতে নিজেরাও লাভবান হইবেন।

দেশের এই অনুকূল শুভদিন আগমনের প্রাক্‌কালে বিধাতা বুঝি এ দেশকে সত্যই রক্ষা করিবেন বলিয়া আর একটি মঙ্গল-বিধান করিলেন; ঐ বিধানের নাম "কুশদহ-সমিতি।" সকলেই বোধ হয় আজ বৎসরাবধি এই কুশদহ-সমিতির নাম এবং কার্য্য কিছু কিছু শ্রবণ ও দর্শন করিয়া থাকিবেন। আমরাও আশা ও বিশ্বাসের সহিত এই শিশু সমিতির জীবন-গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, গত ১৩২৪ সনের ২৮শে পৌষ কলিকাতা সহরে এই সমিতি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্ষকাল প্রায় সহরেই আবদ্ধ থাকিয়া যেটুকু তাহার মূল সংস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন তাহা আশা প্রদ। তাই আজ কুশদহ-সমিতি সমগ্র কুশদহবাসীর নিকট আত্ম পরিচয় দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

আগামী ২২শে ও ২৩শে মাঘ বুধ, বৃহস্পতিবার সরস্বতী পূজার অবকাশে ইছাপুর গৈপুর সংযোগ স্থলে মণ্ডপে দুই দিবস ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইবে। কুশদহর সীমা প্রায় ২৫০ শত গ্রাম। প্রত্যেক গ্রাম হইতে যাহাতে প্রতিনিধি ও দর্শক অন্যূন দশহাজার আসিয়া সমবেত ভাবে দেশের দুঃখ দৈন্য দূরের জন্য যত্নবান হইতে পারেন উদ্যোগীগণ এইরূপ—চেষ্টা ও আশা করিতেছেন, আমরাও বলি এই শুভ অবকাশে সমগ্র কুশদহ বাসী হৃদয় খুলিয়া একতা বন্ধনে সম্মিলিত হইয়া "জননী জন্মভূমির" নামে একবার জয় ধ্বনি করুন।

গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর এবার নিম্ন লিখিত ভদ্র মহোদয়গণ কমিশনার পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

১নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত বাবু জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
২নং „ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়।
৩নং „ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪নং　„　শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫নং　„　শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ ঘোষ।

৬নং　„　শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন বসু।

গভর্ণমেণ্ট পক্ষে—শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র মিত্র ; শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র বল ও শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ চন্দ্র রক্ষিত।

সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন বাবুই চেয়ারম্যান হইলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু অনেক দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ভাইস্‌চেয়ারম্যানের কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে বাবু কিশোরীমোহন বসু ভাইস্‌চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেন। কিশোরী বাবু গভর্ণমেণ্টের চাকুরিতে পেন্‌সন গ্রহণ করিয়া দেশে আসিয়াছেন। আমরা জানি, তিনি বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি, আশা করি তাঁহার দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে।

কুশদহ সম্পাদকের নিবেদন—ভগবানের প্রেরণায় ১ বৎসর কুশদহ" মাসিক পত্র প্রচার ও পরিচালনা করিয়া আমি তাঁহার বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি। এবং গ্রাহক গ্রাহিকারূপে সমগ্র কুশদহবাসীর মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ভালবাসা প্রীতি লাভ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এ কার্য্যে এ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে কাহারও সাহায্য না পাইলেও তাঁহার নামের শক্তিতেই বাধা বিঘ্নের মধ্যেও এই ব্রত প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যথাসময়ে "কুশদহ-সমিতির" জন্ম হইল। এদিকে আমার শরীর মনের অবস্থান্তর উপস্থিত লক্ষ্য করিয়া সম্প্রতি আমি কুশদহ সমিতিকে জানাইয়াছি যে, আমার ব্যক্তিগত পরিচালিত "কুশদহ"আর আমি আগামী বৈশাখ মাস হইতে পরিচালিত করিব না। এজন্য অবশ্য সমিতির একটি গুরুতর অভাব হইবে। এখন হইতে সমিতি তজ্জন্য কর্ত্তব্য স্থির করুন। আর আমার শ্রদ্ধা ও প্রতিভাজন গ্রাহক গ্রাহিকাগণকেও জানাইতেছি যে, যদি এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারো কোন কর্ত্তব্য মনে হয় তবে সমিতির সহিত পরামর্শ করিবেন, অথবা আমাকেও জানাইতে পারেন। আমার শক্তির অক্ষমতা জন্যই "কুশদহ" নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে না। এজন্যও আমি কাগজ বন্ধ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

আনুষ্ঠানিক দান—খাঁটুরা নিবাসী, আহিরিটোলা প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পালের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কুশদহর সাহায্যার্থে ২৲ টাকা দান প্রদত্ত হইয়াছে। বিধাতা দাতার প্রাণে সদ্ভাব বৃদ্ধি এবং পাত্র পাত্রীর কল্যাণ বিধান করুন।

কুশদহ-পঞ্জী

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(বেড়গুম)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীহর্ষের উনিষপুরুষের অধঃস্তন বিখ্যাত কামদেব পণ্ডিতের সন্তান ১১ জন। এই এগারজনের মধ্যে মধুসুদন আচার্য্যের দুই পুত্র অনন্ত ও সন্তোষ। সন্তোষের ধারায় বিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বংশাবলী। এবং এই সন্তোষের ধারায় কুশদহ বেড়গুম নিবাসী বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অর্থাৎ সন্তোষের পর কাশীশ্বর, কৃষ্ণরাম, মনোহর ও তৎপুত্র গুরুপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদের ৫ পুত্র, রামধন, হরিশ্চন্দ্র, বৈকুণ্ঠনাথ, ৪র্থ নাম অপ্রাপ্ত, কনিষ্ঠ জয়রাম। রামধন ও বৈকুণ্ঠনাথ দুই সহোদর, বেড়গুম গ্রামে মাতামহ দয়ারাম চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে বাস করেন। অপর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঐ রূপ মাতামহাশ্রয়ে বাস করেন।

রামধনের দুই পুত্র, মহেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ, এক কন্যা নিস্তারিনী দেবী।

মহেন্দ্রনাথের পুত্র হুগলি—বাগাটী গ্রামে চট্টোপাধ্যায় বংশে বিবাহ করেন, তৎপরে বালীগ্রামে বাস করেন।

যোগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান। কন্যা নিস্তারিণী দেবীর স্বামী,যশোহর-বাজিৎপুর গ্রামের রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈকুণ্ঠনাথের ৬ পুত্র, চন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ, শরচ্চন্দ্র, আশুতোষ, ক্ষেত্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র। ২ কন্যা কাদম্বিনী ও মাতঙ্গিনী দেবী। চন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শরচ্চন্দ্র অবিবাহিত অবস্থায় বিভিন্ন বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে বেড়গুম গ্রামে বাস করিয়া পৈতৃক বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ইঁহার পত্নী কালীঘাট নিবাসী ৺চন্দ্রশিখর চৌধুরীর কন্যা স্বর্গীয়া ভুবনমোহিনী দেবী। ইঁহার ৩ পুত্র, ৺রাজেন্দ্রনাথ, ৺যতীন্দ্রনাথ, শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও একমাত্র কন্যা চারুশীলা।

রাজেন্দ্রনাথের পত্নী,খুলনা-রতনপুরের শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায়ের কন্যা লীলাবতী দেবী। রাজেন্দ্রনাথ ১৩২৫ সালের গত ভাদ্র মাসে একটি মাত্র কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথের পত্নী শেয়াখালা নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ব্রজবালা দেবী। যতীন্দ্রনাথ ২৫ বৎসর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে স্কটীসচার্চ্চে তৃতীয়বার্ষিকীশ্রেণীতে বি-এ-সি অধ্যয়ণ করিতেছেন, এবং বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পদাতিক (ইউনির্ভাসিটী ইনফ্যান্ট্রি) শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

কন্যা চারুশীলার স্বামী, নদীয়া-মিনেজপুর গ্রামের ৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার ২টী পুত্র, ১টী কন্যা।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী মাটকোমরার ৺বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সরলতা দেবী। ইহার তিন পুত্র, নীলাচল, গিরিজানাথ ও নগেন্দ্রনাথ। দুই কন্যা লীলাবতী ও শীলাবতী। ক্ষেত্রবাবু প্রথমে বেঙ্গলপুলিষে কার্য্য করিয়া পরে নীলগিরি রাজষ্টেটে ১৮ বৎসর পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ড ছিলেন। এক্ষণে কলিকাতা প্রবাসী হইয়া ফার্ণিচারের ব্যবসা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নীলাচলের পত্নী, বাগবাজার নিবাসী বিখ্যাত ৺মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী,শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবী। বর্ত্তমান নীলাচলের ২টি পুত্র ১টী কন্যা। নীলাচল বি-এল পরীক্ষা দিয়া প্রায় ৫ বৎসর পুলিসকোর্টে ওকালতি করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গিরিজানাথের পত্নী,বহরমপুর—খাগড়া নিবাসী জজকার্টের উকীল শ্রীযুক্ত হরিভূষণ বন্দ্যোপ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী তড়িৎবালা দেবী। গিরিজানাথের ২টি কন্যা। ইনি বি-এ-সি পরীক্ষা দিয়া উপস্থিত কলিকাতা করপোরেসনে এ্যানালিসিশ বিভাগের ইনেস্পেক্টর।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথের পত্নী ভবানীপুর নিবাসী (বঙ্গবাসী কলেজের

প্রফেসর) শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দেবী। নগেন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে হাওড়া জেনারল হাসপাতালে হাউস ফিজিসিয়ান হইয়াছেন। ইনি "কুশদহ সমিতির" সম্পাদকের গুরু ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী লীলাবতীর স্বামী কোন্নগর নিবাসী—কলুটোলা প্রবাসী শ্রীযুক্ত বিধুবদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার ৬টি পুত্র, একটী কন্যা।

শ্রীমতী শীলাবতীর স্বামী মজিলপুর নিবাসী—বাদুড়বাগান প্রবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র, কটক-রাবেন্সা কলেজ হইতে এনট্রান্স পাস্ করিয়া পুলিষ সাব ইন্‌স্পেক্টর হইয়া পুরী ছিলেন। ইহার পত্নী, হুগলি গরলগাছা নিবাসী —কটক প্রবাসী ৺দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা নীরোদবরণী দেবী। বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় ৩৬ বৎসর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

বৈকুণ্ঠনাথের প্রথমাকন্যা কাদম্বিনী অল্প বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হন। দ্বিতীয়া মাতঙ্গিনী দেবীর স্বামী ধর্ম্মপুর নিবাসী ৺চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সৈপুর নিবাসী ৺প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। ইহার দুই পুত্র ৺ভূপতিভূষণ ও ৺ ললিতমোহন। ৺ললিতমোহনের পত্নী বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা দুর্গাবতী দেবী। ললিতমোহন, মাতুল ক্ষেত্রনাথের সহিত একত্রে বাস করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার ২টী নাবালক পুত্র—কার্ত্তিক ও গণেশ, ক্ষেত্র বাবুর নিকট থাকিয়া প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতেছে।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইল্‌কিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"তোমার জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব"

দশম বর্ষ | মাঘ, ফাল্গুন, ১৩২৫ | ১০, ১১শ, সংখ্যা

দাসের প্রার্থনা

দয়াল পিতা, এ অধম মলিন জীবনে তোমার অপার কৃপা দেখালে। সকল কালিমা তোমার পূণ্য-সলিলে ধৌত ক'রে দিলে। কৃতার্থ হ'লাম, ধন্য হ'লাম। মানবাত্মার প্রতি তোমার এত যত্ন—এত আদার—এত ভালবাসা ? এ তো আগে জানতাম না। হায়, জগত যে তোমার প্রতি প্রকৃতবিশ্বাস নির্ভরের অভাবেই ভীষণ দুঃখঃ-সাগরে ভাসছে। ঘরে ঘরে কত শোক তাপের আগুণ জলছে। কিন্তু তোমাতে বিশ্বাসের বলে সকল দুঃখ দূরে যায়।

প্রভু! যে আশা জীবিত-কালে করি নাই তাও দেখালে। শ্রম সার্থক হ'লো—ব্রত পূর্ণ হ'লো, ধন্য হ'লাম। যদি দেশবাসীর প্রাণে তোমার আহ্বান-বাণী শুনালে, তবে বাঁধ বিচ্ছিন্ন প্রাণ গুলিকে এক তারে—এক ডোরে। তোমার প্রেমামৃত-সুধা পান করাইয়া মৃত প্রাণগুলিকে সঞ্জীবিত করো। দাসের এই শেষ ভিক্ষা। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

অসবর্ণ বিবাহ

—:০:—

প্রফেসার

শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, লিখিত।

মাননীয় পাটেল সাহেব মহোদয় হিন্দু-অসবর্ণ বিবাহ আইন সঙ্গত করিবার জন্য যে বিল পেশ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলি প্রতিবাদ সভার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রতিবাদকারীদের প্রধান যুক্তি এই যে, অসবর্ণ বিবাহ অশাস্ত্রীয় ও হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তি জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধক। সুতরাং ইহা প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। আমরা দেখিব (১) অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্র সম্মত কি না? (২) ইহা প্রচলিত হইলে হিন্দু সমাজের কোনও অনিষ্ট হইবে কি না? এবং তাহাতে হিন্দুর পারলৌকিক কোন ক্ষতি বা ধর্ম্মলোপ হইবে কি না?

আমরা ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, বিবাহপদ্ধতি কালক্রমে হিন্দুসমাজে তিনবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রাচীন বৈদিক ও মহাভারতের যুগে আর্য্যেরা ভিন্ন জাতীয় নারী বিবাহ করিতেন। এই সময় অসবর্ণ বিবাহ বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। তাহার পর মনু প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র যখন প্রণীত হয় সেই সময় দুই প্রকারের অসবর্ণ বিবাহের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ও কেবল অনুলোম বিবাহ প্রচলিত হয়। তাহার পরবর্ত্তী পৌরাণিককালে হেমাদ্রি প্রভৃতির ধর্ম্ম নিবন্ধ সকল যখন প্রণীত হয় তখন উভয় প্রকার অসবর্ণ বিবাহ উঠিয়া গিয়া সবর্ণ বিবাহের প্রথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণের "দ্বিজানাম সবর্ণাসু কন্যা সুপমমন্তথা" এই বচনে ও হেমাদ্রির উদ্ধৃত আদিত্য পুরাণের "কন্যানাং অসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজন্মতিঃ" এই বচনে অসবর্ণ বিবাহ, মুসলমান আক্রমণের অল্প পূর্ব্বেই হিন্দুসমাজে প্রথম নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা কলিকালের অনুপযোগী বলিয়া সমুদ্রযাত্রা ও কমণ্ডলুধারণাদির সহিত নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দু সমাজের তখন পতনের দশা। যে হিন্দুজাতি সিংহল বিজয় ও যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সে হিন্দুজাতি তখন মরিয়া

গিয়াছে। যে হিন্দুসমাজ হইতে শঙ্করাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছিল, সে হিন্দুসমাজ তখন লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সন্ন্যাস, সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতির ন্যায় কলিতে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ইহা নিতান্তই অমূলক কথা। তাহা না হইলে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ও ইহার প্রচার দৃষ্ট হইত না। শান্তনুর সত্যবতী বিবাহ দ্বাপরে অসবর্ণ বিবাহের প্রমাণ। মহর্ষি বেদব্যাস ও কুরু পাণ্ডবেরা দাস রাজকন্যা সত্যবতী হইতে উৎপন্ন। এ সময় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে ব্যাস ও কুরু পাণ্ডবেরা সমাজে পতিত হইতেন এবং তাঁহারা লোকমান্য ঋষি, বীর বলিয়া সম্মানিত হইতেন না। এবং তাঁহারা যদি পিণ্ডদানের অধিকারী হইয়া থাকেন তবে এখন অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তান কেন অধিকারী হইবে না? চন্দ্রগুপ্তের অনেক পরবর্ত্তীকালে বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্য পুরাণ যখন রচিত হয় তখনই অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুসমাজে বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ঐ দুই পুরাণে কলিযুগে যে ইহার নিষেধ দেখা যায় তাহা ভ্রম এবং হীন, পরাশর প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান বিরুদ্ধ। শ্রুতি স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে পুরাণের প্রমাণ অগ্রাহ্য। ব্যাস সংহিতায় ইহার স্পষ্ট মীমাংসা আছে, যথা,—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে,
তত্রশ্রৌতং প্রমাণং স্যাৎ তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা।

সুতরাং এস্থলে স্মৃতি ও পুরাণে যখন বিরোধ হইতেছে, তখন পুরাণ অগ্রাহ্য। ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা। এস্থলে যদি কেহ বলেন, মনু প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সাধারণভাবে অসবর্ণ বিবাহের বিধি আছে। আদিত্য পুরাণে—উহা কলিতে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের বিরোধ নাই। মনু প্রভৃতির বিধি কলি ভিন্ন অন্য যুগের জন্য বুঝিয়া লইতে হইবে। এরূপ মীমাংসা অসঙ্গত। কারণ, পরাশর বিশেষভাবে কলির জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র করিয়াছেন। তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন তাহা কলির জন্য নহে ইহা কল্পিত ব্যাখ্যা। বিশেষতঃ মৌর্য্যদের রাজত্বের দ্বারা কলিতে অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা প্রমাণিত হইতেছে। ফলতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা হিন্দু সমাজের জীবন্ত ভাবার চিত্র চারুদত্ত নাটকে ও শুদ্রকের মৃচ্ছকটিকে সর্ব্বজন পূজ্য আদর্শ চরিত্র ব্রাহ্মণ চারুদত্ত কখনও বসন্ত সেনাকে বিবাহ করিয়া সমাজে স্থান পাইতেন না। ইহা হইতে আরও বুঝা যায়, শ্রুতির যা

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি নিষেধ দেখিয়া হিন্দুসমাজ চলে—ইহা ভ্রম। হিন্দুসমাজে যখন যেরূপ আচার প্রচলিত হইয়াছে, শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ হইলেও পরবর্ত্তী কালের পুরাণ ও উপপুরাণ রচয়িতার তাহা সমর্থনের জন্য বচন রচনা করিয়াছেন ও নিবন্ধকারেরা সেই সকল আধুনিক লোকাচার সমর্থন করিবার জন্য ঐ সকল বচন শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ নহে ইহা দেখাইবার জন্য দৃষ্ট শ্রুতি স্মৃতির অর্থ সংকোচ ও অদৃষ্ট শ্রুতি কল্পনারূপে কৌশলের আশ্রয় লইয়াছেন। এরূপ কৌশল অবলম্বন না করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের স্পষ্ট অর্থ লইলে অসবর্ণ বিবাহ কলিতে শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়াই প্রমাণিত হয়। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দু সমাজের—ঐহিক না হউক, পারত্রিক হানি হইবে ও হিন্দুধর্ম্মের অনিষ্ট হইবে এই বলিয়া যে ঘোর আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক।

এখন আমরা দেখিব অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দুসমাজে ঐহিক কোন ক্ষতি হইবে কি না?

এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে প্রাচীনকালে কি জন্য অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল ও কেনই বা পরে তাহা রহিত হইয়াছিল এবং এখন তাহা পুনঃ প্রচলিত করিলে সমাজে তাহার ফল কি হইবে?

অতি প্রাচীন বৈদিক কালে আর্য্যেরা যখন এই দেশ জয় করিয়া এখানে বসতি করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের সহিত স্বজাতীয় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প ছিল এবং সেই জন্য তাঁহারা বিজিত অনার্য্য জাতীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা তখন চলিত হইয়াছিল।

কাল ক্রমে এইরূপ বিবাহের দ্বারা আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মিশ্রণে আর্য্য জাতির একেবারে লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইল। তখন আর্য্যদিগের বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশঃ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এইরূপে মনু ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের সময়ে দুই প্রকার অসবর্ণ বিবাহের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ উঠিয়া গেল ও কেবল অনুলোম বিবাহ প্রচলিত রহিল।

কালে এই আংশিক অসবর্ণ বিবাহ হইতেও অনেক শঙ্করজাতি উৎপন্ন হইল। এবং বিশুদ্ধ আর্য্যবর্ণ প্রায় লোপ পাইবার উপক্রম হইল। তখন বর্ণের সংমিশ্রণ একেবারে বন্ধ করিবার জন্য কঠোরতর নিয়ম দ্বারা সর্ব্বপ্রকার

অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশঃ বন্ধ করা হইল। এবং হিন্দুসমাজ পরস্পর বিবাহ ও সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সম্বন্ধশূন্য অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইল। এই অবস্থা মুসলমান আক্রমণের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে পৌরাণিক কালের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুসমাজের অন্তর্গত এই অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতি সমূহ যে স্ব স্ব বিভিন্নতা রক্ষা করিতে এতদিন সমর্থ হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় ও বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এবং তাহাতেই হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলা এতদিন রক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই অসংখ্য বর্ণভেদ রক্ষার একমাত্র কারণ বৃত্তিভেদ উঠিয়া গিয়াছে। ইংরেজাধিকারের প্রভাবে এখন আর একমাত্র ব্রাহ্মণই শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী নহেন। তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পৌরহিত্য ছাড়িয়া পাচকত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। এখন বিবেকানন্দ বা কোন ইংরেজ মহিলা নব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা কর্ত্তা। কায়স্থগণ এখন আর ব্রাহ্মণের ভৃত্য নহেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রভু হইয়াছেন। তেলি আর তৈল ব্যবসায়ী নহেন—তিনি সমাজের নেতা, সম্পাদক ও আইন প্রণেতা। বাগ্দী ও চণ্ডাল এখন আর অস্পৃশ্য নহেন—তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার মাহাত্ম্যে সকল বর্ণের গুরু— ব্রাহ্মণেরও গুরু হইতেছেন। এখন কোন্ স্বাভাবিক ভেদের উপরে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা হিন্দুদিগের বর্ণের বংশগত বিশুদ্ধতাও লোপ পাইয়াছে। এখন সকল বর্ণেই অনার্য্য শোণিত প্রবেশ করিয়াছে। এখনকার একজন সুবর্ণ বণিককে দেখিলে তাঁহার বর্ণ ও আকৃতি আর্য্যজাতির যতদূর সদৃশ্য বোধ হয়, তাঁহার ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আকৃতি ততদূর নহে। বরং তাঁহাকে অনেক স্থলে আকৃতিতে অনার্য্য জাতীয় নিকৃষ্ট বর্ণ হইতে প্রভেদ করা কঠিন। অথচ সমাজে সুবর্ণবণিক হইতে ব্রাহ্মণের আসন উপরে। এরূপ প্রভেদ নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এখনকার বর্ণভেদ বংশগত বা বৃত্তিগত ভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা কেবল কাল্পনিক আর্য্য রক্তাভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন বর্ণভেদের কারণ সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক ভেদ চলিয়া গিয়াছে ও সবর্ণ বিবাহের নিয়ম, কেবল কাল্পনিক বংশভেদ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এরূপ কাল্পনিক ভেদকে আশ্রয় করিয়া কোনও ব্যবস্থাই অধিক দিন থাকিতে পারে না। পূর্ব্বকালের বর্ণভেদের মূল স্বাভাবিক ভেদ সত্ত্বেও যখন অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল ও তাহাতে হিন্দু

সমাজের কোন অনিষ্ট না হইয়া উন্নতি হইয়াছিল তখন এসময়ে যখন বর্ণ-ভেদের মূল সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক ভেদ চলিয়া গিয়াছে, তখন যে অসবর্ণ বিবাহ পুনরায় প্রচলিত হইবে না এরূপ আশা করা নিতান্তই দুরাশা। এবং তাহা প্রচলিত হইলে যে হিন্দুসমাজের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবে এই আশঙ্কাও ভ্রমাত্মক।

এ অবস্থায় যদি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এই কল্পিত বর্ণভেদ রক্ষা করার জন্য অসবর্ণ বিবাহে বাধা দিতে যান, তাহা হইলে যে সকল নূতন সামাজিক শক্তি উত্থিত হইয়া কল্পিত বর্ণভেদের স্থানে ব্যক্তিগত গুণের মর্য্যাদা স্থাপিত করিতেছে ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং সম্প্রদায়কে একতাসূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারা হিন্দুসমাজকে একেবারেই বিপর্য্যস্ত করিবে। এখন হিন্দুসমাজ এই সকল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মক্ষয় না করিয়া যদি ইহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, তাহা হইলেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, নতুবা হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখিতেছি যে, হিন্দুসমাজ এই সংকীর্ণ নীতির অনুসরণ করিয়া অতি সত্বর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই সংকীর্ণনীতির ফলে বালবিধবার বিবাহ বন্ধ হওয়াতে হিন্দুর জনসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। এই সংকীর্ণ নীতির ফলে উন্নতিশীল হিন্দুদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া হিন্দুসমাজ দিন দিন আত্মহত্যা করিতেছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত হইলেও বিধবাবিবাহ, সমুদ্রযাত্রা ও বিবাহ বিষয়ে উদার বলিয়া দিন দিন হিন্দুসমাজ অপেক্ষা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে এই সমস্ত সংকীর্ণ প্রথা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের অনুরূপ করিবার নিমিত্ত হিন্দুসমাজকে উন্নতিশীল করিতে চান, তাঁহাদিগকে কঠোর নিয়মের দ্বারা সমাজ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া ইহারই মধ্যে স্থান দিতে হইবে।

মাননীয় পাটেল মহোদয় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, সংকীর্ণ নিয়ম সকল পরিবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুসমাজকে এইরূপে উন্নত ও নূতন যুগের উপযুক্ত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সকল হিন্দু অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী, তাঁহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ইহার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। কেবল যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, বর্ত্তমান আইনের বাধা দূর করিয়া, তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা করাই ইহার

একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং রক্ষণশীল হিন্দুদিগের ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ নাই। তাঁহাদের স্বাধীন ধর্ম্মাচরণে এ আইন কিছুমাত্র বাধা দিবে না। কিন্তু এ আইন পাশ না হইলে, উন্নতিশীল হিন্দুদিগের অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অসবর্ণ বিবাহ করিলে বর্ত্তমান আইন অনুসারে তাঁহাদের সন্তানেরা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। যাঁহারা এই বিলকে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করেন ও মহারাণীর ঘোষণার বিরুদ্ধ বলিয়া অভিযোগ করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, কেবল প্রাচীনকালে কেন, মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘোর কলিযুগেই অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পায় নাই ও হিন্দু পিতৃপুরুষের পিণ্ড লোপ হয় নাই। বিবেচক হিন্দুমাত্রেই এই বিল পাশ হইলে গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিবেন। এবং তাঁহারা আশা করেন যে, গভর্ণমেণ্ট সংস্কারের বিরোধীদিগের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া, হিন্দুসমাজে যে সকল অনিষ্টকর প্রথা আছে, আবশ্যক হইলেই ঐ সকল রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিবেন। সতীদাহ নিবারণের সময়, বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের সময় ও এজ্ অব্ কন্‌সেণ্ট্ আইন পাশের সময় এইরূপে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপের নামে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিধি প্রণয়ন করিয়া হিন্দুসমাজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আশা করা যায় এবারও প্রতিবাদের জন্য আইন পাশ বন্ধ থাকিবে না।

(সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত)

প্রায়শ্চিত্ত

ত্রয়োবিংশ

প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থানে সুন্দর বাংলো। বাংলোর বিস্তৃত সীমা ভূমিতে নানা রকমের দেশী বিলাতী ফুলের গাছ। সম্মুখের দীর্ঘ রাজপথটির দুই ধারে বিলাতী নিম আম ও দেবদারু গাছের সারি, বসন্তের নবপল্লবে শোভান্বিত। মহেশ বাবু কর্ম্ম স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুচিতা স্বামী গৃহে গিয়াছে, ললিতা এলাহাবাদে সেই যে সর্দ্দি জ্বরে পড়িয়াছিল, আজও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই। ঔষধ ও চিকিৎসার অভাব নাই, কিন্তু তবু শরীর গ্লানি মুক্ত হইতে

চাহে না। মহেশ বাবু এজন্য অত্যন্ত চিন্তিত। বিবাহের দিনও সেজন্য পিছাইয়া দিতে হইয়াছে। নবেন্দু আর কতদিন বসিয়া থাকিবে,সে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া বারে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিয়াছে।

ললিতা মাঝে কিছুদিন নবেন্দুর পক্ষপাতী হইয়াছিল, নবেন্দুর স্নেহ সম্ভাষণ আদর যত্নটুকু আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিত, কিন্তু আজকাল তার মধ্যে কেমন একটা উদাসভাব আসিয়া পড়িয়াছে, সকল বিষয়েই যেন তার শ্রান্তির ভাব লক্ষিত হয়। নবেন্দু এ ঔদাসিন্য লক্ষ্য করিয়াছিল, ভাবী পত্নীর নিকট হইতে এরূপ ভাব সহ্য করা অসম্ভব, বিশেষ যখন নব যৌবনের নেশায় মন ভরপুর হইয়া থাকে, তার উপর অমিতারও যেন আড় আড় ছাড় ছাড় ভাব, কাজেই নবেন্দু বেচারা ইহাদের কাছে টেঁকে কি করিয়া? কিন্তু সে নির্ব্বোধ নয় যে, এই সকল ছুতা ন্যাতা লইয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া বিবাহে গোলযোগ ঘটাইয়া বসিবে। সে জানে, ভবিষ্যতে ব্যারিষ্টারীতে পসার জমাইতে না পারিলেও, শ্বশুরের সঞ্চিত অর্থে বেশ জমকাল রকমেই নিজেদের জীবন কাটাইতে পারিবে।

ললিতার অসুস্থতার জন্য অমিতাও বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে। তিনটি বোনে এতদিন কত আনন্দে—নিত্য নূতন কৌতুক প্রমোদে, গানে, গল্পে দিনের পর দিনগুলি স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গিয়াছে, কোথাও কোনো অসম্পূর্ণতার ফাঁকে মনকে ভারাক্রান্ত করিতে পারে নাই।

এখন শুচিতা তো চলিয়া গিয়াছে। ললিতা অধিকাংশ সময় শয্যায় বা ইজিচেয়ারে পড়িয়া থাকে। অমিতা একা আর কত বেড়াইবে? ললিতা এক একদিন বেড়াইতে রাজী হয়, অমিতা সেদিন খুসী হইয়া তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যায়। যেদিন ললিতা অসুস্থতার ওজর করিয়া ঘোরাঘুরি করিতে অসম্মত হয়, অমিতা বলে, আমি হোলে এতদিন রোগকে কখ্‌খনো দেহে পুষে রাখতুম না—ঝেড়ে ফেলে দিতুম। তোমার রোগকে তুমি ইচ্ছে কোরেই পুষ্‌ছো ছোট্‌ দি, একথা আমি ঠিক্ বল্‌ছি।

ললিতা মুখ রাঙা করিয়া বলে, অমিতে, তুই আন্দাজে সব কথা বল্‌তে পারিস, রোগ কখনো ইচ্ছে কোরে শরীরে কেউ বয়ে বেড়ায়?

অমিতা হাসিয়া বলে,তা তো জানি না ছোট্‌ দি। সাধারণতঃ 'শরীর দুর্ব্বল, মাথা ঘুরছে' এই সব বাহানায় যারা জড়ের মতন পড়ে থাকে, আমার তাদের ওপোর মায়া হয়। রোগের চাইতে ভাবনার বোঝাতেই তাদের দেহ বেক

পিয়ে যায়। আমার কি মনে হয় জান ছোট্ দি? মানুষ ভগবানের কাছে যত রকমই দাবী দাওয়া করুক, যত কিছু অভাব অভিযোগ জানাক্, তার শরীরটি যদি বেশ সবল সুস্থ থাকে, তা হোলে তাতেই তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ, নয় কি? ললিতা, 'হ্যাঁ কি না' কোনো উত্তরই দেয় না।

এবারে মহেশ বাবুর নূতন কর্ম্মস্থানের বাংলোখানি নিতান্ত নির্জ্জনস্থানে বলিয়া বড় একটা কারও মুখ দেখিবার সুবিধা নাই, এতোখানি নির্জ্জনতা ও মনের মানুষের সঙ্গের অভাব অমিতাকে ভাল লাগিত না। সে, দিনের মধ্যে পাঁচবার স্মরণ করিত—সরল হাস্য-কোলাহলমুখর বিশুকে, সদানন্দ সবক্তা হরদাদাকে; আর সে স্মরণ করিত, ভাগ্য বিড়ম্বিত—লাঞ্ছিত রতিকান্তকে। রতিকান্ত অমিতাকে দুইখানি চিঠি লিখিয়াছে, অমিতা সসম্মানে উহার উত্তর দিয়াছে, কিন্তু রতিকান্তের পত্রে যেন একটা নৈরাশ্যের করুণ সুর; অমিতা তাহাতে ব্যথা পায়, আক্ষেপের কোন কথা তাহাতে লেখা না থাকিলেও তাহার আভাসটুকু অমিতা প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে চায়, এবং সে সুকোমল নারী হৃদয়ের সহানুভূতির কাছে সহজেই প্রচ্ছন্ন বেদনারাশি আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলে।

ললিতার সম্বন্ধে কোনো কথা পত্রের মধ্যে উল্লেখ না থাকিলেও অমিতা বুঝিয়াছিল, যে এ ব্যাপারে রতিকান্তকে কতখানি আঘাত পাইতে হইয়াছে, কিন্তু রতিকান্তের চরিত্রে তার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। রতিকান্ত সে আঘাতকে গ্রাহ্য না করিয়া যখন জীবনেরপথে নানা কর্ম্মের অন্বেষণে প্রাণ মনের সহিত ব্যস্তভাবে ছুটিতে চাহিয়াছে, তাহাতে অমিতা আনন্দ অনুভব করিত,মনে মনে তাহার সাফল্য কামনা করিত। কিন্তু একটা মহাদুঃখ তাহার এই যে,রতিকান্তর সম্বন্ধে কোনো কথা কাহারও সহিত কহিবার উপায় ছিল না। জ্যাঠাইমার কাছে রতিকান্তের প্রসঙ্গ উঠিলেই, অমনিই ললিতার সহিত রতির বিয়েটা হোলেই বেশ হোতো ইত্যাদি গতানুশোচনার আবৃত্তি না হইয়া যায় না, অমিতা উহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইত। ললিতার সহিত বিবাহ না হইলেও যে রতিকান্তর ন্যায় যুবকের সহিত যে কোনো পরিবারের ঘনিষ্ঠযোগ ও বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা হওয়া অগৌরবের কথা না হইয়া আনন্দেরই বিষয় হওয়া উচিৎ তাহা কেন যে কেহ মনে করিতে পারেন না, ইহা সে ভাবিয়া পায় না।

ললিতার কাছে কথাপ্রসঙ্গে রতিকান্তর নাম উল্লেখ করিলে সেও একদিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "আমার কাছে ওসব কথা কেন অমিতা?" অমিতা

চুপ করিয়া গিয়াছিল। হায়, দুর্জ্ঞেয় মানব চরিত্র, একদিন যাহাকে হৃদয় মন্দিরে বসাইয়া পূজা করিতে চায়, ঘটনাক্রমে সে স্থান চ্যুতি ঘটিলে মন্দিরের ত্রিসীমানায় কোথাও কি আর তার জন্ত এতটুকু ঠাঁই নাই? বাহিরের এ সাবধানতা ও কঠোরতা কি নিজেদেরই দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে? কিন্তু এ ফাঁকী বহির্জগতে বেমালুম খাপ খাইলেও অন্তর্জগতে কি তার স্থান হয়?

সেদিন বৈকালে অমিতা যখন পিয়নের হাত হইতে রতিকান্তর চিঠি খানি লইয়া একমনে পড়িতেছিল, ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতা ললিতা উঠিয়া বসিয়া সাগ্রহে কহিল, কার চিঠি অমিতা? বড় দি লিখেছে বুঝি? অমিতা তখন পড়িতেছিল, "আমার সে দরখাস্ত খানার উত্তর আজ আমি পেয়েছি; আমাকে সৈন্ত শ্রেণী ভুক্ত করা হবে না। হায় হায়, সব দিকেই আমার পথ বন্ধ, কোথায় যাই? চার দিক্‌কার বন্ধনে দিনের পর দিন আমার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে, সংসারে কি কোথাও আমার স্থান নেই? জগতে কি আমার করণীয় কোনো কাজই নেই? জগৎ সংসারের যা কিছু কর্ত্তব্য, সব গুলিই নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তীব্র উপহাসের হাসি হাস্‌ছে। একি কঠিন, নির্ম্মম বিদ্রুপ! একি নিদারুণ অবিশ্বাস!" এ করুণোক্তিগুলি অমিতার হৃদয়ে যেন দাগ কাটিয়া বসিয়া যাইতেছিল। ললিতার প্রশ্নের উত্তরে সে তাচ্ছল্য ভাবে কহিল, এ চিঠির সঙ্গে তোমার কোনো সংশ্রব নেই। ললিতা অপ্রতিভ হইল, চিঠি যে কাহার, তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না, কিন্তু রতিকান্ত এমন কি কথা লিখিয়াছে যে, অমিতার পড়া আর শেষ হয় না, অমিতার মুখে যুগপৎ বেদনা ও অসন্তোষের ছায়া যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। অমিতার সে অপ্রসন্ন ভাব ললিতার বুকে বেদনার চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিল, কিন্তু হায় হায়, সে যে নিরুপায়, সে নিজেই একদিন রতিকান্তর প্রসঙ্গ তোলার জন্ত অমিতাকে ধমক দিয়াছে, এখন আর কোন্ মুখে তাহার পত্রের সংবাদ জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করিবে? রতিকান্ত কেমন আছে, আজকাল কি করিতেছে, জানিবার ইচ্ছা হইলেও সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পথ তো সে নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে যতখানি উদ্ধতা প্রকাশ করিয়াছে, উহা কি উচিত হইয়াছিল? রতিকান্তর ন্তায় সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, মহৎপ্রাণ যুবকের সে যে একদিন স্নেহের পাত্রী হইতে পারিয়াছিল উহা কি তাহার নারী জীবনের পক্ষে অগৌরবের কথা? সে কেন নিজের ছোট মন লইয়া, সে প্রাণপূর্ণ স্নেহরাশিকে নীচ চক্ষে দেখিয়া, স্বেচ্ছায় নিজের নারী মহিমাকে

মলিন করিয়াছে। সংসারের আর পাঁচজনের সহিত যে রতিকান্তর তুলনা হইতে পারে না, ইহা তো তাহার অবিদিত ছিল না, জগতের চক্ষে সে, যে কোনো অপরাধই করুক, তাহার কাছে রতিকান্তর কি অপরাধ? এই শঠতা ও চাতুরীবহুল সংসারে প্রাণভরা স্নেহ ভালবাসা, অনাবিল অকৃত্রিমপ্রেম অনুরাগ কি এতই অবজ্ঞা ও উপেক্ষার বস্তু?

ললিতার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বিনাসের করুণ তান উঠিতে লাগিল। তাহার হৃদয় আজ কোনো নিষেধ না মানিয়া রতিকান্তর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে চাহিল, ওগো দেবতা, আমি তোমার চরণে যদি অপরাধ করে থাকি, তার মার্জ্জনা করো, তোমার স্নেহের অযোগ্য আমি, কিন্তু ভাগ্যবলে যদি তার অধিকারিণী হয়ে থাকি, তা থেকে আর যেন বঞ্চিত না হই।

চতুর্ব্বিংশ

সন্ধ্যার পর নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে, আকাশ, ধরণী ভরিয়া গেল। শুভ্র সুন্দর চাঁদের কিরণে চারিদিক সুন্দর শোভা ধারণ করিল অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত মল্লিকা, বেলার ঘন সৌরভে বাতাস আমোদিত হইল। ললিতা নিজের মনের গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্ম কহিল, আঃ কি সুন্দর জ্যোৎস্নাটি ফুটে উঠেছে, অমিতা, তুই একটা গান কর্ ভাই!" অমিতার মন, রতিকান্তর পত্রখানি পাঠ করিয়া পর্য্যন্ত ভাল ছিল না, কিন্তু তার চির প্রফুল্ল মনের মধ্যে সে অধিকক্ষণ বেদনার বোঝা বহিতে পারিত না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাতার সহিত কাজের মধ্যে এবং কাকামণিকে চা দিবার সময় সে আজ গম্ভীর হইয়াই ছিল, মহেশবাবু অমিতার সে গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, খুকীর আজ কি হোলো রে, হঠাৎ এত চুপ্ চাপ্ কেন? প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য, এতক্ষণে অমিতার মনের সে বিষাদ ছায়া সরাইয়া দিল, বসন্তের মৃদু মন্দ বাতাস দেহে ও মনে যেন পুনঃ চাঞ্চল্য আনয়ন করিল। আ মরি মরি, নিখিল বিশ্ব প্লাবিত করিয়া কার এ হাসি রাশি ঝলমল করিতেছে। একি রূপ, একি শোভা! কি সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! মনের সমস্ত গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিয়া এ জ্যোৎস্নায় সৌন্দর্য্য তরঙ্গে কে না গা ভাষাইতে চায়? ওগো, ঐ কান পাতিয়া শোনো, ঐ অমল ধবল চারু চন্দ্রিকায় পুলকিত হইয়া কোন্ অজানা লোক হইতে কি এক অপার্থিব সুর-তরঙ্গ আমাদের এই ব্যথা, শোক, হা-হাকারপূর্ণ মর্ত্ত্যধামে ভাসিয়া আসিতেছে। সে সুরে কি এক অপূর্ব্ব মহান, আহ্বান-গীতি ধ্বনিত

হইতেছে। এস নর, এস নারী, সেই সুরে তোমরাও সুর মিলাইয়া গান ধর, স্বর্গে মর্ত্ত্যে এক হউক, মানবের প্রাণের আশা—হৃদয়ের বাসনা সেই স্বর্গীয় সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে লীলায়িত হইয়া তোমাদের চক্ষে কল্পনার উজ্জ্বল স্বর্গীয় ছবি আঁকিয়া ধরুক।

অমিতা হর্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া গান ধরিল,—

এ কি রূপ, নিরুপম, ওগো চির মন প্রাণ হরণি।
ইন্দু কিরণ ঝলকিত দেহ, অমল ধবল বরণি!
রূপেতে ভরেছ আঁখি,
কুসুম সুবাস মাখি,
পরাণ কেড়েছ, মন ভুলায়েছ, ওগো পুলকিত ধরণি!
কি সুরে ধরেছ গান,
এ-কি ভুবন ভুলান তান,
আজি কোন্ কুল আশে, আকুল পিয়াসে,
বাহিব হৃদয় তরণী,
ওগো পুলকিত ধরণী।

সুন্দর গান, সুন্দর সুর, সুন্দর সময়। অমিতা তন্ময় হইয়া, বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-বন্দনা গীতি গাহিতে লাগিল। এই গান ললিতা ও অমিতা দুই বোনে মিলিয়া কতবার জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে, গাহিয়াছে, নিজেরা গাহিয়া নিজেরাই মুগ্ধ হইয়াছে, আনন্দ অনুভব করিয়াছে, আজ কিন্তু ললিতার কাছে এগান ভাল লাগিল না, তাহার কাণে আজ এ গানের সুর বেসুরা বোধ হইতে লাগিল, অমিতার গান থামিলে, ললিতা নিজেই গুণ গুণ করিয়া একটি গান ধরিল, অমিতাও কণ্ঠ মিলাইয়া সে গানে যোগ দিল,।

(দ্বিজেন্দ্রলালের মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত)

"নীল আকাশের অসীম ছায়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো,
আবার কেন, আবার কেন, ঘরের ভিতর প্রদীপ জ্বালো।
রাখিস না আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দেরে,
উধাও হোয়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাব না লো।
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে, আকাশ ভুবন গেল ভেসে,
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ্ করে শোন বাইরে এসে,
বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মতন ভালবেসে,
এখন যদি মরতে না পাই, তা হোলে মোর মরণ ভালো।

সাঙ্গ আমার ধুলা খেলা, সাঙ্গ আমার বেচা কেনা,
এয়েছি কোরে হিসেব নিকেশ যার যা ছিল পাওনা দেনা,
আজি বড়ই শ্রান্ত, ওমা আমায় তুলে নে না
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো॥"

সঙ্গীতের প্রতি ছন্দে কি এক বুক ফাটা আর্ত্তনাদ যেন হা হা করিয়া বাতাসের বুকে ফিরিতে লাগিল। ললিতার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা নামিল, সুরের একি মোহিনী শক্তি। গোপন মর্ম্মস্তল ওলোট পালট করিয়া কোন্ নিভৃত প্রদেশের গভীরনৈরাশ্য নিদারুণ মর্ম্ম বেদনাকে বাহিরের এ মুক্ত আলোকে সে আনিয়া ফেলে। ললিতা নিজেই বুঝিল না, কেন আজ এ সঙ্গীত এত মর্ম্মস্পর্শী এত করুণভাবে তার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। কে আজ তাহাকে বলিয়া দিবে, এই চির পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোনটা সব চাইতে সত্য। হৃদয়ের সহিত ক্ষত বিক্ষত হইয়া, অন্তরের আকুল গভীর ও বিরাট দৈন্যকে প্রাণপণ শক্তিতে লুকাইয়া রাখিয়া বিশ্বের সম্মুখে সহজ ভাবে জীবন যাপন করাটাই সত্য, কি নিজের বেদনার আত্ম প্রকাশ ও পরাজয় স্বীকার করাতেই সত্যের মহত্ত্ব ব্যক্ত ?

*　　*　　*　　*

ঠিক্ এমনি সময়ে কত শত ক্রোশ দূরে—কত নদ নদী, গ্রাম, নগর, পর্ব্বতের ব্যবধানে, ছাদের উপর একাকী বসিয়া রতিকান্তও উদাস হৃদয়ে চাঁদের পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। যে জীবনের পাত্র, একদিন নব যৌবনের প্রারম্ভে, তাহার নিকট স্বাদু অমৃতে পরিপূর্ণ বলিয়াই মনে হইয়াছিল, সমস্ত পৃথিবী, স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণ বৈচিত্রে তাহার নয়নে অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইয়াছিল, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তির বিচিত্রতা তাহার জীবনকে অপূর্ব্ব ভাবে স্পর্শ করিয়া, এ বিশ্বভুবনকে কোন্ রমণীয় দেবলোকে পরিণত করিয়াছিল, আজ হঠাৎ তাহার এ পরিবর্ত্তন কেন ? যে নববসন্তের আহ্বানে বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে এ পুলক-চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে, যে অমল ধবল কৌমুদীধারা, পৃথিবীতে স্বর্গেরশোভা সৃষ্টি করিয়াছে,আজ সে সকলে তাহার মুহ্যমান হৃদয়ে চেতনা আনিতেছে না কেন ?

জীবনের রঙ্গালয়ে একি আকস্মিক দৃশ্য পরিবর্ত্তন,এখন যে পট ক্ষেপন হওয়াই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। কোন্ ভুলে সে এমন মহাপাপ করিল, যার ক্ষমা নাই, সংশোধনের পথ নাই,শুধু প্রায়শ্চিত্তই একমাত্র উপায়। হায় নিষ্ঠুর ভাগ্যলিপি !

পঞ্চবিংশ

শ্রীকান্ত বাবু জমীদারীর হিসাব পত্র খুব নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেছিলেন,সতীকান্তও নিকটে বসিয়া সে সকল দেখা শুনা করিতেছিল। অন্য এক জমীদারের সহিত খানিকটা জমীর সীমানা লইয়া মোকদ্দমা বাধিয়াছে, উহারই স্বত্ব কোন্ পক্ষের ন্যায্য প্রাপ্য,সে বিষয়ের পাকানজীর, পুরাতন দলিল পত্র ঘাঁটিয়া বাহির করিতে কোনে পক্ষেই উদাসীন নহেন।

চিন্তামণি গৃহের মেঝেতে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। পুত্রগত প্রাণা জননীর প্রাণ, আজকাল একমাত্র রতির শুভাশুভ চিন্তাতেই চঞ্চল হইয়া আছে। তাঁহার প্রাণাধিক রতি যে তাঁর চোখের উপর দিনের পর দিন শুকাইয়া যাইতেছে, বিষয় কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আর কারও সে দিকে নজর দিবার অবসর না হইলেও তিনি তো সে বিষয়ে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

রতিকান্তকে কয়দিন হইতে এই জমী-জমা সংক্রান্ত হিসাব ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য শ্রীকান্ত বাবু বলিয়াছিলেন, এবং কেন সে তাঁহার আদেশ পালন করেন নাই সে কথা শুনিবার জন্য হরদাদাকে দিয়া রতিকান্তকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। চিন্তামণি, রতির পক্ষসমর্থন করিবার জন্যই অসময়ে এ গৃহে আসিয়া বসিয়াছিলেন।

হরদাদা রতিকান্তকে লইয়া আসিলেন। রতিকান্ত বাস্তবিকই অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর কারাগৃহে বাস করিয়াও তাহার বলিষ্ঠ দেহ এতো দুর্ব্বল,চক্ষুদ্বয় এতো নিষ্প্রভ হয় নাই। সমস্ত দেহে যৌবনের লাবণ্য যেন কোথায় মিলাইয়া গিয়া, এক দারুণ অবসাদ ও ক্লান্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, মাথায় কেশের পরিপাট্য নাই, মুখ ভার—চিন্তাক্লিষ্ট।

রতিকে দেখিয়া শ্রীকান্ত বাবু কহিলেন, তোমায় আমি কাগজ পত্রগুলো দেখে শুনে সব ঠিক্ কোরে রাখতে বলেছিলাম, তুমি এ ক'দিনে তার কিছুই করনি, অথচ তোমার হাতে কোনো কাজ কর্ম্ম নেই, এর কারণ কি ?

রতিকান্ত ইহার কি উত্তর দিবে ? এ সবে তাহার মনকে সে সংলগ্ন করিতে পারে, এমন মনের অবস্থা আজকাল তাহার নয়, একথা সে কেমন করিয়া তাঁহাদের বুঝাইবে ? সংসারে সে একদিন সকলেরই কত প্রীতির ও কত ভালবাসার পাত্র ছিল, পাড়ায় একজন আদর্শ পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত, ঘটনাচক্রে আজ সে যেন সকলেরই সন্দেহের পাত্র, সকলেই তাহাকে

যেন অবজ্ঞা ও ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিতেছে। যে উমাকান্ত, সতীকান্ত ভ্রাতার গৌরবে একদিন নিজেরাও যথেষ্ট গৌরব বোধ করিত, আজ তাহারাই আবার মধ্যে মধ্যে রতির বিষয়ে দু' একটা কড়া কথা বলিয়া মায়ের প্রাণে ব্যথা দিতেছে। এ সকল লাঞ্ছনা রতিকান্ত কি নীরবে সহ্য করিবে? তাহাকে যদি কাহারও প্রয়োজন না থাকে, তবে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? তাহাকে মুক্তি দিক, যেখানে মন, সে চলিয়া যাউক। বিপুল বিশ্বে কোথাও সে নিজের আশ্রয় খুঁজিয়া নিক্। রতিকান্তকে নিরুত্তর দেখিয়া চিন্তামণি কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা রতি, তুমি ওঁর কথায় কান দিচ্ছ না, তোমার দাদাদের কথাও মন দিয়ে শোন না, এ সব তো ভাল কথা নয়। তোমার দেহ যে পাত হয়ে যাচ্ছে, সে দিকেও তাকাচ্ছ না, তোমার মুখের দিকে চাইতে আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে বাপ্।

রতিকান্ত হেটমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, বাবা, আমার শরীর মন কিছুই ভাল নেই,আমার এখানে কিছু ভাল লাগছে না,সে জন্যে কোনো কিছুতে আমি মন দিতে পারছি না, দিন কতক আপনি আমায় ছেড়ে দিন, আমি একটু ঘুরে আসি।

রতিকান্তর জন্য বাস্তবিক সংসার শুদ্ধ লোককে যেন বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। নিষ্প্রয়োজনেও অনেককে রতিকান্ত সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ভ্রাতৃগত প্রাণ সতীকান্ত, উমাকান্তেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছিল। আজই তো সকালের ঘটনা, রতিকান্ত নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল, একজন ভদ্রলোক আসিয়া রতির সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া শ্রীকান্ত বাবুকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাই হরদাদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাই আন্দাজে লোকটির পরিচয় ও উদ্দেশ্য ধরিতে পারিয়া বলিয়া ছিলেন, মশায়ের কি আই বুড় কন্যা না ভগ্নী আছে? তা আমরা তো এখন ছেলের বিয়ে দিতে পারছি না, মাপ কোরবেন।

এ রহস্যে ভদ্রলোকের ধৈর্য্যচ্যুতি না হওয়া অসম্ভব, তিনি রূঢ় ভাবে কহিলেন, মান রেখে কথা বলবেন মশায়, সরকারের লোকের সঙ্গে কথা কইছেন এ কথাটাও মনে রাখবেন, দাগী লোকের সঙ্গে মেয়ের কি বোনের বিয়ে দেবো এতো অভাগ্য হয় নি। আমি সাধ কোরে খোঁজ নিতে আসি নি, মশাই, পুলিসের চাকরীতে বাধ্য হোয়েই এ সব তদন্ত করতে হয়, তা আপনারা খুব ভাল ব্যবহার করলেন।

হরদাদা বিনীত ভাবে কহিলেন, মশাই আগেই বোল্লে ভাল করতেন, নইলে কেমন কোরে বুঝতে পারবো বলুন, আপনি আমাদের ছেলের সম্বন্ধে যে রকম খুঁটিয়ে খবর নিচ্ছিলেন,আমরা মনে করলাম, আপনি পাত্রের সন্ধানেই এসেছেন। আর সরকার বাহাদুরের কথা বলছেন, তাঁর আশ্রয়ে তো আমরা সবাই আছি কিন্তু সেজন্যে আমাদের ভয় করবার কোন কারণ নেই, তবে তাঁর সেনা সামন্তদের অবশ্য খুবই ভয় কোরে চলতে হয়।

লোকটি বেশ রাগ ভরেই চলিয়া গিয়াছিলেন,এবং যাইবার সময় দু' একটা শাসানো গোছের কথা বলিয়া যাইতেও ভোলেন নাই। সতীকান্ত বাড়ী ছিল না, যে আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া রাগে ও অপমানে জলিয়া উঠিয়াছিল। সে জ্বালা হঠাৎ ফাঁক পাইয়া চাপ পড়িল এখন রতিকান্তর উপরে।

সতীকান্ত তীব্র কণ্ঠে কহিল, আমরা পাঁচ জ্বালায় মরছি, আর তোমার এখন দেশ ভ্রমণের সখ চেপেছে। লেখা পড়া শিখে, বিদ্বান হোয়ে খুব সকলের মুখ রক্ষা করলে। নিজেও মজলে আমাদের ও মজালে। তিনসন্ধ্যে পুলিসের লোকের হুমকী আর কত সহ্য করা যায়, তোমার জন্যেই না এ লাঞ্ছনা! তোমার কি বলো, দিব্বি খাচ্ছ, দাচ্ছ, ঘুরে বেড়াচ্ছ, আমাদের ভাবনায় যা হবার তা হচ্ছে। রতিকান্ত নিঃশব্দে ঘর হইতে উঠিয়া গেল, হঠাৎ এরকম কঠোর র্ভৎসনা সে একদিনও কাহার নিকট হইতে শোনে নাই—বা শুনিবার প্রত্যাশা করে নাই। চিন্তামণি স্তম্ভিতের মত বাক্‌শক্তি হীনা হইয়া বসিয়া রহিলেন। সতীকান্তের নিষ্ঠুর কথাগুলার প্রতিধ্বনি, নিস্তব্ধ গৃহে তখনো যেন খট মট শব্দে বাজিতে ছিল। সতীকান্ত কিন্তু এতোখানি রূঢ়তার সহিত কথাগুলা উচ্চারণ করিতে চাহে নাই, রতিকে সে অত্যন্ত স্নেহ করিত, এবং সে যে কত অভিমানী তাহাও সতীকান্ত ভাল রকমই জানিত। শ্রীকান্ত বাবু পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন, তাহার সকল বিষয়ে ঔদাসীন্যের কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য। তাহার মন যে ভাল নাই, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই, যাহাতে সে কোনো কাজ কর্ম্মে মন নিবেশ করিয়া সান্ত্বনা পায় ইহাই তিনি চাহিতেছিলেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান রতিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তবে আজ কিছুদিন হইতে বিষয় লইয়া মোকদ্দমার হাঙ্গামা, তাহার উপর তিন সন্ধ্যা পাঁচজনার নিকট হইতে, রতিকান্ত সম্বন্ধে পাঁচটা প্রশ্ন ও মন্তব্য শুনিতে শুনিতে তাঁহারও মন ঠিক্ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। এখন রতিকান্তকে নিঃশব্দে

উঠিয়া যাইতে দেখিয়া, তাঁহারও মনে স্নেহের বেদনা জাগিয়া উঠিল। হরদাদা কিছুক্ষণের পর গৃহের সেই নিস্তব্ধতাকে লঘু করিবার জন্য সরল ভাবে, চপল কণ্ঠে কহিলেন, কি ছেলেমানষী করছ সতি, তোমারও দেখছি মাথা গরম হয়েছে, হস্তুকী ভিজুনো জল খাবে। বৌমা, আজ থেকে দিন কতকের জন্য তোমার সতীরও ঐ ব্যবস্থা—বুঝলে মা!

চিন্তামণি বুঝিবেন কি, রতিকান্তের উদাসীন ভাব, তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, বিবর্ণ শরীর, তাঁহাকে দিনের পর দিন উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, অথচ রতির জন্য সকলেই বিব্রত হইয়া আছে, তখন আর সাহস করিয়া রতির প্রসঙ্গ তিনি স্বামী পুত্রের কাছে পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে পারিতেছিলেন না, তবে রতির সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা, প্রাণ খুলিয়া হইত এই হরদাদার সহিত। আজ হরদাদাকে লইয়া শ্রীকান্ত বাবুর কাছে তিনি আসিয়াছিলেন, রতির সম্বন্ধেই কিছু বলিবার জন্য, তাহার উপর কাজ কর্ম্মের বোঝা না চাপাইয়া কি উপায়ে তার মনের ও শরীরের উন্নতি হইতে পারে সে দিকে যেন তিনি একটু মনোযোগী হন, কিন্তু কোথা হইতে কি বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া বসিল। সতীকান্তের তীব্র কথাগুলি রতিকান্তর প্রাণে যে কতখানি বাজিয়াছে তাহা পুত্রগতপ্রাণা জননী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। অশ্রু ধারায় তাঁহার দুই চক্ষু ভরিয়া আসিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

কুশদহ-সমিতি

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

সমিতির বার্ষিক অধিবেশন-সংবাদ এবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য "কুশদহ"র গ্রাহকশ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় এই লিখিত বিবরণ পাঠে অধিক আনন্দ লাভ সম্ভব নয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি যে, সমগ্র কুশদহবাসীর সম্মিলনার্থে যে সভার আয়োজন, তদুপযুক্তরূপে প্রত্যেক গ্রামের ভদ্র মহোদয়গণকে আহ্বান

করা হয় নাই। তবে সাধারণভাবে—বনগ্রাম, ঘোঁজা, হাবড়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে সভা করিয়া এবং বিজ্ঞাপন দ্বারা—এমন কি, স্থানে স্থানে ঢ্যাট্‌রা দিয়া এই অধিবেশন সংবাদ প্রচার করা হইয়াছিল ; ব্যক্তিগত ভাবে কুশদহের ২৩৮ খানি গ্রামের প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট আহ্বান করা সহজ ব্যাপার নয়, তদ্ভিন্ন সমিতি একটি দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠান, এখানে বিশিষ্ট ও সাধারণের বিশেষ ভেদ করাও সঙ্গত নহে—তথাপি সমিতির উদ্‌যোক্তাগণ সভাস্থলে এ ত্রুটী স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে কুশদহবাসী মাত্রেরই অবৈধ-চিত্তে সমিতিকে নিজের মনে করিয়া যোগ দান করা এবং সাধ্যানুসারে সমিতিকে শক্তিশালী করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

যাহা হউক ঐ সকল ভ্রম-ত্রুটী সত্ত্বেও প্রথম দিনের অধিবেশনে কুশদহর বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু, মুসলমান ৬০০ শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। ইহা কি বাস্তবিকই আশার কথা নয়? তাই এখন আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে পারি যে, বাহিরে অবস্থার পেষণে কুশদহবাসী নির্জীব হইলেও তাঁহাদের কণ্ঠায় আজও প্রাণে আছে, তাই সম্মিলন-সঞ্জীবনী মন্ত্রে এখনও প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

গত ২২শে ও ২৩শে মাঘ, ইছাপুর সীমার দক্ষিণপ্রান্তে—যমুনা তীর ভাগে—সমিতির নবনির্ম্মিত মণ্ডপে অধিবেশন কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার দেড়মাস পূর্ব্বে বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথমে বার্ষিক অধিবেশনের কথা সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় এবং সাধারণ সভায় উপস্থিত করিয়া বলেন, অধিবেশন স্থান ইছাপুরে হউক এবং মণ্ডপ (প্যাণ্ডাল) নির্ম্মাণ করিয়া, কুশদহর প্রত্যেক গ্রাম হইতে প্রতিনিধি (ডেলিগেট্) সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ কংগ্রেসের আদর্শে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত করা হউক।

এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করা কঠিন মনে করিয়া সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু শেষ অনেক বাদানুবাদের পর দুর্গাদাস বাবুর ঐকান্তিকতা দেখিয়া সকলে একমত হইয়া সেই আদর্শানুযায়ী অধিকাংশ কার্য্য করিতে উৎসাহী হন।

তৎপরে সভাপতি নির্ব্বাচন-কল্পে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত বাচস্পতি মহাশয়কে পাইতেও অনেক আয়াস পাইতে হইয়াছিল, তাই সভাপতি-বরণ প্রস্তাবের সমর্থনের মধ্যে "কুশদহ" সম্পাদক দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু বলেন, "বিনাক্লেশে দুল'ভ বস্তু পাওয়া যায় না, কিন্তু সে ক্লেশ আনন্দেই

পরিণত হয়। আজ আমরা মজুমদার মহাশয়কে আমাদের সমিতির সভাপতি রূপে পাইয়া সেই সত্যই অনুভব করিতেছি।"

মুদ্রিত পত্রে প্রারম্ভিক সময় বেলা ১২টা লিখিত ছিল, কিন্তু সদস্যগণ যশোহর হইতে আগত সভাপতি মহাশয়কে গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্রমহাশয়ের গৈপুরের বাটীতে লইয়া যাইতে—বিশেষতঃ সহৃদয় মজুমদার মহাশয় কোনো যান-বাহনে না যাইয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত পদব্রজেই পথ ঘাট পরিদর্শন করিতে করিতে গমন করেন এবং বিশ্রামাদির পর মণ্ডপে আসিয়া ২টার সময় কার্য্যারম্ভ হয়।

এই সময় উচ্চ মঞ্চোপরী নহবৎধ্বনির মধ্যে লতাপত্র সজ্জিত মণ্ডপে ও চতুর্দ্দিকের জনাকীর্ণ দৃশ্যটি দেখিয়া বাস্তবিক তখনকার জন্যও যেন কুশদহের কত অতীত লুপ্ত-গৌরব-স্মৃতি জাগ্রত হইয়া সভাস্থ জন মণ্ডলীর মুখে কি এক নবোৎসাহের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাই বুঝি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় যে সময় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার মধ্যে সেই ভাবটিই সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথমে খাঁটুরানিবাসী স্বভাব-কবি—সুকণ্ঠ-গায়ক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চৌধুরী মহাশয়, "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে—" এই প্রাণ মাতানো সঙ্গীতে, তৎপরে তাঁহার স্ব-রচিত এবং সময়োপযোগী আর একটি নূতন সঙ্গীতের দ্বারায় জন-সঙ্ঘকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সভার প্রারম্ভিক ভাবটি সরস এবং জাগ্রত করিয়া দেন। তৎপরে আজ এই মহাযজ্ঞের আনন্দ-পূর্ণ দৃশ্য দেখিবার জন্য যাঁহার প্রাণ আগে হইতেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, কুশদহ-সমিতির সেই ভক্ত—সেবক বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্বরচিত মাতৃমন্ত্রে—সুললিত সুগম্ভীর মঙ্গলাচরণ পাঠ করিয়া সভাস্থ সভ্যগণের প্রাণে 'জননী জন্মভূমি'র প্রতি ভক্তি ভাবের উদ্রেক করিয়া দেন।

অতঃপর মাটীকোমরা নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুইটি শিক্ষিত বালক দ্বারা "ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়"—ইত্যাদী মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্রটী সু-সঙ্গতভাবে আবৃত্তি করান।

এখানে আর একটি কথা আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই অনুষ্ঠানে সুবিখ্যাত "অমৃতবাজার পত্রিকা"র বাবু পীযুষকান্তি ঘোষ মহাশয় সমিতির আহ্বানে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও মহোৎসাহের সহিত

ইছাপুরে আসিয়া দুই দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্যে যোগদান করাতে যেমন সমিতির বিশেষ উপকার হইয়াছিল, তদ্রূপ পীযূষবাবুর উদার নিস্বার্থ স্বদেশানুরাগের সংস্পর্শে, সমিতির মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত প্রীতির সঞ্চার করিয়াছিল।

গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয়কে সভাপতি-বরণ প্রস্তাব করেন। পীযূষবাবু তাহা অনুমোদন এবং কুশদহ-সম্পাদক, সমর্থন করেন। প্রস্তাবক এবং অনুমোদক উভয় বক্তা বিশেষরূপে নিজ নিজ ভাবে এবং ভাষায় সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, যশোহর জেলাবোর্ডের সভাপতি সুবিখ্যাত দেশমান্য রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়কে অদ্যকার সভায় সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সমিতির সদস্যগণ অতি সদ্বিবচনার কার্য্যই করিয়াছেন। কারণ কুশদহ সীমার প্রায় তিন ভাগ, যশোহর জেলার অন্তর্গত। সুতরাং এদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে কুশদহর অনেক উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় কথা—যদুবাবুর ন্যায় হাতে হাতিয়ারে পল্লীসংস্কারে ব্রতী দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরল। তাঁহার অভিজ্ঞতা অতি মূল্যবান। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া নিবারণ-কল্পে যশোহর জেলার মধ্যে তিনি কার্য্যতঃ যতদূর করিয়াছেন, কুশদহ সমিতি সে দৃষ্টান্ত গ্রহণে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে এই একটি অবসর বলা যায়।

তৎপরে বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কণ্ঠে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া আন্তরিক সদ্ভাব জ্ঞাপন করিলে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার সুন্দর সারগর্ভ অভিভাষণ সুললিত প্রাঞ্জল বাংলাভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁহার সেই দীর্ঘ অভিভাষণে অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা পল্লীর উন্নতি সাধনের পথ প্রদর্শন করেন। তাহা সম্পূর্ণরূপে এখানে স্থান দিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তবে তাহার সারভাব এইরূপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করা হইল :—

সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! আজ আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়া এই সভার কার্য্যে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

আপনারা ঠিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এখন সম্মিলিত ভাবে কায করিতে না পারিলে কোন কাযই সহজসাধ্য হইবে না। পূর্ব্বে যে বারোয়ারি প্রভৃতি কার্য্যে সমবায় ভাব ছিল, তাহাকে এখন সম্পূর্ণরূপে কালের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। এজন্ত আমি সর্ব্বপ্রথমে আপনাদিগকে বলি যে, এই আপনাদের সমবেত শক্তিকেই পরিপুষ্ট করিতে হইবে—ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই 'কুশদহ সমিতি' একদিন সমস্ত পল্লীর আদর্শস্থান হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

সকল কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন; জঙ্গল পরিষ্কার, পুরাতন ডোবা ভরাট, পুষ্করিণী খনন, শিক্ষাবিস্তার—স্কুল পাঠশালা, কৃষির উন্নতি—যে কাযে হাত দিবেন তাহাতেই অর্থের দরকার। এ অর্থ কোথা হইতে আসিবে ? চিরদিন যদি কেবল চাঁদার উপর নির্ভর করেন, তাহাতে কাযের বিশেষ সুবিধা হইবে না। আমি জানি যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদের গরীবের সাহায্য করা উচিত। সেইটীই প্রকৃত সমবায়ের মূলনীতি। কিন্তু কুশদহ সমিতিকে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, ইহার মধ্য হইতে অর্থোপার্জ্জনও করিতে হইবে।

আপনারা একত্রে ৫৲ টাকা করিয়া মূলধন লইয়া তাহাকে একত্রে সদ্ভাবে গরীবের সাহায্যার্থে প্রয়োগ করিলে—আমার যতদূর অভিজ্ঞতা, তাহাতে বলিতে পারি, আপনারা কখনই বিফল হইবেন না। ইহাতে ৯৲ টাকা হার—অর্থাৎ শতকরা মাসিক ৸৹ আনা সুদ পোষাইবেই। তাহার ।৶৹ মূলধনের লভ্য দিয়া ।৶০ আনা সমিতির কাযে লইতে পারেন। যাহারা বৎসরে ৩৶৹ আনা—অর্থাৎ ১০০৲ টাকা, মহাজনের নিকট ধার লইয়া এক বৎসরেই ৩৭৷৷০ টাকা সুদ দিতে বাধ্য হয়, এবং এইজন্তই তাহারা চিরঋণী হইয়া জীবনব্যাপী কষ্ট ভোগ করে, এই অর্থে তাহারা যদি শতকরা ১৲ টাকা হারেও অর্থাৎ বছরে ৩৭৷৷০ টাকার স্থলে ১২৲ টাকা সুদেও টাকা ধার পায়, তাহাতে সমিতিরও যথেষ্ট লাভ এবং দেশের যাহারা অস্থি স্বরূপ, সেই কৃষকগণকেও যুক্ত—বলশালী করা হইবে। এ কাযে কেবল কর্ত্তব্যপরায়ণ বিশ্বাসী কর্ম্মী লোকের দরকার।

৫৲ টাকার অংশ লইয়া আপনারা ক্রমে লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু আমি একেবারেই তাহার চেষ্টা করিতে বলিতেছি না, আপাততঃ একশত কিম্বা দুইশত অংশ লইয়া ৫০০৲ শত বা ১০০০৲ এক

হাজার টাকার কায আরম্ভ করিতে পারেন। ধার লইয়া যাহারা টাকা ফেরৎ দিতে পারিবে না, তাহারা শস্য দিবে, তাহাতেও সমিতির লাভ হইবে। তাই আমি আবার বলিতেছি, এ কাযে হস্তক্ষেপ করা কঠিন হইবে না, প্রথমে চাই কেবল খাঁটী কর্ম্মী লোক সংগ্রহ, পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করা এবং একতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

ইহার উদ্দেশ্য যে কেবল অর্থের দ্বারা বাহিরের অসুবিধাগুলি দূর করা মাত্র তাহা নহে, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষ ভাল হওয়া এবং মানুষকে ভাল করা।

নিশ্চয়ই আপনাদের প্রত্যেক গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব আছে। তজ্জন্য এখন দেখা যাইতেছে যে, পুষ্করিণী খনন তত সুবিধা জনক নহে। উহা একদিকে যেমন ব্যয় সাধ্য তেমন জল বিশুদ্ধ রাখাও কঠিন। এজন্য পাতকুয়া বা ইঁদারাই উত্তম ব্যবস্থা। নিতান্ত পক্ষে ২৫৲ টাকাতেও এক একটি পাতকুয়া হয়। মধ্যবিত্ত প্রত্যেক গৃহস্থই ৫০৲ বা ১০০৲ টাকা ব্যয়ে নিজ নিজ বাটীতে এক একটি ভাল পাতকুয়া প্রস্তুত করিতে পারেন। যাহারা তাহাতে অক্ষম, তাহাদিগকে ২৫৲ টাকা ধার দিয়া আবার প্রতিমাসে ১৲ টাকা করিয়া ফেরত লইলে মায় সুদ আড়াই বৎসরে শোধ হইবে।

এক একটি পাতকুয়া সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিলে ৫।৭ বৎসর বা তাহারও অধিক কাল যাইতে পারে। ইঁদারা ৩০ বৎসরেরও বেশী ভাল থাকে। মধ্যে মধ্যে পঙ্কোদ্ধার করাও তত কঠিন নয়।

আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি জল এবং দুগ্ধ নিয়মিতরূপে যদি গরম করিয়া আপনারা পান করেন, তাহাতে উদরাময় প্রভৃতি রোগ এবং ম্যালেরিয়া নিবারণে নিশ্চয়ই বিশেষ সাহায্য হইবে। প্রথমে ২।৪ জনেই দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন।

সকলেই জানেন আমাদের দেশে কোন সভা সমিতি অধিক দিন টিকে না। তাহার কারণ, খাঁটি লোকের অভাবে। কেবল একটা ভাবের ঝোঁকে— বক্তৃতার জোরে কোন সভা অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারে না, যদি তাহার মধ্যে খাঁটী কর্ম্মী লোক কেহ না থাকেন। আমি আপনাদিগকে জোরের সহিত বলিতে পারি, আপনাদের মধ্যে যদি স্বার্থত্যাগী নিষ্ঠাবান্ দু' একজনও থাকেন তবে এই সমিতি ব্যর্থ হইবে না।

আমি জানি আপনারা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য চান। আমি বলি সেজন্যও আপনাদের ঐ শক্তির সংযোজনা করিতে হইবে। যাহারা আত্মোন্নতির

চেষ্টা করে না, ভগবান্ তাহাদের সাহায্য করেন না। এ কাযেও একাকী কেহ কিছু করিতে পারিবেন না।

ইহার পথ দুই দিকে—সমবেত শক্তিতে আপনারা আপনাদের কায করিতে উদ্যোগী হওয়া আপনারা নিজ নিজ বাগান, বাড়ী, রাস্তাগুলি সাধ্যানুসারে পরিষ্কার করা—সমবেত শক্তিযোগে অসক্ত প্রতিবাসীর সাহায্য করা, আবার যখন গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রার্থি হইবেন, তখনও সমবেত ভাবেই তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট এমন একটি জিনিষ যে, সেখানে নিরাশ হইলে চলিবে না, ধরিয়া থাকিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ দাবী করিতে হইবে, নিজেদের কার্য্যতৎপরতাও দেখাইতে হইবে, তাহাতেই একদিন আপনারা সফলতা লাভ করিবেন। আর যদি আবেদন করিয়াই কেবল গভর্ণমেণ্টের মুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকেন, তবে সফলতার আশা কম। গভর্ণমেণ্টের কাযে দেশবাসী যদি অনুকূল না হয়, তবে গভর্ণমেণ্ট কোনও কাযের সুবিধা করিতে পারেন না; সমবেত ভাবে আপনাদের দেশের কায করিতে হইলে কেবল গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা আর তাহা পূর্ণ অপূর্ণতার উপর মনকে আবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, চারিদিকের আব-হাওয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা, গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বুঝিয়া দেশের অবস্থাকে অনুকূল পথে পরিচালনা করা লোকমত গঠন করিয়া দেওয়াই সভা সমিতির প্রকৃত কার্য্য। এজন্যও ঐ সমবেত শক্তির সংযোজনারই প্রয়োজন, তাই আমি বার বার বলিলাম এবং আমার প্রধান কথা আপনারা সমবেত ভাবে—সমবেত শক্তিতেই যেন সকল কায করিতে চেষ্টা করেন।

দৌলৎপুরে আর একটি সভায় সভাপতির কার্য্য করিবার জন্ম মজুমদার মহাশয় সভার কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারায় গোবরডাঙ্গার নবীন জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আসন প্রদান করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। জগৎ বাবুর আসন গ্রহণ সম্বন্ধে "তাম্বুলী-সমাজ" পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

জগৎবাবু অল্প কথায় যাহা বলেন, তাহাতেই সমিতির প্রতি তাঁহার এরূপ আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পায় যে, তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমিতির একান্ত হিতৈষী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল, দণ্ডায়মান হইয়া ধন্যবাদচ্ছলে—সাশ্রুনয়নে আবেগময়ী ভাষায় যাহা বলেন, তাহার ভাবার্থ এই

যে, আজ সমিতির ক্রোড়ে ধনী-দরিদ্রের অপূর্ব্ব নবীন মিলন-ছবির পূর্ব্বাভাস দেখিয়া আজ আর কোন নিরাশার কথা মনে হইতেছে না।

ইতিমধ্যে সম্পাদক কর্ত্তৃক সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়। তাহাতে সমিতির জন্মকথা, উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং আলোচ্যবর্ষে সমিতি কর্ত্তৃক বিবিধ অনুষ্ঠানাদির বিবরণ প্রদর্শিত হয়।

অতঃপর উপস্থিত সভ্যগণের বক্তৃতা হইয়া প্রথম দিবসের কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিবস

এ দিনে সমিতির অপ্রত্যাশিত-হিতৈষী অভ্যাগত বাবু পীযুষকান্তি ঘোষ মহাশয়কে সভাপতির আসনে বসাইতে পারিয়া সমিতির বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু তিনিও শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে আসন প্রদান করেন। তাহাতে শেষ দিনের কার্য্যও অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

প্রথমেই অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয়ের মুদ্রিত অভিভাষণটি পঠিত হয়। তাহাতে তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও সমিতির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ আদ্যন্ত পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

তৎপরে কয়েকটি কার্য্যকরী প্রস্তাব আলোচিত এবং গৃহীত হয়। তন্মধ্যে কুশদহের ২৩৮ খানি গ্রামে, এক বা ততোধিক গ্রাম লইয়া সমিতির 'শাখা' স্থাপন করা। দ্বিতীয় সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে প্রচার করা। তৎপরে সমিতির নাম রেজেষ্টারি করিয়া সাহায্যভাণ্ডার স্থাপন—ক্রমে যৌথাকারবারের পত্তন ইত্যাদি বিষয়গুলির সঙ্গে স্বাস্থ্য, শিক্ষাদির বিষয়ও হস্তক্ষেপ করা হইবে।

তৎপরে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বক্তৃতা করেন। বক্তাগণের মধ্যে কেহ বলেন, অগ্রে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, কেহ বলেন, দেশের মধ্যে অর্থদানে কুণ্ঠিত নহেন এমন ব্যক্তি অনেক আছেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় লোকক্ষয় হইতেছে, আগে স্বাস্থ্যের উপায় বিধান করা হউক,—লোকে বাঁচিলে সকল প্রয়োজন হইবে।

কেহ বলেন, শিক্ষা না হইলে সাধারণে স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষা ও পালন করিতেই পারে না, অতএব শিক্ষা বিস্তারই অগ্রে প্রয়োজন। এইরূপে এই মহা সম্মিলনে যিনি যাহা বলেন, সমস্তই সমিতির আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের অনুকূলে —পৃথক্ পৃথক্ দিক মাত্র।

...সমিতিকে এই এক বৎসরের শিশু জীবনে—প্রথম বার্ষিক ... কেন্দ্রকে এই মহাসম্মিলনে যেটুকু জীবনীশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আগামী বৎসরে যাহাতে নবভাবে নবোদ্যমে সমিতির মহান্ ... দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া সকলে একপ্রাণ হইয়া কায করিতে পারেন, বিধাতার চরণে তাহাই সকলের একান্ত প্রার্থনার বিষয় হওয়া উচিত।

অবশেষে আর দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—প্রথম একটি আনন্দের কথা এই যে, এই সভায় বোঁজা নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ... মহাশয় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা এবং বেলেডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় একটী রাস্তার জন্য বিনামূল্যে জমি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আর ইতিপূর্ব্বে মাটিকোমরা নিবাসী বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্বগ্রামে একটি স্কুল স্থাপনের জন্য যে, ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত হয়।

দ্বিতীয় বিষয়, সভা অধিবেশনের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়কে ইছাপুরের ভগ্ন-স্কুল গৃহ ও জঙ্গলাবৃত পথ ঘাট দেখানো হয়। তিনি সভাস্থলে স্কুলের দুরাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এই স্কুলের জন্য সকলের কিছু কিছু সাহায্য করিয়া স্কুলটীকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; তাহাতে তখনই সভাস্থলে ৩৫৲ টাকা চাঁদা নগত পাওয়া যায়।

অবশেষে সমিতির উদ্যোক্তা, অক্লান্তশ্রমী এবং সাহায্য সহানুভূতিকারী দাতা হিতৈষীগণ হইতে বালক ভলাণ্টিয়ার বৃন্দকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আরও স্বীকার করিতেছি যে, দুই দিবস সভা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" যে জল যোগের ব্যবস্থা সমিতি করিয়াছিলেন (যথা—লুচি, আলুর দম্, সন্দেশাদি মিষ্টান্ন, চা ও ফল মূল) তাহা বাস্তবিক তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল।

পরে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয় তাঁহার ...পুরের বাটীতে পরিচারকবর্গ সহ অভ্যাগত সভ্যগণের জন্য অন্ন, জল, শয্যাদি, পর্য্যন্ত যে সকল আয়োজন রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সমিতির ... ভক্ত ব্রজবাবুকে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব জানি না।

ফাল্গুন মাসের কার্য্যবিবরণী

ঈশ্বর কৃপায় সমিতির প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন কার্য্য ...

[illegible]

নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রথম বৎসরের সদস্য ৬ জন এবং পুরাতন ৬ ছয় জনের স্থলে নূতন ছয় জন ভোট দ্বারা মনোনীত হইয়া ঐ ১২ জনের পদ পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ লইয়া মোট ১৫ জন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য আছেন।

পুরাতন সভ্য শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কুশদহ সম্পাদক— যোগীন্দ্র নাথ কুণ্ডু, নীলাচল মুখোপাধ্যায় বি-এল, নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল নূতন সভ্য শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (জমিদার) চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙ্গা), চারুচন্দ্র ঘোষ (খাঁটুরা); নসীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (মাটিকোমরা), হরিদাস মুখোপাধ্যায় (গৈপুর) এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল (খাঁটুরা)। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-বি; সহকারী সম্পাদক জুড়নজীবন মুখোপাধ্যায় এম-এস্ সি এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগোপাল দত্ত (খাঁটুরা)।

৬ই ফাল্গুন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশন হয়, তাহাতে ব্রজকিশোর বাবুর পুত্রের মৃত্যু জন্য এ দিনের কার্য্য স্থগিত থাকে।

২৬শে ফাল্গুন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আর একটি অধিবেশন হয় তাহাতে (১) সহায়নারায়ণ বাবুর প্রদত্ত টাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ। (২) ফুলতলা ও গোপোল ময়না গ্রামবাসীগণের জলকষ্ট জন্য আবেদন পত্র পাঠ। (৩) সমিতির পৃথক কার্য্যালয় স্থাপনের বন্দোবস্ত এবং সমিতির মুখপত্র রূপে "কুশদহ পত্রিকা" পরিচালনা সম্বন্ধেও আলোচনা।

১১ই ফাল্গুন বেড়গুম গ্রামে সমিতির একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে যোগীন্দ্রবাবু ও নীলাচলবাবু বেড়গুম গমন করিয়াছিলেন। তথাকার তরফদার ছাহেব প্রমুখ গ্রামবাসীগণ একটি স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

৩০শে ফাল্গুন রামমোহন লাইব্রেরীতে মাসিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এদিনে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগোপাল দত্ত সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাবিত বিষয়গুলি গৃহীত হয় ও তন্মধ্যে জলকষ্ট সম্বন্ধে ফুলতলা ও গোপোল-ময়না গ্রামবাসীগণের নিকট পত্র লিখিয়া তথ্য সংগ্রহ ও 'কুশদহ পত্র' পরিচালনা, অন্যান্য আরো কতকগুলি পূর্ব্ব আলোচিত বিষয় পত্র লেখার ব্যবস্থা করা হয়।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে কত যুবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তাহাতে কত পুত্রশোকাতুরা জনক জননীর হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে—কত নবোঢ়া বধূর নীরব অশ্রুপাতে এবং আত্মীয় স্বজনের হা-হা কারে আমাদিগকে ব্যথিত হইতে হইয়াছে। কর্ত্তব্য-বোধে এই সকল শোক-সংবাদও পত্রস্থ করিতে হইতেছে।

আমরা হঠাৎ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি যে, গত ৫ই ফাল্গুন গৈপুরনিবাসী আমাদের পরমবন্ধু স্বদেশভক্ত—কুশদহ-সমিতির অকৃত্রিম হিতৈষী শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয়, তাঁহার কলিকাতার বাটীতে তদীয় তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথকে হারাইয়া শোকে অধীর হইয়াছেন। পুত্র শোকাতুরা জননী ধরাশায়িনী হইয়া আছেন। ভ্রাতৃগণ এবং আত্মীয়বর্গ হা-হাকার করিতেছেন, অল্পকাল মাত্র উপেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল, আজও সন্তানাদি হয় নাই; এমত অবস্থায় বধূমাতাটির বা কি প্রবোধ আছে। কিন্তু উপায় কি? আমরা এই সংসারে নিয়ত নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে চাই—তাহা ত হইবার নয়, ধন জন, সুখ স্বাস্থ্য—এদেরকে আমরা যতই ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চাই ততই তাঁহারা আমাদের হাত হইতে সরিয়া যায়। যাহা ক্ষয়শীল—ক্ষণস্থায়ী তাহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? শোকে তাপে যখন হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে, তখন আমরা সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারি। এ সংসার আমাদের চিরদিনের জন্য নয়,—বিষয় সুখও চরম সুখ নয়, এ ভাব তখনই প্রাণে জাগিয়া উঠে। প্রাণ তখন যেন এমন বস্তুই চায় যাহা আমার চির দিনের সম্বল হইতে পারে। কোথায় গেলে এ প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারি? ভগবান্ পরলোকস্থ আত্মার সদ্গতি ও শোকার্ত্তের সান্ত্বনা দান করুন, ইহাই তাঁহার চরণে আমাদের ভিক্ষা।

গোবরডাঙ্গার প্রায় দুই ক্রোশ পূর্ব্বাংশে দেয়াড়া নামক স্থানে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথমে একটি মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা মাঘী-পূর্ণিমা হইতে প্রায় পক্ষকাল স্থায়ী হয়। ইহাকে সাধারণে চৈতন-দেয়াড়ার মেলাও বলে। হয়দাদপুরের বসু মল্লিক জমিদার বাবুর এলাকায় এই মেলার স্থান।

সুতরাং তজ্জন্ত তথায় তাঁহাদেরই শান্তিরক্ষা ও অন্যান্য ব্যবস্থা বন্দোবস্তও করিতে হয়। অবশ্য তাহাতে কিছু আয়ও আছে, ব্যয়ও আছে। যাহা হউক এই মেলার প্রকৃত মূল ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও যখন এই গুবরদাদপুর, মুন্সী হবিবল হোসেন ছাহেবের জমিদারী ছিল, তখন হইতেও এই মেলা চলিয়া আসিতেছে। নানা কারণে কুশদহের প্রাচীন ইতিহাসে যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামাঙ্ক দেখা যায়, তদ্রুপ মুসলমান ধর্ম্মের চিহ্নও কম দৃষ্ট হয় না। এই মেলা ঠাকুরবর ছাহেব প্রমুখ ব্যক্তি দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হউক বা অন্য কোনও ফকির—দরবেশ কর্ত্তৃক হউক, ইহা যে মুসলমান সাধু ফকিরের চিহ্ন তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। যাহা হউক, কালের স্রোতে এই মেলা প্রায় একই ভাবে বহুকাল চলিয়া আসিতেছে, এক্ষণে ইহার ভিতর নূতনভাবে কিছু জনহিতকর কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিলে বোধ হয় মেলাটির আরো উন্নতি ও তন্মধ্যে শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। জমিদার গুণেন্দ্র বাবু ও তাঁহার উদ্‌যোগী কর্ম্মকর্ত্তা শশধরা বাবু ইচ্ছা করিলে এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা করিতে পারেন, যথা—ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা ম্যালেরিয়া বীজাণু ও মাছি মশা প্রভৃতি বীজাণু হইতে অন্যান্য সংক্রামক রোগ কিরূপে প্রসারিত হয় এবং সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, কৃষি শিল্পের উন্নতিপথ প্রদর্শন, এবং সহজ বোধগম্য অন্যান্য সাধারণ হিতকর বিষয়ের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লইয়া সাধারণের মধ্যে কিছু প্রচারের ব্যবস্থা, কুশদহ-সমিতির দ্বারা এবং বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সাহায্যে অল্প আয়াসেই সাধিত হইতে পারে। তাঁহারা আগামী বর্ষে এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন কি ?

গত ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার মহাত্মা ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের পরলোক গমন দিন স্মরণার্থে কলিকাতা হইতে জনৈক প্রচারক লইয়া গিয়া খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা করানো হইয়াছিল। তৎপরে ১৭ই ও ১৮ই তারিখে যথারীতি না কি উৎসবও হইয়াছিল ; কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বের ন্যায় গ্রামস্থ অধিবাসীগণের মধ্যে আর তেমন করিয়া সংবাদ প্রচার দ্বারা সকলকে আহ্বান করা হয় না। ক্ষেত্রবাবুর তিরোধানে—অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মমন্দিরের আলোক এরূপ ভাবে নির্ব্বাণ হইয়া গেল কেন ; কলিকাতা নববিধান-ব্রাহ্ম-সমাজ তাহার অনুসন্ধান লইবেন কি ?

মহাত্মা ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় জীবিতকালেই তাঁহার আত্ম-জীবনী লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর ঐ লিখিত বিবরণ সাহায্যে ১৩২২ সালের 'কুশদহ' পত্রিকায় তাঁহার একখানি ফটো সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, ঐ লিখিত জীবনী একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে এই মাত্র জানা যায় যে, কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট হইতে মঙ্গলগঞ্জ মিসনপ্রেসে, মুদ্রিত ও কে, পি, নাথ দ্বারা ঐ পুস্তক প্রকাশিত। তদ্ভিন্ন কাহার যত্নে বা চেষ্টায় এই জীবনীখানি প্রকাশিত হইল তাহার কোনো উল্লেখই নাই। পুস্তকখানির কোনো মূল্যও লিখিত নাই; বিনামূল্যে বিতরিত এ কথাও লেখা নাই। অর্থাৎ যদি কুশদহবাসী বা অন্য কোনো ভদ্রলোক এই জীবনী পুস্তক একখানি আবশ্যক মনে করেন, তবে তাহা সাধারণতঃ পাইবার উপায় নাই। অবশ্য আমরা লোক মারফতে বিনামূল্যে একখানি ঐ পুস্তক পাইয়াছি. কিন্তু প্রেরকের নাম নাই। দ্বতীয় কথা পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কণ কালে পুরাতন লিখিত বিবরণ মধ্যে স্বভাবতঃ কিছু সংশোধন করিবার ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের মধ্যে এমন প্রজ্ঞাবান ঋষি-কল্প ব্যক্তির মুদ্রিত জীবনচরিতে কোথাও একছত্র মন্তব্য নাই—ইহাতে তাঁহার একখান চিত্র দেওয়া কিছুই অসম্ভব ছিল না, ফলতঃ কেবল অনবধানতা অজ্ঞতা বশতই এরূপ শ্রীহীন ভাবে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্য আমরা অতীব দুঃখিত হইলাম।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, খাঁটুরা নিবাসী বদান্যবর বাবু সহায়নারায়ণ পাল মহাশয় তাঁহার দেওঘরস্থ নব-নির্ম্মিত আলয়ে গত ২২শে ফাল্গুন শুভ প্রবেশ উপলক্ষে তথায় সপ্তাহকালব্যাপী এক উৎসব বিশেষের আয়োজন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার দেশবাসী আত্মীয়স্বজনগণ দেওঘর গমন করিয়াছেন। অনুষ্ঠান পত্র দৃষ্টে জানা যায় যে, প্রথমাংশে দিবসত্রয় ধর্ম্মাঙ্গ—যথা ভক্ত প্রবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ভাগবত ব্যাখ্যা, পরে নাম সংকীর্ত্তনাদি হইবে। তৎপরে কর্ম্মাঙ্গ—যথা তদ্দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণভোজন, ভদ্র মহোদয়—বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়বর্গের প্রীতি ভোজন। তদ্ভিন্ন কাঙালী ভোজন ও কুষ্ঠাশ্রামের সমস্ত রোগীদিগকে আহার্য্য দান ইত্যাদি। সম্প্রতি সহায়নারায়ণ বাবুর ধর্ম্ম-

কর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, ঈশ্বরকৃপায় তিনি আরো কিছুকাল ইহ জীবনে দীর্ঘজীবী হউন এবং সৎপথে আরো তাঁহার অর্থাগম হউক, বিশেষ আরো আহ্লাদের কথা এই যে তিনি আপনাকে 'দাস' জ্ঞানে এই সকল কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; আমরাও ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন সত্য সত্যই "দাস" পদবাচ্য হইয়া দেশের এবং দশের সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

সম্পাদকের নিবেদন

গতবারে কুশদহ সম্পাদকের নিবেদন প্যারেগ্রাফের সংবাদ পাঠ করিয়া, ব্যক্তিগত পরিচালিত "কুশদহ" প্রচার বন্ধ হইবে জানিয়া অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা অবশ্য কুশদহ পত্রিকার প্রতি কুশদহবাসীর অনুরাগের পরিচয়। এবং ইহা কুশদহ-সম্পাদকের পক্ষেও পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কুশদহ-সম্পাদক আনন্দের সহিত বিশ্বাস করিতেছেন যে, কুশদহ-সমিতি হইয়া "কুশদহ" প্রচারের কথঞ্চিৎ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে. কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য সফল হইলে তাহার আর কার্য্যকরী শক্তি থাকে না—স্বভাবত তাহার তিরোধান হয়; এই জন্যই এ ব্যক্তিগত প্রচারিত কুশদহ বন্ধ হইতেছে। দ্বিতীয় কথা, এখন সমিতির একখানি মুখপত্র আবশ্যক, নতুবা সমিতির আদর্শ উদ্দেশ্য ও কার্য্যবিবরণী সাধারণে কিছু জানিতে পারিবে না, এবং সমবেত শক্তিকে সহজে কেন্দ্রীভূত করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। অথচ নূতন একখানি কাগজ বাহির করা সমিতির পক্ষে বহু আয়াসসাধ্য। কিন্তু এই দশ বৎসরের পরিচালিত পত্রিকার সূত্র ধরিয়া কাগজ পরিচালনা আরম্ভ করিলে শিশু সমিতির পক্ষে অনেকটা সহজসাধ্য হইবে। আরো কথা এই যে, ঐ ব্যক্তিগত পরিচালিত পত্রিকা বন্ধ না করিলে, সমবেত ভাবে পরিচালিত সমিতির মুখপত্রখানি ফুটিয়া উঠিতেই পারে না। তাই কুশদহ সম্পাদকের পুনরায় এই নিবেদন যে, যাহাতে সমিতির দ্বারা উপযুক্তরূপে অক্ষুন্নভাবে পত্রিকাখানি পরিচালিত হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া এবং সাহায্য করা আবশ্যক।

এই মাঘ ফাল্গুন সংখ্যাখানি বাহির হইতেও অযথা বিলম্ব হইল, এখনও চৈত্র সংখ্যা আর একখানি বাহির হইবে। বোধ হয়, আগামী বৈশাখের অর্দ্ধেকের কমে হইবে না।

কুশদহ-পল্লী

—০—

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

(অঃ প্রাঃ এসিঃ ইনেঃ স্কুলস্)
মাটীকোমরা

গতবারে প্রকাশিত মুখোপাধ্যায় বংশাবলীর মধ্যে ৺মনোহর মুখোপাধ্যায়ের এক পুত্র গুরুপ্রসাদের বংশাবলী উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গুরুপ্রসাদের আর চারিটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, যথা—বলরাম, রামকানাই, তিলকরাম, ও রামচাঁদ। ৺মনোহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ইছাপুরের ৺শ্যামচাঁদ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে বিবাহ সূত্রে মাটীকোমরায় বাস করেন।

উক্ত চারি ভ্রাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের তিন পুত্র—হরপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদ; তন্মধ্যে হরপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ সহোদর; চণ্ডীপ্রসাদ বৈমাত্রেয়। হরপ্রসাদের একমাত্র পুত্র,—

৺ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়।

ইঁহার তিন বিবাহ। প্রথমা পত্নী খাঁটুরার সুবিখ্যাত কথক ৺রামধন শিরোমণির ভ্রাতা ৺উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা স্বর্গীয়া প্রসন্নময়ী দেবী।

দ্বিতীয়া পত্নী—যশোহর সাঁওতাগ্রামের বন্দোপাধ্যায় বংশের কন্যা ছিলেন।

তৃতীয়া পত্নী—ধর্ম্মপুরের ৺রামপ্রাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, স্বর্গীয়া বরদাসুন্দরী দেবী।

প্রথমা পত্নীর পাঁচ পুত্র, যথা—রাজেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, হারাণচন্দ্র, নন্দলাল ও রাসবিহারী এবং একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

দ্বিতীয়া পত্নীর একমাত্র পুত্র ৺মহেন্দ্রনাথ। ইনি গোবরডাঙ্গার দেওয়ানবাটীর মুন্সেফ ৺রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা স্বর্গীয়া তরঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হন।

তৃতীয়া পত্নীর পুত্র,—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

৺রাজেন্দ্রনাথের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী, হুগলি গোঁদলপাড়া নিবাসী ৺অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা আদরিণী দেবী, (তিনি) এক্ষণে কাশীধামে বাস করিতেছেন। দ্বিতীয়া পত্নী, নদীয়ার ঘেঁটুগাছী নিবাসী ৺উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা স্বর্গীয়া গিরিবালা দেবী। ইঁহারা উভয়েই নিঃসন্তান।

৺যোগেন্দ্রনাথের পুত্র ৺হরিদাস ও ৺বসন্তকুমার। ইহারা চৌবেড়িয়ার ৺দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। হরিদাস, গোবরডাঙ্গার দেওয়ান বাটীর

৺উত্তমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবীকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হন। বসন্তকুমারও অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগত হন।

৺হারাণচন্দ্রের পত্নী—ছয়ঘরিয়া নিবাসী ৺রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী। ইঁহার একটি মাত্র দৌহিত্রী শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী। ইহার স্বামী, ইছাপুরের ৺ননীগোপাল চৌধুরী।

৺নন্দলালের পত্নী, কোটামদনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী মহামায়া দেবী। ইনি নিঃসন্তান এক্ষণে কাশীধামে পিতার নিকট বাস করিতেছেন।

৺রাসবিহারীর দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী, ছয়ঘরিয়া নিবাসী ৺অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা স্বর্গীয়া রাজলক্ষ্মী দেবী। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এল। ইনি বনগ্রামে ওকালতি করিতেছেন। দ্বিতীয়া পত্নী খুলনা জেলার ঘাটভোগ গ্রাম নিবাসী ৺কটীকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সুমতি দেবী। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ কলিকাতা মেট্রপলিটান্ কলেজে আই, এস, সি, অধ্যয়ন করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী রাণাঘাট নিবাসী সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, স্বর্গীয়া নির্ম্মলাবালা দেবী। ইঁহার একটি বালক পুত্র শ্রীমান্ অশোককুমার। দ্বিতীয়া পত্নী হরিনাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী। ইঁহার তিনটি বালিকা।

কেদারবাবুর দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী—যশোহর পাটসীমলা নিবাসী ৺সনাতন বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা স্বর্গীয়া কাদম্বিনী দেবী। ইঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল ইনি প্রায় ৬।৭ বৎসর ছোট আদালতে ওকালতি করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিঃভূষণ মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং একমাত্র কন্যা পরলোকগত মৃণালিনী দেবী। ইঁহার স্বামী, যশোহর আকাইপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি এক্ষণে বগুড়ায় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

নিশি বাবুর পত্নী—খুলনা জেলার ঘাটভোগ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবী। ইহার বর্ত্তমানে তিন পুত্র ও এক কন্যা।

কেদারবাবুর দ্বিতীয়া পত্নী—ছয়ঘরিয়া নিবাসী ৺ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা স্বর্গীয়া ননীবালা দেবী। ইঁহার একটি মাত্র অবিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রীসুন্দরী দেবী।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮১ সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"তোমার জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব"

দশম বর্ষ | চৈত্র, ১৩২৫ | দ্বাদশ সংখ্যা

সঙ্গীত

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সঙ্গীত। একতালা।

দাসের কিছু নাহি বাঞ্ছা আর :
প্রভুর প্রেমানন, প্রসন্ন বদন, করে প্রাণে নব জীবন সঞ্চার।
হইল কৃতার্থ ওহে দীননাথ,
এ পাপ জীবন সেবি তব পদ,
নাহি প্রয়োজন, অন্য কোনো ধন,
চির দাসত্বই আমার প্রচুর পুরস্কার।
হরিবোল বোলে ও চরণ তলে,
অসুত্যাগ যেন হয় অন্তিম কালে
এই হে মিনতি, ওহে বিশ্বপতি,
"বেশ হ'য়েছে" মুখে বোলো একটি বার।

(ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে)

বিদায়

—:*:—

শব্দে ও ভাবে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। তথাপি একই শব্দে একই ভাব উৎপন্ন করে না। অবস্থা ভেদে একই শব্দ হইতে পৃথক ভাবের উদ্রেক হয়।

আজ যে ভাবে "বিদায়" শব্দটি লইয়া কুশদহ-সম্পাদক দেশবাসীর নিকট উপস্থিত, বোধ হয় দেশবাসী সে ভাবে ঐ শব্দ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। সম্পাদক আজ আনন্দের সহিত বিদায় চাহিতেছেন, কিন্তু দেশবাসী তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। মানব-হৃদয়াভ্যন্তরে—ভাবজগতে এ কি রহস্য।

সম্পাদকের আনন্দের কারণ "কুশদহ" প্রচারের সফলতায়, দেশবাসীর নিরানন্দের কারণ কাগজখানি বন্ধ হইবার আশঙ্কায়। উভয় হৃদয়েই সদ্ভাব বিদ্যমান—সুতরাং সত্য আছে। ইহাও সম্পাদকের আনন্দের কারণ। সত্যের পরিনাম কখনই অশুভ হইতে পারে না। সত্যই মঙ্গলের কারণ—সত্যই আনন্দের আকর—সত্যই সর্ব্বথা পূর্ণতা দান করে।

এ বিদায় বিনাশের বিদায় নয়—অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দানের জন্য। যিনি এতদিন কৃপাস্পর্শ দিয়া অযোগ্য দাসের দ্বারা এই ব্রত পালন করাইলেন, আজ তাঁহারই ইঙ্গিতে এ বিদায়ের সূচনা হইয়াছে।

যে শক্তি এতদিন একাকী ছিল, আজ সমিতি যোগে তাহা বহুর মধ্যে, বহুর সহিত মিলিয়া—বিশেষ ভাবে বহুর বেদনা বহিয়া বিকাশ লাভ করিতে চাহিতেছে। যে শক্তি বহুর সঙ্গে মিলিবার জন্য বীজাকারে একাকী কাষ করিতেছিল, আজ তাহা বহুর ভিতর অনুপ্রবিষ্ট দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া আত্ম-ত্যাগ আত্ম-গোপন করিতে চাহিতেছে। আত্মগোপনের অর্থ—বহুর সঙ্গে মিলিয়া আবার নূতন মূর্ত্তিতে জন্ম পরিগ্রহ করিবার প্রয়োজন। দাসের ভাগ্যে তাহা কি সম্ভব হইবে? জানি ভগবানের সে দয়া আছে; কিন্তু বন্ধুগণ—আমার দেশবাসী প্রিয় স্বজন মণ্ডলী, আপনারা কি সহায় হইবেন না? আসুন ক্ষুদ্রতাকে বিদায় দিয়া বিশালতাকে হৃদয়ে লইয়া সকলে এক হৃদয় হইবার জন্য আবার নূতন ভাবে নবাকারে কার্য্য আরম্ভ করি। সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

প্রায়শ্চিত্ত

—o—

ষড়বিংশ

বৈশাখের আকাশে কড় কড় করিয়া নূতন মেঘ ডাকাডাকি করিয়া দিগ্বিদিক চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে উত্তর কোণের কাল মেঘ সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। আসন্ন বৃষ্টি পাতের লক্ষণ দেখিয়া ছেলে মেয়ের দল আনন্দ কোলাহলে সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে," দেখিতে দেখিতে চড় চড় করিয়া শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ছেলে মেয়েরা, মাতামাতি করিয়া শিল কুড়াইয়া আমোদের সহিত খাইতে লাগিল। তারপর মূষল ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল। অদূরবর্ত্তী আদি অন্ত হীন সমুদয় দৃশ্য বৃষ্টি ধারায় চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন কোথায় মুছিয়া গেল।

রতিকান্ত শয়ন গৃহের জানালার ধারে বসিয়া এ সকল দেখিতেছিল, আর অকূল চিন্তা সাগরে ভাসিতেছিল। নিজের বন্দী দশার কথা সে ভাবিতেছিল, চির নির্ভীক, চির স্বাধীন প্রকৃতি রতিকান্ত কাহারও আদেশ ব্যতীত কোনও কিছু করিবে না, এক পা কোথাও নাড়িতে পাইবে না, সে ভ্রমক্রমে একটা অন্যায় করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে দোষের—সে ভ্রমের কি আর মার্জ্জনা নাই? এই পৃথিবীর নিষ্পেষণ, নির্ম্মম বিচার! দোষ অপেক্ষা শাস্তি শতগুণে ভীষণ।

অভিমানে ঘৃণায় যুবকের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার জন্য সশঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন, না, রতিকান্ত কাহারও গলগ্রহ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে না, সে সকলকেই মুক্তি দিবে। কিন্তু কেমন করিয়া? এ বিশাল বিশ্বের বক্ষে তার তো এক পা নড়িবার ক্ষমতা নাই? তবে ইহার বাহিরে যদি কোনো দেশ থাকে সেইখানে যাওয়াই মুক্তিযুক্ত, অর্থাৎ আত্মহত্যা।

রতিকান্ত শিহরিয়া উঠিল, কাপুরুষের ন্যায় আত্মহত্যা? কি ভীষণ কল্পনা। সে যে বড় আশা করিয়াছিল, যুদ্ধে যাইবে, অসীম সাহসিকতায়, অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনে, নিজের ললাটের কলঙ্ক কালিমা মুছিয়া ফেলিবে; যশোলক্ষ্মী আবার স্নেহ ভরে তাহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিবে। সে যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয়, সে মৃত্যু বীরের বাঞ্ছনীয় মৃত্যু, বীরের শয্যায় শয়ন করিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ

কিন্তু রতিকান্তর সে আশায়ও বাজ পড়িয়াছে। হায় হায়,সে যে আজ কাহারও বিশ্বাসের পাত্র নয়।

অল্পক্ষণ পরেই বৃষ্টির বেগ প্রশমিত হইল, দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি একেবারে থামিয়া গেল, আকাশ পুনরায় পরিস্কার হইয়া সূর্য্য কিরণ ফুটিয়া উঠিল। তখন সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নাই, পশ্চিম কোনের মেঘপুঞ্জগুলি অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ কিরণচ্ছটায়, কত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অতি চমৎকার শোভা ধারণ করিল।

রতিকান্ত মনে মনে কহিল আমার জীবনের মেঘরাশি কি এমনি কোরে আবার একদিন কেটে গিয়ে সৌভাগ্যের সোণার রঙে ঝল মল কোরে উঠবে না? আশা তো হয় না. অন্ততঃ সে ধৈর্য্য আর আমার নেই। আমার জন্যে সব চাইতে কষ্ট পাবেন মা, কিন্তু সময়ে তাঁর ও সে কষ্ট সহ্য হয়ে যাবে, তাঁর তো আরও দুটি ছেলে আছে। আমার জন্যে এ রকম দিন রাত্রি উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন, তা থেকে তাঁকে আমি পরিত্রাণ দিতে চাই। আমি বিবাহ করিনি, সুতরাং এমন একটি জীবন আমি রেখে যাচ্ছি না, যার সমস্ত কিছুই আমার অভাবে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে, আমাকে হারিয়ে যার জীবনের আর কোনো মূল্য থাকবে না, শুধু অভিশপ্ত একটা জন্ম তাকে আজীবন সংসারের পথে টেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, না, সে রকম কিছু করাও হবে না।

ললিতার কথা এই সময়ে রতিকান্তর স্মরণ হইল, হাঁ, ললিতাকেও সে একেবারে মুক্তি দিয়া যাইবে, অভাগিনী নারী সত্যই যদি প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে, রতিকান্তর অস্তিত্ব যখন পৃথিবী হইতে চিরতরে লোপ পাইবে, তখন সম্ভবতঃ তাহার সে চেষ্টা সফল হইবে—কালের তো নিয়মই এই। অমিতা তাহাকে অনেক রকম আশ্বাস দিয়া উৎসাহ বাণী শুনাইতেছে সত্য, কিন্তু সে সংসার অনভিজ্ঞা বালিকা কেমন করিয়া রতিকান্তর অন্তর্বেদনা ও নিগূঢ় মর্ম্মদাহের জ্বালা অনুভব করিতে পারে? কিন্তু ধন্যবাদ তার স্নেহ মমতা সহানুভূতি পূর্ণ নারী হৃদয়কে।

এইবার রতিকান্ত ভাবিল, যদি মৃত্যুর পর আবার জীবন থাকে—কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার মন বিরক্তিতে পূর্ণ হইল, দূর হউক পরজন্মের কথা, হাতে পাইয়া এমন দুর্লভ মানব জন্ম, যখন এমন করিয়া বিফল হইয়া গেল, তখন

কোথায় আবার সেই অনির্দ্দিষ্ট পরজন্মের কথা। রতিকান্ত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল. আবার কি ভাবিয়া টেবিলের সম্মুখে বসিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল. সহসা চক্ষে জল ধারা বাহিয়া গেল, তারপর দুই-খানি কাগজে চিঠি লিখিল। এই সময় ছোকরা চাকর নিমু আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, মা জিজ্ঞেস করছেন রাতে আপনি কি খাবেন।

রতি কহিল, শুধু দুধ খাব, আজ আমার শরীর ভাল নেই, এই চিঠিখানা ডাকে দিয়ে আয় দিগি, খুব শীগ্‌গীর, বুঝলি ?

নিমু চিঠি লইয়া চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে চিন্তামণি যখন সকলকে আহারাদি করাইয়া, রতিকে দেখিতে আসিলেন, জানালা দিয়া দেখিলেন, মশারির মধ্যে রতিকান্ত অঘোরে ঘুমাইতেছে, উহাকে আর না জাগাইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন। তিনি জানিলেন না, তাঁহার অকৃতজ্ঞ, অপরিণামদর্শী পুত্র তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিবার ছলে, কি ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে তাঁহাকে চির জীবন, দগ্ধ করিবার জন্য, হতভাগ্য, বিকৃত মস্তিষ্ক যুবক আজ বিষ পানে কোন্ মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে।

সপ্তবিংশ

ছিন্ন কদলীর ন্যায় চিন্তামণির চৈতন্য হীন দেহ ধূলাবলুণ্ঠিত, আত্মীয়, স্বজন—দাস দাসী পর্য্যন্ত সকলের আর্ত্তনাদে চারিদিক প্রকম্পিত। উমাকান্ত, সতীকান্ত বৃদ্ধ পিতার কম্পিত দেহ, কম্পিত হস্তে ধরিয়া রহিয়াছে, শান্ত প্রভাত বায়ু, শান্ত প্রাতঃকালটি, বিরাট শোকের হাহাকারে আজ পরিপূর্ণ। অশ্রুহীন, নিস্পলক নয়নে হরদাদা রতিকান্তর শেষ পত্রখানির দিকে চাহিয়া আছেন, রতিকান্ত লিখিয়াছে ;—

"মা, আমার স্বর্গাদপী গরীয়সী মা, আমার স্নেহময়ী মা ; মৃত্যু সময়ে একবার প্রাণভরে এ অমৃতমাখা মা নাম উচ্চারণ কোরে নিই। আজ মরবার সময়েও আমার এই প্রার্থনা, যদি আবার এই পৃথিবীর বুকে জন্ম নিই, তা হোলে যেন মা, তোমার কোলেই জন্মাই। তোমার স্নেহ সুধা এতদিন পান কোরেও আজও আমার অন্তর তৃপ্ত হয় নি ; তবে কেন সাধ কোরে তোমার কোল ছেড়ে যাচ্ছি ? আমি কি জানছি না, আমার শোকে তোমার বুকে কি ভীষণ বজ্রাগ্নি জ্বলে উঠবে। আমার বাবা আমার এ শোচনীয় মৃত্যুতে কি মর্ম্মভেদী বেদনায় অবসন্ন হয়ে পড়বেন, দাদারা আমার

জন্যে কত কাতর হবেন, আর হরদাদা, যিনি আমাকে তাঁর বুকের একখানি হাড়ের মত মনে করেন, তাঁর ব্যথাও আমি কল্পনা কোরতে পারছি না, কিন্তু তবু আমি চলেছি। আমার এ চির বিদায়ের মূহুর্ত্তে জোড় হাতে তোমাদের সকলের কাছেই ক্ষমা চাইছি, আমায় ক্ষমা কোরো মা। আমার দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা কোরো, আমার এ পাপ ক্ষমা কোরো, নইলে আমার প্রেতাত্মার শান্তি হবে না। একে অপরাধের বোঝা নিয়েই পরপারে যাত্রা করলুম, কে জানে সে যাত্রার শেষ কি ?

আমি আর এ অভিশপ্ত জীবন বইতে পারলুম না, আমার মনের আর সে বল নাই,যার জোরে আবার আমি বুঝতে পারতুম,আমার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে পাবার চেষ্টা করতুম। যদি দিন কতক কোথাও চলে যেতে পারতুম, হয় তো সময়ে মনের জ্বালা লাঘব হোয়ে প্রকৃতিস্থ হতুম, কিন্তু সহস্রের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এক মূহুর্ত্ত আমায় অজ্ঞাতবাস করতে দেবে না, এ পাহারার মধ্যে বাস করা আমার অসহ্য। আমি সংসারে সকলেরই অশান্তির কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছি, সাপে খাওয়া ফালের মত আমি আজ সবার পরিত্যক্ত, সকল কাজেরই অনুপযুক্ত।

আমার জন্য তোমার যে কত আঘাত পেতে হচ্ছে, তা আমি সব বুঝতে পারছি, আমার এ লাঞ্ছনা আমার চাইতে তোমায় যে কত বেশী বাজছে, তাই জেনে আমিও অস্থির হোয়ে উঠেছি। আমায় এখন এই ভয় হচ্ছে মা, যদি এ অবস্থায় আরও দিনকতক থাকি, তা হোলে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হবে, আর সে অবস্থায় আবার কখন যে কি এক নূতন উৎপাতের সৃষ্টি কোরে তোমাদের আরো বিপদগ্রস্ত কোরবো তার ঠিক্ নেই, সুতরাং আমার সরে পড়াই মঙ্গল। যদি তোমাদের কাউকে না বোলে, কোনো দেশে পালিয়ে যেতাম, তাতে আমাদের উভয় পক্ষ কেহই নিস্তার পেতো না, সুতরাং জড়দেহটাকে এখানে রেখে প্রাণটাকে নিয়ে চলে যাওয়াই শ্রেয়। তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম রেখে তোমার দুর্ভাগা রতিকান্ত তাই আজ নিরুদ্দিষ্ট মহাপ্রস্থানের পথের যাত্রীই হোলো, এ নির্ব্বোধ, হতভাগ্যকে ক্ষমা কোরো মা।"

পত্রখানির অক্ষরগুলি, স্থানে স্থানে লেখকের অশ্রুজলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে যে তার কতখানি বেদনার আভাস লেখনী মুখে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে, ইহা তাহারই পরিচয়। কে বলিয়া দিবে, আজ এই অপরিণামদর্শী রতিকান্তর শোচনীয় আত্ম হত্যার জন্য দায়ী কে ? নিদারুণ

নির্ম্মম প্রাক্তন, কি আর কিছু? হরদাদা স্তব্ধ ভাবে বসিয়া বুঝি ঐ কথাই ভাবিতে ছিলেন।

অষ্টাবিংশ

সকাল বেলা চায়ের টেবিলে বসিয়া, সংবাদ পত্রের নূতন খবর গুলি দেখিতে দেখিতে মহেশ বাবু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক ছোক্‌রা শেষ আত্মহত্যা করলে? কি শোচনীয় পরিণাম। এতটুকু moral corrage ছিল না, যাতে নিজের ত্রুটিটা সেরে নিতে পারত।

ললিতার হাত হইতে ঠন্ ঠন্ করিয়া চায়ের পেয়ালা ভূমিতে পড়িয়া গেল. অমিতা তখন ডাকের চিঠি হাতে লইয়া খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, উৎকণ্ঠিত ভাবে মহেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল. কার কথা বলছেন কাকামণি?

মহেশ বাবু কহিলেন. এই রতিকান্ত বেচারী আত্মহত্যা করেছে। এই পরশু রাত্রের ঘটনা. কি লিখছে পড়ি—ও কি. ললিতা যে পড়ে গেল। কি সর্ব্বনাশ, মূর্চ্ছা গেছে যে—জল—অমিতা জল।

আর অমিতা, সে নিজেই তখন ভূমিতে বসিয়া জড়ের মত নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে। জ্যাঠাইমা. খাকমণি দৌড়াইয়া আসিয়া ললিতার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। অমিতা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া কোলের উপর রতিকান্তর চিঠি খানি মেলিয়া বসিয়া রহিল. রতিকান্ত আত্মহত্যা করিয়াছে, এ সংবাদ অমিতার যেন বিশ্বাস হইতেছিল না।

কিছুক্ষণ চিঠিখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তারপর সে যেন ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, চিঠি খানি সংক্ষেপে অতি করুণ ভাষায় এইটুকু লেখা ছিল,—

অমিতা,

যখন আমার চিঠি তুমি পাবে, তখন পৃথিবী হ'তে কোন্ অজ্ঞাতরাজ্যে আমি চলে গিয়েছি জানবে। তোমরা আমায় কাপুরুষ ভাববে, সত্যই আমি তাই। জীবন সংগ্রামে আমি ভঙ্গ দিলুম। সকলের বিভীষিকার কারণ হোয়ে এ দুর্ব্বিসহ জীবনের ভার বইতে পারলুম না। পৃথিবীর কাছে আমার নিত্য নূতন অপরাধের তিল তিল বিচার আর শাস্তি আমার অসহ্য হোয়ে উঠেছিল, তাই পরলোকের যিনি বিচারক একেবারে তারই দরবারে বিচার

প্রার্থী হোয়ে চল্লুম। আমি জানি তুমি আমায় স্নেহ করো, আমার মৃত্যুতে তুমি মর্ম্মাহত হবে, আর একজনের কথাও আজ আমি অসঙ্কোচে উল্লেখ করছি. ললিতাও আমায় স্নেহ করে, সেও নিশ্চয় ব্যাথা পাবে, কিন্তু তোমাদের স্নেহের মর্য্যাদা আমি রাখতে পারলুম না. অযোগ্যকে তোমরা হৃদয়ের সহিত মার্জ্জনা কোরো। আর এ হতভাগ্যের দোষ ক্রটি গুলো একটু স্নেহের চক্ষে দেখে তার গুরুত্বকে কিছু লঘু মনে করতে চেষ্টা কোরো, এই আমার অন্তিমের একান্ত অনুরোধ।”

* * * *

তার পর? তার পর পুত্রহীন জনক জননীর মর্ম্মান্তিক শোকের কাহিনী বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। আর রতিকান্ত গত প্রাণ হরদাদা, তিনি মুনির মৃত্যুর পরে যেমন একবার ক্ষুদ্রদেশ ছাড়িয়া জগতের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ দীর্ঘকাল পরে, স্নেহের ধন রতিকান্তকে হারাইয়া একমাত্র হুঁকাটি হাতে করিয়া পুনরায় তেমনি করিয়া বাহির হইয়া পরিলেন, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ বয়সে সাধ করিয়া মায়ার বন্ধন আর গলায় পরিবেন না, এইবার একবার সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী প্রাণময় দেবতার চরণে নিজের সকল স্নেহ ভালবাসা উৎসর্গ করিয়া দিবেন, তাহা হইলে এমন করিয়া রাতারাতি আর তাঁহাকে দেউলিয়া হইয়া প্রাণের জ্বালায় হা-হাকার করিয়া বেড়াইতে হইবে না।

শ্রীসরসীবালা বসু।

সত্যাগ্রহ

কথা উঠিয়াছে কেবল বিদ্যা বুদ্ধি বলে দেশ উন্নত হইবে না—আত্মিক বল চাই। আত্মিক বলে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিরোধ না করিয়া উহা সহ্য করিতে হইবে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে একজন পূর্ণ আত্মিক লোক বলিয়াছিলেন, “তোমরা অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না,” কেবল মুখের কথায় নয়, তিনি পূর্ণ ক্ষমাশীল অন্তরে অত্যাচারীর হাতে জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধি ঐ কথাই বলিতেছেন, এবং জীবন দ্বারা তাহা নাকি পালন করিতেছেন; প্রাণে গভীর ধর্ম্মভাব এবং ভক্তি,

প্রীতির সঞ্চার না হইলে আত্মিকবল লাভ হয় না। কথিত আছে "প্রীতি তাবৎ বহন করে, তাবৎ বিশ্বাস করে, তাবৎ আশা করে, তাবৎ সহ্য করে।"

মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে ঐ ব্রত পালন করা সম্ভবপর হইতে পারে, কারণ বৈরাগ্যের পথ ধরিয়া তিনি আত্মার সাধন করিয়াছেন; হয়ত আত্ম-দর্শনও তাঁহার হইয়াছে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে বিনা সাধনে একটা সাময়িক ভাবের উত্তেজনা-উপবাসে কখনও কি আত্মিক বললাভ হয়?

তিনি নাকি এ কথাও বলিতেছেন, "যাহারা অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবে না তাহারা যেন সত্যগ্রহ না করে।" ইহা ঠিক কথা। কিন্তু এই একদিকে গ্রহণ, আর একদিকে নিষেধ, ইহার অর্থ কয় জনে বুঝিবে? তাই আমাদের আশঙ্কা যে, দেশের সাধারণ লোকে সত্যগ্রহের নামে একটা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া না বসে। দ্বিতীয় কথা—"সত্যগ্রহ" একটা হুজুগের মত উত্থিত হইল আর দেশশুদ্ধ লোক সত্যগ্রহ করিল, আর আত্মিকবল লাভ হইল, আত্মিকবল লাভ কি এত সুলভ? অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যাঁহারা আত্মার সাধনা করিলেন, ত্যাগ-বৈরাগ্যে জীবন কাটাইলেন, বিশ্বাস-ভক্তিতে জীবন গঠন করিলেন, তাঁহাদের কথা সব চাপা পড়িল, আর উত্তেজনার আবেগে সত্যগ্রহ আসিল, লোকে তাহা গ্রহণ করিল, আর আত্মিকবল লাভ হইল?

তবে কি আমরা সত্যগ্রহের বিরোধী? না, তাহাও নয়; আমরা যে বহুদিন হইতে ঐ পথ শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাই ধরিয়া আছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই প্রচার করিয়া আসিতেছি যে, আত্মিকবল না হইলে কোন বিষয়ে মঙ্গল হইবে না। অবশ্য জনসমাজে নানা ভাবে নানা কাজের সূচনা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাই ধ্রুব-সত্য যে, ধর্ম্মবিশ্বাস—ধর্ম্মবল আশ্রয় করিয়া যে কাজ আরব্ধ হয় না তাহার স্থায়ীত্ব অসম্ভব। বিশ্বাসে আরব্ধ কার্য্য যদি আপাততঃ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ নাও হয়, তবু প্রতিষ্ঠাতা কখনই বঞ্চিত হন না, তিনি শুভ উদ্দেশ্যের শুভ ফল লাভ করিবেনই, জনসমাজও সে কাজের দ্বারা কখনই নিষ্ফল হইবে না।

যখন স্রোতের ন্যায় স্বদেশী আন্দোলন আসিল, দলে দলে লোক তাহা গ্রহণ করিল এবং ভাবের আতিশয্যে কত লোক কত কি করিল। যখন স্রোত চলিয়া গেল, লোক-সাধারণের মন তাহা হইতে শিথিল হইয়া পড়িল; কিন্তু তবু কিছু না কিছু রহিয়া গেল; অর্থাৎ যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত স্বদেশীভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা ত্যাগ করেন নাই; কিন্তু এই আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে যাঁহারা এই সুর ধ্বনিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ কত

উজ্জ্বল এবং খাঁটী বর্ত্তমানে যেটুকু স্থায়ী হইয়াছে তাহা ঐ পূর্ব্ব সাধনার ফলে।

যদি এখন আত্মিকবলের কথা দেশব্যাপী ভাবে উত্থিত হয় তাহা আনন্দেরই কথা, কিন্তু কেবল মুখের কথায় বা উপবাস-অনশনে আত্মিকবল লাভ হইবে না। আত্মিকবল লাভের মূল, ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস, ভক্তি ও তাঁহাতে নির্ভর।

কুশদহ-সমিতি

(কার্য্য বিবরণী)

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা, ৪র্থ অধিবেশন।

স্থান,—সমিতির কার্য্যালয়, ৩৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্।

সময়—১০ই চৈত্র সোমবার, সন্ধ্যা—৭টা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগোপাল দত্ত।

আলোচ্য বিষয় ও নির্দ্ধারণ।

(১) সাধারণসভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কুলতলা ও গোপল-ময়না গ্রামের জল কষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা। নির্দ্ধারণ। স্থানীয় সাহায্য—অর্থ, জমি বা অন্যান্য কিরূপ পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য পত্র লেখা হউক।

(২) শাখা কার্য্যালয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন জন্য যে সাবকমিটী গঠিত হয় তাহার রিপোর্ট গ্রহণ। নিয়মাবলীর খসড়া গৃহীত হইল।

(৩) 'কুশদহ' পত্রিকা পরিচালনার জন্য সাবকমিটী গঠন। নিম্নলিখিত ৭ জন সভ্য দ্বারা অস্থায়ীভাবে একটি সাবকমিটী গঠিত হইল। সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, নীলাচল মুখোপাধ্যায়, নিখিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীরোদগোপাল দত্ত ও বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ। ইহার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে। আরও কয়েকটি বিষয় সময় অভাবে অদ্য স্থগিত রহিল।

৫ম অধিবেশন

স্থান,—৩৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্।

সময় ১৮ই চৈত্র শুক্রবার, সন্ধ্যা—৭টা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়।

আলোচ্য বিষয় ও নির্দ্ধারণ :

(১) সমিতির পৃথক কার্য্যালয় স্থির করা। হরিদাস বাবু, ক্ষীরোদ বাবু, সুরেন্দ্র বাবু স্থান মনোনীত করিবেন।

(২) ইছাপুর বার্ষিকসভায় ইছাপুর স্কুলের জন্য সংগৃহীত ৩৫ টাকার প্রাপ্তি অত্র স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তর দেওয়া হউক।

(৩) খাঁটুরা রাস্তা মেরামত সম্বন্ধে প্রমথ বাবুকে পুনরায় পত্র লেখা।

(৪) কুশদহ অন্তর্গত বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য I. S. O. কে পত্র লেখা।

(৫) যৌজার বাবু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য ডিঃ বোর্ডের পত্র পাঠ। বোর্ড নিয়মিত অর্থ পাইলে সম্মত আছেন। ৬০০০ টাকায় তৃতীয় শ্রেণীর হইতে পারে। সতীশ বাবুকে ঐ মর্ম্মে পত্র লেখা হউক।

(৬) চাঁদপাড়া বেলেডাঙ্গা রাস্তা সম্বন্ধে ডিঃ বোর্ডকে পত্র লেখা।

(৭) নববর্ষ সম্মিলনী সভার দিন স্থির হইল, ৩রা বৈশাখ। স্থান স্কটীস চার্চ্চস্ কলেজ-গৃহ।

দ্বিতীয় বর্ষে সমিতির হিসাব পরিদর্শক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও সুরেন্দ্র নাথ পাল মহাশয়দ্বয় নিযুক্ত হইলেন।

৬ষ্ঠ অধিবেশন

স্থান—২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্ (কুশদহ কার্য্যালয়)
সময় ২৮শে চৈত্র শুক্রবার, সন্ধ্যা—৭টা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়।

আলোচ্য বিষয় ও নির্দ্ধারণ।

(১) কুশদহ গ্রাম সমূহের সহিত সমিতির যোগ স্থাপনের উপায় নির্দ্ধারণ। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের প্রস্তাব, প্রতি মাসে যে কোন রবিবারে সমিতি হইতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ কুশদহ পল্লিতে সভা আহ্বান ও শাখা সংস্থাপণার্থে গমন করিবেন।

(২) বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতা এবং সাংসারিক বিপত্তি জন্য ক্রমাগত সমিতিতে আসিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য তাঁহাকে সহানুভূতি সূচক পত্র লেখা হউক, এবং সাম্বৎসরিক সভার আয়-ব্যয় হিসাব যাহাতে শীঘ্র পাঠাইতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন।

(৩) ফুলতলায় জল কষ্টের তদন্ত জন্য আগামী ৪ঠা বৈশাখ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ কুণ্ডু ও চারুচন্দ্র ঘোষ তথায় গমন করিবেন।

(৪) ইছাপুর স্কুলের ৩৫৲ টাকা, শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ৪ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত পত্র পাইলে দেওয়া হইবে পত্র লেখা হউক।

৩০শে চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় রামমোহন লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ঘটক মহাশয়ের সভাপতিত্বে মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

—০—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, খাঁটুরা নিবাসী, কলিকাতা রামবাগান প্রবাসী স্বর্গীয় সারদাচরণ দত্ত মহাশয়ের পত্নী, নিজ ব্যয়ে খাঁটুরায় স্বর্গীয় বংশীবদন পাল মহাশয়ের পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিতেছেন, তাহাতে গ্রামবাসী এবং পথিকদিগেরও কথঞ্চিৎ জলকষ্ট নিবারণ হইবে। দাত্রী মহোদয়ার এই সাত্বিক দানের জন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইলেন। ভগবান তাঁহার হৃদয়ে স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব রচনা করুন।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, যমুনানদী সংস্কার কার্য্য ৫ বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে, গভর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন।

মাটীকোমরা গ্রামে বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ সাহায্যে তাঁহার পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে "শ্রীনাথ বিদ্যালয়" নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা হইতেছে, এ সংবাদ 'কুশদহ'র পাঠকবর্গ অবগত আছেন। গত ২৩এ মার্চ্চ উক্ত বিদ্যালয়ের নব-নির্ম্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন এবং ১ম সাম্বৎসরিক হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বনগ্রাম ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় মাটীকোমরায় আগমন করিয়াছিলেন। ননীবাবু আট শতাধিক টাকা ব্যয় করিয়া এই স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ ও তাহার আসবাব খরিদ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে, যাহাতে তাঁহার পিতার নাম এই স্কুলের সহিত স্থায়ী হয় তজ্জন্য তিনি গভর্ণমেণ্ট অথবা ডিষ্ট্রীক বোর্ডের হাতে পাঁচ সহস্র টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার এই শুভ বাসনা পূর্ণ হইবে; কারণ 'সাধু যাঁহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাঁহার সহায়"।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।